# বাংলাদেশের হৃদয় হতে

বাংলাদেশের সেরা গল্প-সংকলন

সম্পাদনাঃ
কমল রায় চৌধুরী

ছাত্র শিক্ষা নিকেতন
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কোলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রী কমল রায় চৌধুরী, এম.এ., এল এল. বি.
ছাত্র শিক্ষা নিকেতন
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোনঃ ৩৪-০২৭৪

শিল্পী
শ্রীকানাইলাল পাল

ব্লক
রয়্যাল হাফটোন কোঃ

মুদ্রাকর
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬-বি গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

BANGLADESHER HRIDAYA HOTE
A collection of recent stories by eminent Bangladesh writers.
Edited by KAMAL ROY CHOUDHURY

Published by
K. Roy Choudhury, M.A., LL.B.
Chhatra Siksha Niketan
2 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12 (India)

গভীর রাত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে অসংখ্য শহীদের
জোড়া জোড়া চোখ আমার প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে
তাঁদের উদ্দেশে—

## সম্পাদকের নিবেদন

দুই বাংলাদেশ। এপারে একটি ওপারে অরেকটি। মধ্যখানে সশস্ত্র প্রহরী—আন্তর্জাতিক সীমানা। বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সহসা সীমান্তের কাঁটাতার উপড়ে গেল। আমরা ওপার বাংলার সাহিত্যের সাথে ও বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেলাম। ওপার বাংলার সাহিত্যিকদের প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক এই বাংলায় প্রকাশিত হচ্ছে। এখানকার পাঠকগণ উৎসাহের সঙ্গে ঐ সকল সংগ্রহ করছেন।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফজলুল হক সাহেব ১৯৫৪ সালে কলকাতায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু'ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গে কোন ফারাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু'ভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।' হক সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে এত শীঘ্র বাস্তব সত্যে পরিণত হতে চলবে তা কে জানতো?

ও আমার এ বাঙলা ভাষা
এ আমার বুক জুড়ানো মুখ জুড়ানো
লক্ষ জনের লক্ষ আশা—
ও আমার এ বাঙলা ভাষা।
এই ভাষাতে স্বপ্ন দেখি
এই ভাষাতে লিখন লিখি রে
ওরে এই ভাষাতেই মাকে ডাকি—
জানাই প্রাণের ভালবাসা।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের গর্ভে ওপার বাংলার গণতান্ত্রিক শক্তির জন্ম। তখন থেকে শাসকের নিষ্ঠুর নিপীড়নে কত শহীদের রক্তঝরা দেহ ঐ বাংলার মাটিতে ঘুমিয়ে রয়েছে। বাঙালী গর্জে উঠলো, পূর্ববাংলার নরনারী পাকিস্তানী শাষকদের কবল থেকে মুক্তি চাইল। সুরু হল গণসংগ্রাম—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

বর্তমান গল্প-সংকলন 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' বইটিতে পূর্ববাংলার মোট ছাব্বিশজন সাহিত্যিকের ছোট ও বড় গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায় বাংলাদেশের গল্পকারগণ কত অধিক জীবনের কাছে এগিয়ে এসেছেন, বাংলাদেশের সমাজ-চিত্র কত সুনিপুণ ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে জানাই এই সংকলনের কাজে আমার পক্ষে বিশেষ কোন নিয়ম মেনে চলা সম্ভবপর হয়নি এবং বয়ঃক্রম অনুযায়ী গল্পকারদের সন্নিবন্ধ করাও সম্ভব হলো না। কারণ খুবই অসুবিধার মধ্যে গল্পগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। আশা করি, বাংলাদেশের গল্পলেখকগণ এ সকল ত্রুটি মার্জনা করবেন।

**কমল রায় চৌধুরী**

# গল্প-সূচী

# মধ্যবিত্ত

## আসাদ চৌধুরী

সেই নিঝুম ছিমছাম রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানালার দিকে তাকাইনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কোনোদিন আমি তাকাইনে। জানালায় কি যেন আছে, যার অস্তিত্বের ভাবনায় আমি কাতর, তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই আমার ক্ষতি হবে। কী ক্ষতি হবে আসাদ? বিশ্বাস কর, আমি জানিনে, তখনো জানা ছিল না, আমার কী ক্ষতি হতে পারে। তাকে আমার ভয়, ভীষণ ভয়।

একটি রাতের কথা মনে পড়ে। আমার বীরত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক রাত। আমার শৈশবের অসংখ্য হারিয়ে-যাওয়া রাতের একটি উজ্জ্বল রাত। আকাশ ভরা তারার আলো। তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলেছিল। শোবার ঘরের স্বল্প আলোয় আমি খড়মটা খুঁজছি। খালি পায়ে পেচ্ছাবখানায় গেলে আম্মা মারেন। হারিকেন হাতে আম্মা খাবার ঘর পেরোলেন। কাঠের খিল খোলার বিশ্রী শব্দে জমাট নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। কিন্তু আমার খড়ম কই? এমন সময় আমার বন্ধু এলেন। তার কোনো শরীর নেই, ভাষা নেই, সময় ও স্থান নেই। তাঁকে আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম অনুভূতিতে। তিনি খড়মটা আমার পায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, 'আসাদ, বাইরে জ্যোৎস্না থলথল করছে (সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল না, তোমরা বিশ্বাস কর)। টুকরো টুকরো মেঘগুলো রাজকন্যার আঁচলের মতো ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের অমল আনন। বাতাসের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন আনন্দ। চল, দেখাই।'

আমি মনে মনে বলি, যদি জানালাটা না থাকে, সেখানে সর্বনাশটা না থাকে, যদি ভরসা পাই, তবে যাই।

জানালাটা ঠাস করে খুলে গেল।

অমনি যে অলকার ফুলে রাজকন্যা চুলে মালা সাজায়—তার ম ম করা গন্ধে; যে অজানা সুরে তিনি বীণা বাজান—তার আকুল সুরে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মুগ্ধ দুই চোখের সামনে চন্দ্রালোকে, কতকালের কে জানে, পুরানো জং-ধরা তালা খুলে গেল, ফুলের নিঃশ্বাস লাগল বুকে।

*ঠাস করে আম্মা আমার গালে চড় দিলেন।*

ঘুমজড়িত কন্ঠে বললেন, কান্ড দেখ, ডর লাগে, অমুক লাগে, সমুক লাগে—এখন বাঁদরামি করে জানালা খুলে আকাশের তারা দেখছে।

বড় আশা করে জননী, জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

( ২ )

হাত থেকে ট্রে পড়ে গেলে চায়ের কাপ ডিসগুলো যেমন একই সঙ্গে ভাঙ্গে এবং চামচগুলো শুধু ভদ্রতা করে সর্বনাশের সাইরেণ শোনায়, তেমনি পাশ করার পর আমার অস্তিত্ব আর অহঙ্কারের একই দশা হল। অস্তিত্বটা চায়ের কাপ, না চামচ বুঝতে পারিনি। আশৈশব যত্নে লালিত অভিমানে সিক্ত আমার অহঙ্কারের টুকরোগুলো আমি আর খুঁজে পেলাম না। আমি ধীরে আশ্রয়হীন রাস্তার কুকুরের মত হয়ে গেলাম। তখন আমি শহরের সরকারী-বেসরকারী সওদাগরী অফিসে আত্মবিক্রয়ের নোটিশ খুঁজেছি—দারুণ রোদে, দারুণ শীতে, নিদারুণ বসন্তে ও বর্ষায়। এখন আমার মনে হয়েছে, আমি কুকুর হয়ে গেছি। নিজেরই নোংরা গন্ধে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আমার দগদগে ঘাগুলো, লোমহীন খসখসে দেহ আমাকে তাড়া করেছে। ইন্টারভিউতে আমি গলগল করে ঘামতাম, স্বরযন্ত্রের সাহায্যে কত কষ্টে নির্ধারিত ধ্বনি তুলতাম, প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে (কোন্ ব্লেড দিয়ে আপনি শেভ করেন,—এ প্রশ্নটি এই একটি মাত্র প্রশ্ন করার সাহস আমার কোনোদিনই হল না), এমন একটি দীন ভঙ্গি করে তাকাতাম, যার অর্থ হল, হুজুর আপনার শ্রীচরণ পাদুকাসহ আমার মস্তকে স্থাপন করুন, আমি পুলকিত চিত্তে পদলেহন করি, ধন্য হই, প্রসন্নচিত্তে কেঁউ কেঁউ করি।

অথচ তিন বছর আমার কোনো চাকরি হল না। এক মন্ত্রী ছিলেন আমার পরলোকগত জনকের বন্ধু। তিনি চেষ্টাটেষ্টা না করেই বড় বড় আশ্বাস দিতেন, আমি সেই আশ্বাসের উপর স্বপ্ন দেখতাম। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে কথায় ধরে রাখলে কবিতার সুন্দর পংক্তি হতে পারে। কিন্তু আমি ধরে রাখিনি। প্রতিটি স্বপ্নের মৃত্যু আমাকে বাস্তবতা নামক সত্যের দিকে ঠেলে দিল, আমি খুব কাঁদলাম অঝোরে, স্বপ্ন হননে কাঁদলাম। তার স্ত্রী, অত্যন্ত রোগা এবং শীর্ণ, কৃতজ্ঞ থাক আসাদ, তুমি তাঁকে চাচী-আম্মা বলার সুযোগ পেয়েছিলে, একদিন চিঁচিঁ করে বললেন, 'এই কাপড়-চোপড়ে এলে তোমার চাচার মান থাকে?' চাচার মান রাখার জন্যে নয়, কোনো আশা নেই ভেবে আমি আর ও বাসায় যাইনি। অপমানিত না হয়ে, কোনো বিকেলে ভেবেছি, ওদের বাসায় ভালো ব্রেন্ডের চা খাওয়া হচ্ছে এখন।

সারমেয় বিজনে হাড় পেলে যে বিজয়ী ভঙ্গি করে, মতিঝিলের পঞ্চাশ

টাকার ট্যুইশানিকে সে ভঙ্গ করার সাহস আমার কোনোদিন হয়নি। তিন তিনটি বছরে আমার গাধা ছাত্রটি তিন ধাপ উঠেছে, কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এসেছে, সম্প্রতি তার মান অপমান বোধও এসেছে, সঙ্গে এসেছে নাকের নিচে গোঁফাভাস।

গাধাটার কথা যাক।

এই দুঃসময়ে রকীবের বাসায় গিয়েছিলাম। ওর ছেলের জন্মদিন ছিল সেদিন। একটা চাকরীর আবেদনপত্র টাইপ করার পয়সাও ছিল না আমার। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, লৌকিকতার জালে, আমি এতদিন নিজেকে জড়াইনি।

( ৩ )

—দোস্ত হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন শালার সব দোকান-পাট বন্ধ।

হ্যাঁ, এই সংলাপটিই বিভিন্ন ধ্বনিতরঙ্গে আবৃত্তি করে করে হেঁটে গিয়েছিলাম কাওরান বাজার।

—তাতে কি? তাতে কি হয়েছে? (চোয়ালে ঘুসি মেরে আদর করছ কেন আএশা রকীব?)

বন্ধুটি দেখে ও অভ্যর্থনায় এসেছিল।

(আমি এক সময় ভালো অভিনয় করতাম। দিলীপকুমার হবার ইচ্ছা ছিল। কলেজে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় যাত্রার অভিনয় দেখে চিত্ত ডাক্তার বলেছিল সোনার মেডেল দেবে। হঠাৎ মেডেল-টেডেল না দিয়ে বউ-ঝিটি নিয়ে ইণ্ডিয়া পালিয়ে গেছে। শালা!)

—বুঝলে আএশা আমি সত্যি ভীষণ দুঃখিত। যখন মনে হল ইট ইজ টু লেট, স্কুটারে গোটা ঢাকা খুঁজেও কোনো দোকান খোলা পেলাম না।

ওরা হাঁ করে শুনছে।

—বারবার ওকথা বলছিস ক্যান?

আএশা, রকীবের কানে কানে কি যেন বলছেন। (আমি সব বুঝতে পারি। আমার অভাব ও হীনমন্যতা আমাকে অতি আত্মসচেতন করে তুলেছে। ওঁরা যা বলছেন. যদিও আমি শুনিনি, তবু ওঁরা এসব কথাই বলছিলেন—

আহা, বলুক না। তিন বছর পাশ করে বেকার। প্লিজ কড়া কিছু বোলটোল না।

পাগল হয়েছ। মনে নেই, হাসপাতালে খোকাকে দেখতে টয় নিয়ে গেছল।)

আএশার বোন শাড়ি পরেছে, বিস্কুট রঙের, মারাত্মক, সে বোন, দুলাভাই ও আমাকে,—আমাকে একটু বিশেষভাবে দেখছে। আমি যে চেয়ারে বসেছি, সেখানে আলো কম, ওর মুখে (ও বুকে) পর্যাপ্ত আলো। আমাকে নিরাপদ

কুকুর বিবেচনা করে বলল, আপনি এ্যাতো দেরী করে এলেন। ভাবলাম, বুঝি আসবেনই না। আপনি না এলে এসব ফ্যাস্টিবল এতো ড্রাই লাগে!

আমি ওর বুকের দিকে তাকাতেই হেসে কাপড়টা সামলে নেয়। আমি কোনো কথা না পেয়ে বললাম, 'তুমি তো এবার অনার্স ফাইনাল দিচ্ছ, না?'

—সেকি, জানো না, মেরী তো এবার অনার্স ফার্স্ট কেলাস পেয়েছে। রকীব বললে, একটা তৃপ্তি তৃপ্তি মুখে। আমি খুশি হয়ে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললাম, ঠিক হ্যায়, এবার খাওয়াও।

বলেই চুপসে গেলাম। আমার কাপড়-চোপড়ের কথা, বুকের কাঙালপনার কথা মনে পড়তেই চুপসে গেলাম। স্বামী-স্ত্রীতে ফিসফিস। এখন, ওদের গোপন কথাটি দশজনকে বলব না।

চোখের সুন্দর একটা কাজ করে মেরী বলল, বেশ ত কী খাবেন বলুন না?

তোমাকে। না, বলিনি, শুধু গানের মত মনে মনে গেয়েছি। বললাম, উর্দু একসেন্টে, রসিকতার করুণ চেষ্টাঃ এক গিলাস ঠান্ডা পানি।

মেরী হাসি গোপন করার চেষ্টা করেনি। আএশা হাসতে হাসতে বলল, ফ্রীজ থেকে বোতলটা নিয়ে আসিস মেরী।

মেরী ফেরে এক প্লাশ পানি নিয়ে, টেবিলে আমার হাতের নাগালে রাখল। আমি নিজের আঙুলগুলোর দিকে চোরের মত তাকালাম।

'কই, কি খাবেন, বললেন না তো আসাদ ভাই।' বড় বড় চোখ দুটোতে তুমি প্রশ্নবোধক চিহ্ন মাখাও কী করে।

কোথায় তুমি ফার্স্ট কেলাশ পেয়েছ, আমরা খাওয়াব, না তোমার কাছ থেকে খাব?

নিজের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেছে। আন্তরিকতা এসেছে চাঁদ? কেন? সত্যি বলছি, আমি জানিনে।

মেরী কি বুঝেছে জানিনে, কিন্তু চুপ করে রইল। মেরী, তুমি যদি তোমার বোনের মত অনুকম্পা করো, আমি বাঁচবো না। আএশা সময় জানতে চাইল, আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছ কেন আএশা, জানো না অভাবের সময় বিক্রী করেছি। সময় আমার কাছে সামগ্রী নয়, আএশা, যে-হিসেব রাখব। সময় এবং যৌবন শীতের পাতার মত, বিদেশী সিনেমা দেখে কথাটা শিখলাম, ঝরে গেলে কেউ কাঁদবে না।

মেরী বলল, 'এগারোটা দশ।' মেরী তুমি নখ খাচ্ছ কেন? নখ খেয়ো না ওতে পেটের অসুখ হয়, আরো জানি কি কি হয়, ভুলে গেছি, কিন্তু প্রশ্নটা আমি করিনি।

—রকীব তুমি গপপো (কেন গল্প নয়, আএশা আমি, আসাদ চৌধুরী জানতে চাই, কেন গল্প নয়, তুমি আমার সতীর্থ ও বন্ধু স্ত্রী, তুমি দর্শনের

প্রফেসার, তুমি কি জানো না, গপপো শব্দটি সময়ের অপচয়ের অর্থ বহন করে, এবং অপমানজনক) কর এদের সঙ্গে (আমাদের সঙ্গে বলতে তোমার জিভে বাঁধল কেন—কি হয়েছে আমার, নিজের দীনতায় কেউ যদি হতাদর করে তাতে আমি আগের মত চটি না, কিন্তু মেরীর উপস্থিতি কি আমার ব্যক্তিত্বে রূপান্তর এনেছে?)।

ধকলটায় অর্ধেকের মালিক আমি। বোসই না একটু।

আএশা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। সত্যি হাসলাম। শব্দ করে নয়, হ্রস্ব ই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের যে অবস্থা হয়, সে রকম। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। এটা যে হাসি নয়, আধুনিক পৃথিবীর সবাই স্বীকার করবেন, আমার জীবনে এরকম মিথ্যে হাসি কম ছড়াইনি, জীবনকে এই হাসি দিয়েই তো সাজিয়েছি। আসাদ, তুমি দর্শন ফলাচ্ছ কেন? না, না—কাব্য নয়, শিল্পও নয়—সরল সত্য ভাষণ। আমি রাগ করেছিলাম, রাগ প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, আন্তরিকতাহীন সভ্যতা, না সভ্যতা নয়—সংস্কৃতি—আমাকে দিয়ে ঠোঁটের ব্যায়াম করিয়ে নিল, আমি লজ্জিত, এই ব্যায়ামেরও অর্থ আছে, এই শ্রম আপোষের প্রতীক, যা আমি ঘৃণা করি।

আমি যখন এসব ভাবছি, রকীব মোজা খুলছে, আএশা লাইটারটা জ্বালাচ্ছে আর নেভাচ্ছে, মেরী প্রেজেন্টেশানগুলো দেখছে একটু ঝুঁকে, এই ভঙ্গিটি, সুন্দর ভঙ্গিটির পশ্চাতে যথেষ্ট সাধনার কথাটা মনে পড়ে গেল কেন এই মুহূর্তে. ঝি, কার যেন মা, ঠুনঠুন করে টেবিলের ওপর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। একবার লাইটারটা জ্বলতে সময় নিল, যখন জ্বলল, চমকে আমার দিকে তাকাল আএশা। আমিও। আমরা হাসলাম। সে কোন শৈশবে কী যেন কী খেলতে গিয়ে শত্রুমিত্রহীন সরল খেলার সরল হাসি, যা আমি আর দেখি না, আএশাকে আমার ভাল লাগল রকীব চটেছে, 'কী খুট খুট করছ।' রকীব লাইটার হাতে নেয়। এমন সময়...

## ( ৪ )

এমন সময় আমার বন্ধু এলেন। তার কোনো শরীর নেই, ভাষা নেই, সময় ও স্থান নেই। তার জন্যে মানব ভাষায় অদ্যাবধি কোনো স্তোত্র রচিত হয় নি। সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু ভাষায় তার বর্ণনা তোমরা পাবে না। আমিও তার বর্ণনা দেব না। আমি অক্ষম কথক। আমিই শুধু তাকে অনুভব করলাম। এবং মুহূর্তের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মানব ভাষায় বোধ হয় সম্ভব নয়। তিনি এলেন সেই ঘরে, যে ঘরে আমরা বসেছিলাম। লাল নীল কাগজে মনোরম সাজানো ঘর। প্রত্যাশিত মেহমানদের চলে যাবার পর সেই ঘরে যেখানে

টেলিভিশান রয়েছে, মনোরম স্থানের কমনীয়তা ও লালিত্যবর্ধক অতিকায় রেডিওগ্রাম ইত্যাদি।

তিনি এসে চলে গেলেন, কেউ দেখল না।

রকীবের হাতে লাইটার যেভাবে ছিল, সেভাবেই আছে। মেরীর চোখ যেন গেঁথে আছে জাপানী ডলের ওপর, সেই স্বর্গীয় হাসি চোখে, ঠোঁটে, ছবির মত লেপ্টে আছে আএশার। গেলাশের ঝুটা পানি ঢালছিল ঝি, পানি ঝরছেই, না, কেউ তাকে দেখেনি। সেই বন্ধু আমার হাতে, চেয়ারের পেছনে রেখে গেল প্যারাম্বুলেটার, যার লোভনীয় বিজ্ঞাপন সম্প্রতি কাগজে, বেরিয়েছে। আএশা নিশ্চয়ই দেখেছেন, লোভী রোজগেরে মাগীর চোখ দুটো পাওয়ার আশায় চকচকে হয়ে উঠেছিল, পরে অক্ষমতার এক ফুঁয়ে নিভেও গেছে নিশ্চয়ই। এদের 'বড় হবার ক্রমবর্ধিষ্ণু আকাঙ্ক্ষা' কোনো দিনই সম্ভব হবে না। অথচ কত ত্যাগ স্বীকার করে অভিজাত ঠাঁট রাখার প্রয়াস সে তো আমি জানি।

আমার হিংসুক মধ্যবিত্ত মন এদের আঘাত দেবার জন্য পাগলা হয়ে গেল। আমাদের সাহিত্যে আমার পরবর্তী আচরণকে মধ্যযুগীয় উদারতার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কি না, জানিনে, কিন্তু বিপরীত আচরণ করেছি জেনে শুনেই। সুন্দর সবুজ রেশমী নদী, নরম কোমল নেভী ব্লু রঙের ঢাকনি, মখমলের মনোরম পাদানি, দুধের মতো শাদা রেশমী ঝালর, সংগীতের মতো ঘন্টি, অর্থাৎ বন্ধুর দেয়া প্যারাম্বুলেটারটা আমি আএশার হাতে দিলাম। আমি লড়াই জেতা কুকুরের মতো বগলেশে জ্যোৎস্না মাখিয়ে, শরীরে সমীরণের পরশ নিয়ে, বেদনার গন্ধকে প্রতিশোধের অগ্নিতে ঢেলে দিয়ে প্রসন্ন পুলকিত চিত্তে, হেঁটে কারওয়ান বাজার থেকে তোপখানা রোডের মেসে চলে এলাম।

মিসেস আএশা রকীবের দীর্ঘশ্বাস আর মেরীর বিস্ময় আমার হাতে গোলাপ হয়ে গেল। আমি শুঁকে টুঁকে আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

# অবিচ্ছিন্ন

**বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর**

সে তার ডায়েরীতে লিখেছিল,—শিল্পীর জ্ঞান দিয়ে সময়কে আমি বুঝতে চাই। সময় যেসব ঘটনায় গাঁথা, তার স্বরূপ আর জিজ্ঞাসা আমার কাছে যেন উন্মোচিত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা ত তাকেই বলে যার অন্য নাম গভীর আত্মজ্ঞান, নিজের ও মানুষের সম্পর্কে। মানুষ যতদূর অবধি মুক্তি পেতে পারে, ততদূর মুক্তি জীবনে যেন সত্য হয়ে ওঠে। কোন বইতে পড়েছি, লক্ষ্য থাকলেই চলবে না লক্ষ্যে তাকানোর ক্ষমতাও সেই সঙ্গে চাই।

সেই ক্ষমতা আছে বলে যে ঘটনার ভেতর তার মন জীবনের স্তরে স্তরে বেড়ে উঠেছে, তাদের ভাবতে তার ভালো লাগে; রোদ যেমন ভালো লাগে শরীরে। তবু অনেক ঘটনার ভেতর বিশেষ একটি ঘটনা তারার মত ফুটে ওঠে বুঝি।

মামাদের বাড়ীতে সে মানুষ হয়েছে। বাবা মারা গিয়েছিলেন শিশু বয়সে। মা-কে ঘিরে ও জড়িয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে। তবু বাবা না থাকার অভাবে, মার চারপাশে কেমন যেন অদ্ভুত একটা শূন্যতা আছে ছড়িয়ে, এই বোধ যে কবে থেকে তার মনে জেগে গেছে, সে টেরও পায়নি।

মাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'আব্বা দূর দেশে গেছেন। আসবেন ফিরে আবার।'

সেই দূর দেশটার ধূ-ধূ করা ফুরোত না। সে ধূ-ধূর শেষ কোথায় মা বুঝি জানতেন। সে ছেলেমানুষ তার শেষ কোথায় জানত না বলেই, ধূ-ধূ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানেই বেড়ে উঠেছে। তার মনে হত মা বুঝি সেই শূন্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ও হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। মার ভালবাসা ছিল অমন হাতছানি দিয়ে ডাকা ও আঁকড়ে থাকার মত।

সেজন্য তার মনে মার সম্পর্কে একটা অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা জেগে উঠেছে। মা'রও তাকানোর ক্লান্তি নেই, তারও ক্লান্তি নেই চেয়ে থাকায়।

তবু ত ঘটনা ঘটে। কড়ি খেলায় তার ঝোঁক বরাবরই ছিল। জেতাতেও যেমন তার ক্লান্তি ছিল, না, হারাতেও নয়। *তবু একদিন তার* জিতে যাওয়া

সেই হার-জিতের পালাকে চিরদিনের মত বদলে দেয়। মুখে বাঁদরের আদর এনে তার সঙ্গী বলে ওঠে, ভারি একবার জিতে গিয়েছিস, তাতে হয়েছেটা কি। জিতলেই মানুষ বুঝি জানে? জানিস বোকারাম তোর মার ফের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেবেলার সেই সঙ্গীটির কথা এখন তার মনে নেই। কিন্তু কড়ি খেলায় হেরে গিয়ে অমন কথাগুলো কেন যে সে বলেছিল, এখনও কালাম তা বুঝে উঠতে পারে না। শুধু এটুকু মনে আছে, আগুনের হল্কার মত কথাগুলো তাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। রোজ উজ্জ্বল দিনে যেসব পাখি ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায় ও ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় যেসব গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে ওঠে, সেই পরিবেশ ছেড়ে মার কাছে সে চলে এসেছিল।

দালানের যে কামরায় নানী থাকতেন, সেখানে খাটের কোণায় বসে মা বুঝি তখন তাঁর বড়ো দুলাহ্‌ ভায়ের জামার বোতাম পরাচ্ছিলো। মা দেখেই বলে উঠলেন, এদিকে আয়। সেই ডাক শুনেই সে কাছে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। বলতে পারেনি, জিজ্ঞেস করতে পারেনি কিছু।

মা'র বিয়ের দিন তাকে তার বড়ো খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফিরে যখন সে এসেছে, তখন মা তার নতুন স্বামীর ঘর করতে চলে গেছেন।

বড়ো মামী তার দু-বেলা চা খাওয়া দেখতে পারতেন না। তাই বলতেন, চা হলেই উপুড় হয়ে পড়িস। গিলতেই যদি হয় মার কাছে চলে যা। কালামও মৃদুস্বরে জবাব দিত, না যাব না। ছোট্ট একটা হাসি বড়ো মামীর ঠোঁটে মেঘের মতো ভেসে উঠত। সেই মেঘের ভেতর থেকে বলতেন. যাবি না কেন? শত হোক তোর মার শ্বশুর বাড়ী। তার জবাবে কালাম শুধু বলত, আমার নিজের বাড়ী ত নয়।

মামী জানতেন না ছেলেমানুষ কালামের মন কি পণে কঠোর হয়ে উঠেছে। যে মা নতুন বিয়ে করতে পারলেন ও তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারলেন, তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে সে যাবে কেন? কিন্তু ছেলেমানুষের পণ ছেলেমানুষীতেই ভরা থাকে। তাই তার পণও টেকেনি।

তার বাবার ব্যবসা ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর সে ব্যবসা আনতে হয়েছিল গুটিয়ে। মামারা ছিলেন তাঁর সম্পত্তির অভিভাবক। নাবালকের অভিভাবকেরা সচরাচর যা করে থাকেন, মামারা তা করতে কুণ্ঠিত হননি। তার বয়েস ষোল হতে না হতেই মামারা তার তিন কানি জমি ও বাজারের ভিটে লিখে নিলেন নিজেদের নামে। এরপর থেকে মামীদের মুখ শুধু চা খাওয়াতেই নয়, ভাত খাওয়ার ব্যাপারেও গম্ভীর হয়ে উঠতে শুরু করল।

দু-দুটো চিঠি দেওয়ার পরও যখন জবাব এল না, কালামকে তাই আসতে হল মার শ্বশুরবাড়ীতে। মা যদি বড়ো খালা ও খালু আব্বাসহ আসেন,

তাহলে দেনা-দরবার করেও সম্পত্তির যা হোক কিছু বাঁচান যাবে।

মা তাকে দেখেই খয়েরী পাড় আঁচলখানি মাথায় তুলে বলে উঠলেন, কামু তুই এখানে!

কালাম শুধু অপলক হয়ে দেখল মাকে। একটু বুঝি মোটা হয়েছেন, মুখে শান্ত একটা শ্রী এসেছে, ছেলে যে-শ্রী দেখে এতদিন মুগ্ধ হয়েছে, তাও যেন এ নয়।

হঠাৎ তাই এক লজ্জার ঝোঁকে কালাম কদম বুছি করে বলল, একটু কাজে এসেছি আপনার কাছে, কদিন থাকতেও পারি।

মা তার জবাবে শুধু বললেন, বস। ছিটে বেড়ার ওধারে কে যেন তখন কাকে বলে চলেছে, দেখলিত এক স্বামীখাকী মায়ের কান্ড। আগের ছেলে পেয়ে সোহাগে উথলে উঠেছেন। আব্বার দু-চোখ কানা কিনা, বুড়ো বয়েসে তাই গুণ করতে পেরেছেন বিদ্যেধরী।

কালামের শ্যামলা মুখে লালচে আভা ছিটিয়ে পড়তে দেখেই মা বলে উঠলেন, ওঁর সাথে ত তোমার দেখা হয়নি, না? ওঁকে তোমায় ডাকতে হলে চাচা বলেই ডেকো, কেমন।

মা তারপরই চলে গেলো রান্নাঘরে। কালাম ভাবতে চেষ্টা করল, মা কি বদলে গেছেন, না বদলানো পরিবেশে এসেছেন বলেই অমন তার চোখে ঠেকছে। তবু তার বোধ হল, মা বুঝি কেমন পর হয়ে গেছেন। তারই আপন মা তাকে দেখে দূর সম্পর্কীয় ছেলের মত কথাবার্তা বলছেন, মার ব্যবহারের এই ভঙ্গিটি অবিরলভাবে বেড়ে উঠেছে তার মনে।

রাত্রে একই সঙ্গে তারা ভাত খেল, সে আর তার নতুন চাচা। মা সামনে বসে বেড়ে দিলেন নিপুণ ও পরিপাটিভাবে সেই আগের মত।

কালামের থালায় কিছু ভাত তুলে দিতে দিতে—মা বলে উঠলেন, কি পেট ভরে গেল? চিরকালই তুই কম করে খাবি? আর কম করে খেলে কারও যদি উপকার হত, তাও বুঝতাম। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, অন্তত ডালটুকু নাও। কালাম অপলক তাকাল। মার দুচোখে স্নেহ ভালবাসা জ্বলজ্বল করছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পর, স্বামীর হাতে পান ও সুপুরি তুলে দিয়ে মা হঠাৎ বুঝি চকিত হয়ে বললেন, কালাম ঘুমুবে কই? এখানেই বিছানা করে দি?

পরে একটু থেমে বললেন, না থাক। কামু তুমি কাছারী ঘরে ঘুমুতে পারবে না? ওখানেই বরং বিছানা করে দিতে বলি। মশারীটা ভালো করে গুঁজে নিও। আমিই ত আগে গুঁজে দিতাম, তুই এখন পারবি নে?

কালাম থালায় আঁকি-বুকি টানা শেষ করে যখন চোখ তুলে তাকাল তখন তার নতুন চাচা সেখানে নেই। কখন যে নিঃশব্দে চলে গেছেন। মা-ও

হারিকেনের দিকে পিছন ফিরে বাসন-কোসন তুলে দিচ্ছিলেন তাঁর ঝিয়ারির হাতে।

সেই রাতে পাট বোঝাই কাছারী ঘরে ঘুমুতে গিয়ে ছেলেমানুষের রাগ ও অভিমানে মোড়া যা কিছু কালাম ভেবেছে, বড়ো হয়ে সেই ভাবনাকে সে গুছিয়ে নিয়েছিল। তারই আপন মা, বাবা না থাকায় আবার বিয়ে করে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলেই কি মার ব্যবহার ও কথাবার্তা নেহাৎই বুঝি পর পর হয়ে উঠেছে? তবু মা যে তাকে ভুলে যেতে পারেননি, দু চোখের জ্বলজ্বলে স্নেহই তার প্রাণ। সম্পর্কের অন্য পারে এসেও, নতুন স্বামীকে নির্ধারিত ভালবাসা দেওয়ার পরও, সূক্ষ্ম এক সংলগ্নতার মত কি যেন থেকে গেছে। কিন্তু সেই থেকে-যাওয়া নিয়ে কেউ ত তুষ্ট হতে পারে না। কালাম এটা বুঝতে পেরেছে যে, মা ছেলেকে যেমন ভালোবাসতে চান, স্বামীকেও তেমনি। মা সেই ধারণা থেকেই দুজনকে দেখতে গিয়েছেন বলেই বুঝি তার স্বামী ও কালাম দুজনই কেমন বিব্রত হয়ে পড়েছে। আগের স্বামীর ছেলে ও নতুন স্বামী তাঁর একান্ত চেতনার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সেই ছেলে ও স্বামী যে কেউ কারো নয়। ছেলেবেলায় যে ধু-ধুর অন্য পারে গিয়ে তিনি চেয়ে থাকতেন ও হাতছানি দিয়ে ডাকতেন, অমন করেই এখন তাদের দুজনকে তিনি ডাকছেন ভালোবাসার যোগ দিয়ে মেলবার জন্য। তাই তিনি ভালোবেসে বেঁচে আছেন, তবু যাদের ভালোবেসে চলেছেন তাদের দিকটা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। হয়তো এড়িয়ে গেছে বলে দোজবরে সংসারের সমস্ত আবিলতা ও ভ্রূকুটি তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়েছে। সেটুকু কেড়ে নিলে পর, নয়তো ফাঁকিটুকু অনুভবে এলে পর বিভক্ত চেতনা ও পরিবর্তিত ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন না। আগের স্বামীর ছেলে ও তাঁর নতুন স্বামীও যে তাঁর. কেউ পর নয়, পর যেন কখনো না হয়,—মার বিব্রত চেতনায় জীবনের সত্য—মিথ্যা থেকে এটুকু থেকে গেছে।

জানালার পাশে বাতাবী লেবু গাছটার সমস্ত অবয়বে রোদ ছড়িয়ে গেলে যত বেলা যায় তত বেলায় ঘুম ভাঙল কালামের। হাত-মুখ ধুয়ে আসতেই ডাক পড়ল অন্দরে নাস্তা খেতে।

চিড়ে ভাজার সঙ্গে নারকেলের টুকরো চিবোতে চিবোতে তার নতুন চাচা বলে উঠলেন, তুমি কি জন্য এসেছ তোমার মা রাত্রে আমায় তাই জানালো। য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টশীপ নিয়ে বড়ো ঝামেলায় পড়ে আছি। না হলে আমার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে, তোমার ব্যাপারটা একটা ফয়সালা করে দিতাম। তুমি বরং তোমার বড়ো খালার বাড়ীতে যাও। আমি দুটি চিঠি দেব ; একটা তোমার মামাদের, অন্যটা তোমার খালুর, তোমার খালু যা ব্যস্ত মানুষ, শীগ্গীরই রওয়ানা হয়ে যাও, তাঁকে ধরতে হবে ত। তোমার বড়

খালাকে বলো একবার বেড়িয়ে যেতে।

তারপর চায়ের পেয়ালায় দু' চুমুক দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কখনো টাকা-কড়ির দরকার হলে, আমাকে জানিও।

খাটের তলায় রাখা ডার্বি সু-তে পা গলিয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মা তারপরই ঘরে এলেন। কাছে এসে কপালটা ভালো করে দেখে বললেন, কপালে লাল দাগ পড়েছে কি করে? মশারী বুঝি ভালো করে খাটাওনি। দু-আঙুল দিয়ে কপালটা ছুঁয়ে খাটের কোণায় বসে ফের বললেন, বড়ো খালার ওখানটায় যাবি কিন্তু কামু। রাগ করতে নেই। আমার দিকে তাকা, নিজের সংসারে—বলেই চুপ করে গেলেন।

কালাম আস্তে আস্তে বলল, আপনার মেহার গিয়ে কাজ নেই। বড়ো খালু সহ যা করার আমি করব'খন।

মা খানিক পরে বললেন, 'তোর বড়ো খালার ওখানে আমার দুটি ট্রাঙ্ক রয়ে গেছে। বড়ো ট্রাঙ্কটায় আমার কিছু গয়না আছে, ছোট ট্রাঙ্কটায় চারটে গিনি মোহর। তোর দরকারে লাগবে। এখানে আনলে ত দিতে পারতাম না। রিং থেকে চাবি খুলে ফের বললেন, চাবিটা রাখ, নয়তো বড়ো খালার কাছে রেখে দিস্। বড়ো খালাকে দিয়ে আমায় খবর দিস্, দরকার তোর হবেই জানি।

কালাম আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মাথায় আঁচল টেনে মা চকিত হয়ে বলে উঠলেন, এখানে এসে থাকবি?

কালাম তাড়াতাড়ি বলল, না।

মা'র সঙ্গে যে তারপর তার দেখা হয়নি, তা নয়। তবু সেদিনের কথাগুলি নিয়ে কতবার সে নাড়াচাড়া করেছে বড়ো হয়ে। মার সংসারে মা সুখী হতে চলেছেন, সে সুখ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই বুঝি কালামের জন্য মার ভাবনা ও টান থাকা সত্ত্বেও, তাতে জোর নেই কোনও। শুধু ভুলতে না পারায় সংলগ্নতা তাদের জীবনে তারার মত থেকে গেছে। সেই অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম সংলগ্নতাকে বুঝি মুক্তি বলে।

# অশরীরী

**আমিনুর রহমান**

ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে বহু লোমহর্ষক কাহিনী আপনাদের মত আমিও ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই বড় হয়ে ভূত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল। কবরস্থান, শ্মশান, বেলতলা, দাঙ্গার মাঠ অর্থাৎ যেখানেই ভূতের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব সেখানেই ছুটে গিয়েছি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের অভাবে প্রতিবারেই ব্যর্থমনোরথে ফিরে এসেছি। আপনাকে যদি একটা প'ড়ো বাড়ি দেখিয়ে বলা হয় যে, সেটা হানাবাড়ি, তাহলে সে বাড়িতে সন্ধ্যার পর একা ঢুকতে গেলেই আপনার গা ছমছম করবে। তাবপর ফিসফিস, খসখস কতরকম শব্দ শুনেই না আপনি থেকে থেকে চমকে উঠবেন। শেষে দেওয়ালে নিজের ছায়া দেখেই আপনার দাঁতকপাটি লেগে যাবে। এ থেকে কিন্তু ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আমার এক খালু রংপুরের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে থাকেন। শৈশবে একবার মা-বাবার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তারপর আর যাওয়া হয়নি। গত বছব পরীক্ষার পর কলেজের লম্বা ছুটিতে একবার রংপুর বেড়াতে যাওয়ার সখ হয়েছিল। মনের স্ফূর্তিতে প্রথম ক'টা দিন বেশ কাটল। মিয়া পাড়ায় খালুদের বাড়ি থেকে কিছু উত্তরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মনোরম দো'তলা বাগান বাড়িটা সম্পূর্ণ জনমানবশূণ্য দেখে বিস্মিত হলুম। পরে লোকমুখে শুনলুম যে ওটা হানাবাড়ি, ভূতের উৎপাতে ওব ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারে না।

বাড়ির মালিক হাশেম সাহেব ঐ গ্রামের বাস করেন এবং আমার খালুর কি বকম দূর সম্পর্কের মামাত ভাই হন। কালবিলম্ব না করে দেখা করতে গেলুম হাশেম সাহেবের সঙ্গে। আমার পরিচয় পেয়ে আদর করে আমাকে ঘবে নিয়ে বসালেন। তাঁর ষোড়শী কন্যা হেনা চা-নাস্তার ব্যবস্থা করল। চা-পানের পর আমার অভিলাষ ব্যক্ত করলুম। শুনে হাশেম সাহেব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, সেটা কি ভাল হবে বাবা? তোমার বয়স কাঁচা, ঝোঁকের মাথায় জেনে শুনে বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া হঠকারিতা হবে। তোমরা লেখাপড়া শিখে এসব অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাও না, কিন্তু কম

ক'রে তিরিশজন লোক ঐ বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে; এদের অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিংবা স্বর বিকারগ্রস্ত হয়েছিল। ওটি আমার বড় সাধের বাগানবাড়ি ছিল, কিন্তু ভোগে এল না। আমার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে কি কারণে ওটা অভিশপ্ত-বাড়িতে পরিণত হল।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, যদি আপনার অন্য কোন রকম আপত্তি না থাকে তা হলে মেহেরবানি করে আমাকে একটি রাত্রি ঐ বাড়িতে কাটাবার অনুমতি দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার ঐ তিরিশজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেকেই ভুল দেখেছেন, যাকে ইংরেজিতে বলে 'হেলুসিনেশন'। আমি প্রমাণ করে দেব যে ঐ বাড়িতে সুখে-শান্তিতে বাস করার কোন রকম অন্তরায় থাকতে পারে না। আপনার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা আমি পরে শুনব। আমি চাই যে, কোন কিছু আগে থেকে না শুনে আমি ঐ বাড়িতে ভূত সম্পর্কে গবেষণা চালাব।

হাশেম সাহেব যখন দেখলেন যে, আমি নাছোড়বান্দা এবং আমার খালুরও বিশেষ আপত্তি নেই তখন আমার আবেদন মঞ্জুর না করে আর পারলেন না। তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য কয়েকজন লাঠিয়াল সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম, এমন কি তাঁর দোনলা বন্দুকটাও সঙ্গে নিতে রাজি হইনি। কেবল একটা হারিকেন লণ্ঠন এবং একটা ইজিচেয়ার আমার ব্যবহারের জন্য হাশেম সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির চাবিটা আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলুম এবং দিনের আলোয় বাড়ির ভেতরটা ঘুরে ফিরে ভাল করে দেখে নিয়েছিলুম।

রাত এগারটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়লুম। হাশেম সাহেব এবং আমার খালু বার বার সতর্ক করে দিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ দেখামাত্র আমি যেন ছুটে পালিয়ে আসি কিংবা চিৎকার করে পাড়ার লোকজন ডাকি।

জ্যোৎস্না রাত্রি, মাঠঘাট আলোকিত হয়ে আছে। আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ভুতুরে বাগান বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ির সদর দরজার কাছে হাশেম সাহেবের মেয়ে হেনা দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন মাঠের মধ্যে, পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে অত রাত্রে হেনাকে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, এত রাত্রে একা এখানে কি জন্য এসেছ?

হেনা সংক্ষেপে বলল, আপনাকে সেই ঘরটা দেখিয়ে দেব, চলুন।

মনে মনে হাশেম সাহেবের ওপর ভয়ানক রাগ হল। আমি বার বার করে বলেছি যে, এ বাড়ির রহস্য সম্পর্কে আমি আগে থেকে কিছুই জানতে চাই না, তা সত্ত্বেও এত রাত্রে তাঁর মেয়েকে একা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু যে অন্যায় করেছেন তা নয়, তাঁর বিকৃত মনের পরিচয়ও দিয়েছেন।

যদি নিখরচায় জামাই ধরবার ফন্দি করে থাকেন তাহলে তিনি খুবই ভুল করেছেন। রাগ চেপে সংযত কণ্ঠে বললুম, তার দরকার হবে না, আমি নিজেই দেখে নিতে পারব। চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সে ফিরে যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখাল না, নির্বিকার ভাবে বলল, চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও বাড়ির মধ্যে যাব, নইলে আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য বিফল হবে।

এমন একগুঁয়ে মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। তার বাবারই বা কি রকম আক্কেল। আলাপ করবার সময় আদৌ টের পাইনি যে, তার এমন মাথার গোলমাল আছে। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজার তালা খুলতেই চোখের পলকে হেনা আমার পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। আমি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জেলে তাকে অনুসরণ করে চললুম। দোতলায় উঠে একটা ঘরের মধ্যে সে ঢুকে গেল। সিঁড়ির ওপরই লণ্ঠনটা ছিল। হেনাকে উদ্দেশ্য করে বললুম, একটু অপেক্ষা কর লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা একপাশে রেখে ইজি চেয়ারে বসে পড়লুম, তারপর গম্ভীরভাবে হেনাকে বললুম, এইবার তোমার কি বক্তব্য আছে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল। তোমার পক্ষে এই নির্জন বাড়িতে একজন অচেনা যুবকের সান্নিধ্যে থাকাটা যে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু সেটা বুঝবার মত বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে।

জানালার ধারে হেনা দাঁড়িয়েছিল, আমার কথায় ফিরে তাকাল কিন্তু কথা বলল না। তার ব্যবহারটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকছিল বলে এবং এর পেছনে কোন গূঢ় অভিসন্ধির আশংকা করে লণ্ঠনটা তুলে তার কাছে গিয়ে রূঢ় কথা শোনাতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। এতো হেনা নয়। সদর দরজার কাছে জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে ভালো করে তার মুখটা না দেখেই আন্দাজে হাশেম সাহেবের মেয়ে হেনা মনে করে কথা বলে এসেছি। এখন দেখছি একজন সম্পূর্ণ অচেনা তরুণীকে এই পোড়ো বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছি। মেয়েটি যে কি মতলবে এসেছে জানি না, তবে লোক জানাজানি হয়ে গেলে দুর্নামের আর সীমা থাকবে না। রাগান্বিত হয়েই প্রশ্ন করলুম, তুমি কে? তুমি ত হেনা নও। তুমি আমার কাছে কি চাও?

মেয়েটি অবিচলিত ভাবে বলল, হেনা কে তা আমি জানি না; আমি কে তাই আমি জানি না। আমি কি চাই বললে তা আপনি দেবেন?

একটা অজানা আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্বাভাবিক রকম ঘামতে শুরু করলুম। পর

মুহূর্তে মনে হল একটা সাধারণ গ্রাম্য মেয়েকে দেখে এত ভয় পাওয়ার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আমি পুরুষ মানুষ হয়ে একটি কিশোরীকে দেখে ভয় পেয়েছি একথা লোকে শুনলেই বা বলবে কি? কঠোর ভাবে বললুম, বাজে কথা রেখে স্পষ্ট করে বল তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

মেয়েটি বিষণ্ণ সুরে বলল, আমাকে এখানে কেউ পাঠায়নি। আমি পাঁচ বছর ধরে এই বাড়িতে বন্দী। আপনি ত' আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন, তবে কেন আমার প্রতি বিরূপ হচ্ছেন। আপনি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন বলেই ত সামনে এসেছি।

তার কথাগুলো আমার গায়ে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এ যেই হোক সাধারণ মানবী নয়। নিজের অজ্ঞাতসারেই কয়েক পা পিছিয়ে এসেছি। মনে মনে ভাবছি কেমন করে ঐ মেয়েটার খপ্পর থেকে পালান যায়—অথচ ওকে টের পেতে দেওয়া হবে না যে আমি ভয় পেয়েছি। জোর করে মুখে হাসি টেনে বললুম, ও, তুমিই তাহলে এই বাড়ীতে থাক? হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। বেশ ভালই হল, চট্ করে দেখা হয়ে গেল............।

কথা বলতে বলতে এক পা দু'পা করে দরজার দিকে পেছু হটতে লাগলুম। তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে চোঁ-চা দৌড় দিলুম। পরে খেয়াল হল যে দিগ্‌ভ্রম হওয়াতে সিঁড়ির দিকে না গিয়ে বিপরীত পথ ধরেছি। কিন্তু তখন আর ফেরা চলে না। সামনে যে ঘরটা পেলুম ঢুকে পড়েই দরজা বন্ধ করে খিল দিলুম। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। একটু সামলে নিয়ে ঘরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখি জানালার কাছে মেয়েটা আগেভাগে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পকেট থেকে টর্চটা বার করে তার মুখে আলো ফেলতেই সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, দয়া করে ওটা নিভিয়ে দিন, আলোটা বড়ই অস্বস্তিকর।

মেয়েটাব কাছে আমার দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে দেখে নিজের ওপর রাগ হতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি এমনভাব দেখিয়ে বললুম, আমার আগে তুমি কি ক'রে এখানে এসে পৌঁছলে? একটু লুকোচুরি খেলে দেখছিলুম তুমি আমাকে খুঁজে পাও কি না।

মেয়েটি একটু হেসে বলল, সর্বত্রই আমার অবাধ গতি। আপনাব মত আমার ত' আর রক্তমাংসের শরীর নয় যে, দরজা বন্ধ থাকলে আর ঘরে ঢুকতে পারব না।

এরপর আর নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হল না। এই অশরীরিণীর উপস্থিতি আমাকে সম্পূর্ণ অবিভূত করে ফেলেছে। পা দু'টা বিবশ শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিল না। কাছেই একটা ধূলি-ধূসর প্যাকিং বাক্স

ছিল, কোন রকমে টলতে টলতে তারই ওপর বসে পড়লুম। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের গুমোট অন্ধকার অনেকটা দূর করেছিল। মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে আমাকে দেখছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর সবার মত আপনিও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে সাহসী বলেই মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম আমার দুঃখের কথা আপনাকে জানাব, আর আপনিই দয়া করে আমাকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু আপনি যে রকম ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েছেন তাতে আমার মুক্তির কোন আশাই দেখছি না। আমার দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না সবাই ভীতু।

তার কথার মধ্যে এমন একটা বেদনার সুর বাজছিল তাতে আমার মন আপনা থেকেই তার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠল। আমার মন থেকে ভয় এবং সঙ্কোচের ভাব ধীরে ধীরে কেটে গেল। আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললুম, তুমি যদি তোমার দুঃখের কথা আমাকে শুনিয়ে মনে শান্তি পাও, আর এই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাও তাহলে বল, আমি শুনতে প্রস্তুত।

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সে বলল, আপনি শুনবেন? শুনবেন আমার সেই করুণ কাহিনী? আঃ, বাঁচালেন! আমি জানতুম আপনি আর পাঁচ জনের মত নন। আপনি মিছে ভয়ে কাতর হচ্ছেন কেন? আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

আমি সোজা হয়ে বললুম, না, না, আমি আর ভয় পাচ্ছি না। তুমি যা বলতে চাও স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

সে বলতে লাগল, পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত আমি এই বাড়িরই মেয়ে ছিলুম। তখন আমার নাম ছিল রাণী। আমার বাবা, অর্থাৎ আপনাদের ঐ হাশেম সাহেব আমার বিয়ের জন্য বহু জায়গায় সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন কিন্তু একটার পর একটা সবগুলি ভেঙ্গে যায়। কেননা আমার একটা সামান্য খুঁত ছিল এবং সেইটাই সবার চোখে অসামান্য হয়ে দেখা দিল। শৈশবে একটা ধারাল দা নিয়ে খেলতে গিয়ে অসাবধানে আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা কেটে যায়। ঐ ছোট্ট দুর্ঘটনা আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে দিল। বাবা মা, আত্মীয়-স্বজন সবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলুম। আমি নাকি অপয়া, অলক্ষুণে, যার ঘরে যাব তার সংসারেই নাকি অশান্তি ঘটবে। শেষ পর্যন্ত বাবা আমার বিয়ে দেওয়ার আশা একরকম ছেড়েই দিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, সামান্য ঐ খুঁতের জন্য তোমাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হল না? বিচিত্র আমাদের সমাজ আর সংসার।

সে বলে যেতে লাগল, আমার ঐ খুঁত ঢাকবার জন্য লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলুম। কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করেও আমার অলক্ষুণে নাম ঘুচল না। কিন্তু আমি নারী আমার বুকভরা প্রেম ভালবাসা নিয়ে নিজেই জ্বলে পুড়ে

খাক্ হয়ে যাচ্ছিলুম। যতই মনে হত জীবনে কোন দিন কোন পুরুষের ভালবাসা আমি পাব না ততই আমার বুকটা ভেঙে খান খান হয়ে যেত। একদিন বাবা-মা'র গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে এবং হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নিজের জীবনের অবসান ঘটালুম। পার্থিব যন্ত্রণা যদি বা এড়াতে পারলুম, কিন্তু মুক্তি পেলুম না, মনে শান্তি পেলুম না। পাঁচ বছর ধরে অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে সমানে জ্বলে পুড়ে মরছি।

নিজের অজ্ঞাতসারেই পকেট থেকে রুমালটা বার করে আমার অশ্রুসিক্ত চোখদুটো মুছে ফেললুম। তাই দেখে সে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমার দুঃখে তোমার চোখে পানি এল? তুমি কাঁদছ? আ-হ্ মনে হচ্ছে এবার আমি মুক্তি পাব। আমার পাথরচাপা বুকটা হালকা হয়ে আসছে।

তারপর সে আরও একটু এগিয়ে এসে, নতজানু হয়ে বলল, ওগো তুমি আমাকে মুক্তি দাও, একটিবার আমাকে প্রাণখুলে ভালবাস। একটিবার— শুধু একটিবার। তোমার অনাবিল, অকৃত্রিম প্রেমেই আমার মুক্তি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ। ভুলে যাও তুমি এই দুনিয়ার মানুষ, ভুলে যাও আমি অশরীরিণী, একটি অতৃপ্ত আত্মা। তোমার জীবনের একটি সামান্য মুহূর্ত উজাড় করে আমাকে দান কর। একবার শুধু মুখ ফুটে বল তুমি আমাকে ভালবাস।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। কিছুই চিন্তা করতে পারছিলুম না। সে তেমনি অবস্থায় হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে আকুলভাবে আহ্বান করতে লাগল, এসো কাছে এসো প্রিয়তম, একটিবার আমায় নিবিড় করে তোমার আলিঙ্গনপাশে বাঁধ। একটিবার তুমি আমার বুকের মধ্যে এসো, আমার বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দাও—এসো—

আমি তার সেই কাতর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি। যন্ত্র চালিতের মত ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেলুম। আরো কাছে—আরো কাছে। তারপর উন্মত্তের মত দুই হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। সেও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে অক্টোপাশের মত জাপটে ধরল। মাত্র এক সেকেন্ড, না তার এক-শতাংশ সময়ের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। তড়িৎ প্রবাহের মত সে যেন স্পর্শমাত্রই আমার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সংবিৎ ফিরে পেতেই ধূলিময় মেঝের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আমি একা। কেউ কোথাও নেই। টর্চ জেবলে ঘরের কোনখানেই তাকে দেখতে পেলুম না। আমি যেখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলুম সেখানে ধূলার ওপর স্পষ্টই পায়ের ছাপ। আলোর সাহায্যে একটি পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে দেখি মাত্র চারটি আঙুলের দাগ, কড়ে আঙুলের স্থানে কোন ছাপ পড়েনি।

ছুটে চলে গেলুম অন্য ঘরে, সব ঘরই ফাঁকা। সারাবাড়ি থেকে যেন গুমোট

ভাবটা কেটে গেছে। একটা হালকা সংগীতের মূর্ছনা ক্রমশ যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ইজি চেয়ারটা বারান্দায় নিয়ে এসে বাকি রাতটা বিমূঢ় ভাবে বসে কাটালুম। কিন্তু আমার ভাবনার মধ্যে উদ্বেগ বা ভয়ের ছায়ামাত্র ছিল না।

বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার পর আমার উদ্যোগে হাশেম সাহেব সপরিবারে তাঁর সাধের বাগান বাড়িতে নিরুপদ্রবে বাস করতে লাগলেন। সে রাত্রের ঘটনা আমি কাউকেই বলিনি, কারণ যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বাস্তব না স্বপ্ন তা আজও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে আছে। কিন্তু মুশকিল হল যে আমি জীবনে আর কোন মেয়েকেই প্রাণ খুলে প্রেম নিবেদন করতে পারলুম না। কেবলই মনে হয় আমার তো দেবার কিছুই নেই, সবই তো তাকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি, সেও তো সবই আমাকে দিয়ে গেছে।

# শোণিতে শতধা

**জুলফিকার মতিন**

আসুন তার জন্য আমরা প্রার্থনায় মিলিত হই, লোকটি মরে গেছে। লোকটি মরে গেল, অথচ পাড়াপড়শীদের কোন কোলাহল নেই। এই যে গলিটা দিয়ে হরদম মানুষ আসা-যাওয়া করছে, বাড়ীটার কোণা ছুঁয়ে গলিটা এগিয়ে গেছে, একজন যাত্রী রিকশা থামিয়ে পানের দোকান থেকে পান কিনলো, একটু কান্নার আওয়াজে কৌতূহলী হলো, মরার খবরটি শুনলো এবং রিকশায় উঠলো। এ কেমন কথা। একজন মানুষ মরে গেছে, সেজন্য মানুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

আমি কেন দুঃখ পেলাম?—প্রকৃতির নির্দয়তাকে এখন আর ধর্তব্যের মধ্যেই টানছে না রাহুল। তার অন্তিম বসন্তের মাতলামী কার্তিকের ক্ষ্যাপাটে কুকুরের মতো চারদিকে ঘেউ ঘেউ করে ফিরছে। সকাল থেকেই প্রচুর বাতাস টানছে, এবং ধুলো। শীত চলে গেল, এবং লোকটি মরে গেল। শীত চলে যায়, ইঁদুরগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। আরো আরো কত কি হয়। তাতে লোকটির কি?

সে সব তাতে মুখ ভ্যাঙচালো। লোকটি ত আমার মায়ের কলমা না-পড়া স্বামীটি কোথায় গেল? স্বর্গে নিশ্চয়ই নয়। ওই তো লোকটি সটান শুয়ে

আছে। একটুও নড়ছে না। রাহুলের এখন বলতে ইচ্ছে করছে, তুমি বড় বাহাদুর ছিলে। তুমি আমার মায়ের জাত নষ্ট করলে, আর সেই মায়ের ছেলে আমি, শালার অপদার্থ, কারো কিছু করতে পারলাম না। কিছুই করতে পারলাম না--বিড়বিড় করতে থাকে রাহুল। আমার মুখের উপর সটান বলে দিল। আর আমার মা লোকটিকে নিঃশেষ করে দিল।

শেষ রাত্রে খকখক করে কাশছিল লোকটা। শালার বদমায়েস। অন্তিম কাশি।—এখন কাশছো কেন বাবা চাঁদ। সারাজীবন ধরে ফুর্তি করেছ, মেয়েছেলে রেখেছ। আজকে রাতে সেই জোয়ানী কোথায় গেল?

অথচ রাহুলকে উঠতে হয়েছিল। লোকটার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। সে রাহুলের দিকে চেয়েছিল। কিছু বলবে। না বলেনি। আর আমার জননী মুখে কাপড় দিয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে। জোয়ান ছেলের সামনে মুখ দেখাতে শরম করছিল তার। বলিহারি সরম।—তিন বছরের শিশু পুত্রকে রেখে নাগরের সাথে বের হয়ে আসতে বাঁধেনি।...

দুপুর বেলায় ইস্কুল পালালে মাথার ওপর ঝিলিক মারতো কড়া রোদ্দুর। একটুকুতেই ঘাম চুইয়ে পড়তো শরীর থেকে। এক বুক তৃষ্ণায় ছাতি যেন ফেটে যেত। রহিমা খালার ভাঙা দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতো। পানি খেতো। বড় গরীব ছিল রহিমা খালা। বুকে চেপে ধরে আদর করতো। ঘরজামাই থাকতে এসে মরদটা রুচিবদল করতে গেছে অনেকদিন আগে। আর ফেরেনি। আশ্চর্য হাসতো রহিমা খালা। খেতে পেত না। লাউয়ের ডগার মতো হাডডিসার দেহটাতে আশ্চর্য দাঁতগুলো ঝকঝক করতো।

সেই রহিমা খালা কি হয়ে গেল। রাত্রিতে সেখানে নাকি লোকেরা যায়। যায় তো কি হয়! সেটা কি খারাপ কিছু? রাহুলও তো যায়।—না, রাহুল আর কখনো যাবে না সেখানে।

কেন যাবো না?

না যাবে না।

কেন যাবো না? গেলে কি হবে? সারাটা ক্ষণ মুখ ভার করে থাকে রাহুল। দাদিটা সারাদিন খিটমিট করে। বুড়ি,--তেজ কমেনি এক ফোঁটা। সারাদিন রাহুলের পেছনে লেগে থাকে। লোকের কাছে আবার বলে বেড়ায়, আদুরে নাতি। আহা রে আমার আদর। রাহুলের যা খুশি তাই সে করবে। সকালে বিছানা থেকে উঠবে না। ইস্কুলে যাবে না। দিনভর রাস্তায় ঘুরবে। ক্ষিদে পেলে শুধু এসে খাবে। পড়াশোনা লোকে করে কেন? চাকরি পেতে। রাহুলের চাকরির কোনো দরকার নেই। দাদা অনেক ধানের জমি রেখে গেছে। গোলা ভর্তি ধান হয়।

রাহুলের পৃথিবীটা ধানে ধানময় হয়ে যায়।

লোকটা ক্রমাগত কেশেই চলছে। হাঁপাচ্ছে। বুকটা বোধ করি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অসংখ্য যন্ত্রণায় লোকটা সারাজীবন কাতরিয়েছে। অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড মমতা বোধ করে রাহুল। লোকটা তার মাকে সুখ দিয়েছে। অসংখ্য সুখ—লক্ষ লক্ষ সুখের বিন্দু দিয়ে তার মায়ের প্রতি রাত্রির পৃথিবীকে সাজিয়ে দিয়েছে। সর্বাঙ্গে সে সুখ মেখে তার মা পরিতৃপ্ত হয়েছে। লোকটার একটা হাত টেনে নেয় রাহুল। মাংসহীন সে হাত—চামড়া আর হাডডি আলাদা হয়ে গেছে।

আমি কেন এলাম, সেই বিরক্তিকর ভাবনাটা রাহুলকে ভর করলো। বাপটা মরে গিয়েছিল। আর মা-টা হয়েছে কী। মা-টা মরে গিয়েছিল, অনেকদিন অবধি শুনেছে। আহা-রে বাপ-মা কেমন। অবশ্যি, কোবাদকে ধরে যখন তার বাপ ঠ্যাঙানি দিত, আর ব্যাটা ভেউ ভেউ কাঁদতো—তখন মনে হতো বাপটা মরে গিয়ে ভালই হয়েছে। আর যখন শুনেছে এবং বুঝেছে মা'টা হয়েছে অন্য কিছু—তখন মনে হয়েছে মা'টাও মরেছে। মরে গেছে, মরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু লোকটি আমার মাকে মরতে দেয়নি। কিন্তু মার মরে যাওয়াই ভালো ছিলো। সুখী—সুখীর কথাটা মনে হতেই রাহুলের মাথাটা আগুন হয়ে গেল। ও শয়তানী আমাকে মা তুলে গাল দিল। আমি জবাব দিতে পারলাম না। চোরের মতো হেরে গেলাম। সেখানে দাঁড়াবার আর সাহস হলো না। গলাটা শুকিয়ে গেল। মা, তুই কেন এমন হতে গেলি। ওকে আমি বিয়ে করতাম। ও এসে তোর পা টিপতো। মা, তুই আমার সর্বনাশ করলি। তোর সুখের জন্য মা হয়ে আমার সুখ নষ্ট করলি।

তার এখন যাওয়াই উচিত—রাহুল সিদ্ধান্তে দাড়ি টানতে আগ্রহী হলো। লোকটি তো মরেই গেলো। লোকটির বিয়ে করা বউয়ের ছেলেমেয়েরা এসে গেছে। আহা! ফুর্তি করতে এসে লোকটি সকাল বেলায়ই পাড়ি পেল। লোকগুলো চেনার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাবো। আমার কি দায়? মা'টা যদি শিশুকালে আমাকে ফেলে বের হয়ে আসতে পারে, তবে কোন যুক্তিতে আমি তার পক্ষে থাকবো?

লোকটি এসেছিল। আসাটা অভ্যাস—অভ্যাসতাড়িত, কিন্তু আকর্ষণহীন নয়। লোকটি চোখে ঠুলি পড়েছিল। বিয়ে-করা বউটা বুড়ী হয়ে গেছে। এবং বুড়ীটা জবর দখলে খুশী হয় না। এবং অন্য যে সেটাও বুড়ী। তবে এখনো যত্নআত্তি করে। হাত ধরে বসায়। বুড়ো বয়সের হাডডি—বাতে ধরেছে—চাবায়। হাত-পা টিপে দেয়। লোকটা খুশি হয়, হাসে। সে হাসির সরল [illegible] হলো, [illegible] তুইও আরেকটির মতোই বুড়ো আঙুল দেখতিস্। এখন বুড়ী হয়েছিস্। তোর আর খদ্দের নেই। আমিও আর

পারি না। কলতলা থেকে সোমত্ত মেয়েগুলো জল নিয়ে যায়। তাকিয়ে থাকি আর কুৎসিত স্বপ্ন দেখি। সাহস হয় না নেড়ে দেখতে। ফুলবানুরও সাহস হয় না বাজিয়ে নিতে। কিন্তু সব সাহসের বাঁধ একদিন ভেঙেছিল। তুমি আসো কেন—আক্কেল নেই তোমার! ধানের ক্ষেতে রস লেগেছে, কিসের কারবারী তুমি। ধানের আড়ত, আর ভদ্রহাটির হাট,—মাঝে বেতবাড়ির রেল ইস্টিশান। মকিমউদ্দিনের দোকানে চা খেতে খেতে জমসের মিয়া ঘামতো। ফর্সা কাপড় গায়ে থাকে না। দুনিয়ার ধুলো লেপ্টে যায়। রাহুলের দাদা ডাকে, আজকের রাতটা থাইকাই যাও ব্যাপারি। রাতগুলো বড় ভয়ংকর। ফুলবানু তা জানে। বাচ্চা রাহুল কাঁদে রাহুলের মরা বাপটাই যেন জানান দিয়ে যায়,—আমি আছি। নিজেকে বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে দিয়েছি। ক্রমাগত বেড়েই যাবো। এই পাহারার মাঝে ফুলবানু হাঁপাতে থাকে।—না না এই ফাঁকির পাহারা আমাকে গলা টিপে মারবে।—না না ব্যাপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘাসে শিশির। পা জড়িয়ে যায়। গুমোট অন্ধকারে তবু লজ্জা জেগে থাকে। নির্দয় আকাশ বুকে হনহন করে আঘাত করে। বুকটায় ওর বড় জ্বালা, ঠান্ডা বাতাসে কমে না। কে যেন পেছনে ডাকছে।—কি জানো, রাতে হিমে মরে যাই। শন শন শন—একটানা বাতাস বিল থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহীন মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।—না না ব্যাপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘর তো তখন শত্রুর দখলে। রাহুল কাঁদছে—মা মা মা। তার মরা বাপটাই যেন আঁকুপাকু করে খুঁজছে। সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাত্রির আকাশ তখন আশ্চর্য সমাহিত। শব্দহীন লোকালয় ঘেসে এগিয়ে গেছে গঞ্জের সড়ক। ঘুমভাঙা পাখির সহসা চিৎকারে সচকিত অন্ধকার। ফুলবানু কথা বলতে পারছে না।—ব্যাপারী, আমাকে বিয়ে করবে তো! বিয়ে করবে তো? বুকটা এখন হু-হু করে শূন্যে ঠং ঠং বাজে। বুড়ী বয়সের উপসর্গ, ছেলেটা যদি থাকতো। শান্তিতে থাকতে দিলি না। ঘর বাঁধতে দিলি না। এত যখন......দাঁড়িকলস। ছিল না। কখনো জোর করে কথা বলতে পারিনি। রাহুল তার অতিক্রান্ত বছরগুলির দিকে ফিরে তাকায়।—আসলে ওটাই-বা কার জন্মা কে জানে! নষ্ট মেয়েলোক.........। খুন করলেও গায়ের ঝাল মেটে না।

অপরাধ-সন্ত্রস্ত দিনগুলো ভীতিকর অবয়বে প্রতি রাত্রিতে লেহন করতো। ঐ যন্ত্রণা কেন আমার হবে, ঘৃণিত বিবেক অনুচ্চারণে প্রশ্নটার মীমাংসা করে দিতো। আজীবন শীতে ক্লান্ত অন্ধকারে অবদমনের রীতি নেই। কিন্তু নিঃসঙ্গ চারণে তার উপলক্ষ্য আছে। রাহুল তাই ভীষণ একাকী—ভয়ঙ্করতম নির্জনতায় আজন্মলালিত। মা'টা পালালো, কিন্তু তাকে ছাড়লো না। লোকের মাঝে দাঁড়ালে মা'টা তাকে আক্রমণ করতো। ফিসফিসানি শুনলেই তার স্বস্তি

থাকতো না। নির্জনে মা'টা আরো উলঙ্গ হতো। সমস্ত রক্তে শিরায় বিবেকে চেপে বসতো। মা, আমার কি অপরাধ। বাপটাকে দেখলাম না। মা-টাও জ্বালালো। মাগুলো বড় ভালো। আর আমার মা'টা? চোখখোলা রেখেও যে জঘন্য দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে, তাকে কিভাবে বর্ণনা করা যায়। রহিমা খালার ছেলে হয়েছিল। মরা। সারারাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মা ছেড়ে চিৎকার করছিল রহিমা খালা।

কেউ যায়নি। বেহুদ্দ বেজন্মার গোর খুঁড়তেও যায়নি কেউ।

কিন্তু পঞ্চায়েত বসেছিল গাঁয়ে সকাল-বেলাতেই। তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বেজন্মার জাত-বিচার করেনি আগুন। টকটকে লাল সূর্যটাও করে না। সে আগুন ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখছিল রাহুল। কেন যাবো? গেলেই তো অসংখ্য চোখ ঠারবে—বাঁকা হাসিগুলো গাঁথবে। আমার মা'টা আজকে সকালেই আবার উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার সামনে। —বলি বাহাদুর, এখন যে নড়ছ না বড়। আমার মা-টাকে ন্যাংটো করলে। আমারও সর্বনাশের কিছু বাকি রাখোনি। এবং সে সবের কোনো সুরাহা না করেই পটল তুললে। আসলে আমার মা-টা খুব খুশি হয়েছিল। বিগত সন্ধ্যাটাকে মন ফিরিয়ে পড়তে থাকে রাহুল।—মা'টা তোর এখনো বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তো আমার শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। আমাকে নবাব বানিয়ে ছেড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে ফুলবানু।—আমার একটা ছেলে ছিল। হো হো করে হেসে উঠছিল লোকটি। প্রচণ্ড হাসি।—এসে একেবারে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। বুড়ীমার খেদমতে ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে। সে সাহস ফুলবানুরও কি আছে? ভাবতে পারে না, তবু ভাবনাটা জড়িয়ে ধরে। জীবনের কাছে তারও তো অনেক দাবী ছিল। দায়িত্বের প্রতারণায় বরং তা বেড়েছে। বাঁকে বাঁকে প্রচণ্ড প্রলোভন তাকে কুৎসিত করেছে। খুশিই হয়েছিল জোয়ান মরদকে দেখে। ঐ শরীর তার প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়েছে।—কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি ফুলবানু। ছেলেটা তার পরাজিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস বয়ে এনেছে। আমি ঘুমোব—আমি ঘুমোব মা। ঘুমোতে চাই। আমার কি দোষ ছিল মা। অন্ধকারে অন্ধকারে আমি জমে গেছি। আমি উত্তাপ চেয়েছি। সুখীর শরীরের আগুন জ্বলে। আমার শরীরটাও আমার সাথে বেইমানী করলে। কেবল বেড়েই গেল। আর অসংখ্য কামনার ফুলকি ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু মা, তুই যেমন শরীরটা কাজে লাগালি, আমি তা পারলাম না। তুই এসে দাঁড়ালি, সুখী পালিয়ে গেল। মনটা আমার আরো ছোট হয়ে গেল। মা আমি সুখীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। পীরিত করতে বাঁধেনি সুখীর।—ভালোবাসাটা আর বিয়ে করাটা এক হলো! কথার ছিরি দ্যাখ। বিয়ের কথায় ভয় পেল সুখী। আর কোনোদিন আসবো নারে। যার মায়ের

জাত নেই, বড়জোর তার সাথে ফূর্তি করা যায়, ঘর বেঁধে তার সঙ্গে বাস করা চলে না। সুখী দশজনের একজন হয়ে বাঁচতে চায়। হা হা—সুখী লোকনিন্দার কথা ভাবে!—আর আমার মা মাগীটা নিজের সুখটাই দেখলো কেবল। স্বার্থপর। বলি, জননী সুখটা পেয়েছ তো। আঁচলে বেঁধে রাখোনি! নেড়ে চেড়ে দেখবে এপিঠ ওপিঠ। বয়সটা কদিন থাকে, রক্তটা?

দাদীটা কল্লা ছিল, কিন্তু রাহুলকে পাহারা দিতো। বুড়ীটা শেষ হয়ে গেলো। আর রাহুল জমির ধান কাটতে পারলে না। সাত গাঁয়ের মানুষ বসলো দরবারে। মা'টা বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। বাপটা মরলেও নামটা ছিল। আর রেখে গিয়েছিল ধানের জমি। সাতগাঁয়ের মোড়ল পালু শেখ, তাতে চোখ ছিল তার। বুড়ী দাদীটাকে বড়বু বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতো হারামজাদা। দরবারের মধ্যে আবার ন্যাংটা হলো মা-টা, বাপটাও। সাক্ষী আমার জননী নিজেই। স্বভাব নষ্টই ছিল, সোয়ামী মরতেই বার হলো। বাপটা ছিল না, নামটা ছিল। আমার তাও গেল। জমিগুলো গাঁয়ের মসজিদ—যার মোতওয়াল্লী ওই হারামজাদা পালু শেখ। মামলা করবো বেআইনী জবর দখলের বিরুদ্ধে হা হা—আমার জন্য নতুন করে আইন তৈরী করতে হবে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ওরা রাহুলকে ধরে আনছিল দরবারে। আসতে চায়নি নিজে। এবং সে একবার করে মরেছে, আবার জীবিত হয়েছে।

লোকটিকে নিয়ে যাচ্ছে এখন। মৃতদেহটা খাটলিতে তুলছে। নিয়ে নিল। আহা, বেচারা! দুঃখ অনুভব না করে পারে না রাহুল। ভালোই ছিল লোকটি। মাকে বের করে এনেছিল। কিন্তু বয়স ফুরোতেই ঠেলে দেয়নি। মায়ের কথা মনে হতেই প্রচণ্ড মমতা জাগে রাহুলের। লোকটি মরে গেছে, মা-টা এখন আমার। শুধু আমার।

ফুলবানু ততক্ষণে কড়িকাঠে কাপড় জড়িয়ে ঝুলছে।

## সুখের লাগিয়া

**মুহম্মদ সিরাজ**

শোনা যায়, ভর দুপুরের হাজারো রুপালি সুতোয় ঝলমল করা রোদে অথবা চুলের মতন ঘুটঘুটে কালো আঁধারের রাতে মেয়ে মানুষটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

হ্যাঁ, শোনা যায়। তা বলে এ তল্লাট বিছরালে কি সে মানুষ পাওয়া যাবে

না, যে চোখ বড় বড় করে বলবে, হুনা না হে, আমি মাইনষের কথা হুইন্যা কই না। একদিন নিজের কানে কি হুনছিলাম, হুন। নিজের কানে না আইলে এতবার অইতো না।

তারপর গড় গড় করে বলে যাবে।

তবে সে মানুষ আর কটা। বাকি লোকের, এর তার কাছে, তার ওর কাছে শোনা। গাঁয়ের বাইরে তালগাছওয়ালা বৌ-ডোবা পুকুরের উত্তর-পশ্চিমের তেঁতুল গাছটার তলায় কে যায় ঘুটঘুটে আঁধারের রাতে কি ভর দুপুরে। দুপুরে অবশ্য রাখাল ছেলেরা গরুর পাল নিয়ে ওর তলায় 'বল্টু' খেলে। অথবা ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আসমান দেখে। কিন্তু ভর দুপুরে তো আর কান্না শোনা যায় না। সে রকম তিথি নক্ষত্র পড়া চাই তো।

মোটমাট কথা হলো, কে যেন কবে শুনেছে কান্না। সন্দেহ কি বৌ-ডোবা পুকুরেরই ধারের কান্না ওটা। ঠিক নাকি মনে হয়, একটা মেয়েমানুষ হাঁটু গেড়ে বসে মাথার চুল আউলা-ঝাউলা করে দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মাঝে মাঝে হেঁচকি-ও তোলে। চোখে তো আর দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, চোখ টানটান করে তাকিয়ে থাকলে দেখাও যায় বৈ কি! কিন্তু কার অত বুকের পাটা, কার অত সাহস যে কান পেতে থাকবে? ভয়ে দোওয়া কালাম জপতে জপতে ধান ক্ষেতের আইল ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে গাঁয়ের দরজায় হাজির। দেখা তো দূরের কথা, কান্নাটা যে কতক্ষণ চলে তাও কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে না। তবে বলে যতক্ষণই হোক না কেন, মেয়ে মানুষ একটা কাঁদে। কবে সেই কোন্ আদ্যিকালের শাশুড়ীর জ্বালায় একটা বৌ পানিতে ডুব দিয়ে জ্বালা জুড়িয়েছিল। তারপর কতদিন, কত মাস, কত বছর পার হয়ে গিয়েছে—কত গ্রীষ্মে এই পুকুর শুকিয়েছে, আবার বর্ষায় পানি থৈ থৈ করে উঠেছে। এখন এই যে কাকের চোখের মতো কালো পানি টলটল করে, শাপলা পাতা আর লাল সবুজ পানি ফলের লতাপাতা, কলমী ইত্যাদি ভেসে বেড়ায়, তার দিকে তাকিয়ে ওই পানির অতলে মনে হয়, এখনও যেন বৌয়ের শীতল লাল শ্যাওলা শামুক পুঁটি মাছেদের সঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

রজবালী বিড়ি টানতে টানতে বলে, তোর ভুল। ইতা আন্দাজী কতা তোর। হেই বৌ মাগীটা কুম্বালা কোন্ জমানায় মরছে তার ঠিক নাই। আবার কাঁদে অহনও। ইতা তো মাইনসের বানাইল কিচ্ছা।

'কিচ্ছা কি গো'—তাজ্জব বনে জৈতুন গালে হাত দেয়। মাটিতে পাতা বিছানার উপর কাৎ হয়ে সোয়ামীর গায়ে গা মিশিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, 'এই যে তুমি আমি রইছি, একদিন মইর‍্যা তো যামু। তা বাদে মাইন্ষে আমরার কথা কওয়া বলি করবো, হেইডা কি কিচ্ছা অইবো?'

রজবালী অতশত বোঝে না। বিবির কথা ভালো করে শোনেও না। আদতে জাত তো সেই আওরৎ। কত আর বোঝে! রজবালীর চেয়ে বেশী বোঝে কি? কখনো না।

আরে বাপু রজবালী কি নিজে কোনোদিন যায়নি নাকি বৌ-ডোবা পুকুরের কাছে? কতবার গিয়েছে, কতবার গোছল করে এসেছে। কই কখনো তো তেমন মনে হয়নি। গাঁয়ের বাইরের পুকুর। গা ছমছম তার জন্যে করতে পারে। পশ্চিম দিকটায় খুব উঁচু। তাতে আবার বেসুমার ঝোপ। সেদিকে তাকালে কি চার পাশের শূন্য ধু ধু ঘুঘু-ডাকা ধানক্ষেতের দিকে তাকালে গা ছমছম করা বিচিত্র নয়। আর কালো পানি বাতাস-লাগা ছোট ছোট ঢেউ, ফোঁটা ফোঁটা শাপলা অথবা থালার মতো শাপলা পাতা, অথবা হুস করে ভয়ানক শব্দ তুলে উড়ে-যাওয়া এসব দেখেও বার কতক গা-ছমছম করতে পারে। কিন্তু পানির তলায় মেয়ে মানুষ শুয়ে আছে তা মনে হয় নাকি? বিবি আবার ডাইনী নয় তো? বিশ্বাস নেই। ডাইনী মেয়ে মানুষ নাকি মানুষের পেটের ভিতরকার সব জিনিস দেখতে পায়। একবার তাকালেই রক্ত মাংস চামড়ার ভিতরকার কি বস্তুটি আছে, তা বলে দিতে পারে। এ বিবিও কি সেই যাদু টোনা মন্ত্র জানে? সেই জোরে বলে দিতে পারে, পানির তলায় একটা মেয়েমানুষ শুয়ে আছে। না, রজবালী বিবিকে সেকথা জিজ্ঞেস করেনি। সে সাহস তার নেই। তবে সে মনে মনে বুঝেছে, এটা ভালো নয়। বিবিতেও বুঝিয়েছে, ওরকম মনে করা খুব খারাপ। একলা পুকুরে কোনোদিন গেলে চমকে উঠতে পারে। বেহুঁস হয়ে উল্টে পড়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং মুছে ফেল মন থেকে ওসব। ও নিয়ে ভেবো না। কিন্তু ভেবো না বললে কে শোনে? কি যে হয়েছে বিবির! নাবালক বিবি হলে এই এক জ্বালা!

বর্ষাকালে পাটের নাও বেয়ে আশুগঞ্জে যাবার পথে দেখেছিল ঐ মেয়েকে। কালো রঙ, স্বাস্থ্য দোহারা, চোখ দুটি বড় বড়, ঘোর টিয়া রঙের শাড়ী পরে বাড়ীর ঘাটায় দাঁড়িয়েছিল। কি যে হয়ে গেল রজবালীর। পানিতে বৈঠার টান মারতে মারতে আড়াই সিধা পার হয়ে যাবার পর বাড়ির ঘাটায় ওকে দেখে বুকের মধ্যে গরম রক্ত যেন আছালি-পিছালি করে উঠল। আশুগঞ্জ থেকে ফেরার পথে ওই মেয়ের নাম ঠিকানা সব জেনে ফেলল।

তারপর ঘরে ফিরে মিয়াভাইকে পাঠালো শাদির পয়গাম দিয়ে। না, আপত্তি হল না। ওরা মেয়ে দিল, বাপের তো রোজগার পাতি নেই। আশুগঞ্জের পাটের কোম্পানিতে পাটের দাদনদারী করে, মা গেরস্থবাড়ীতে ভাড়া ভানে, ঢেঁকি পাড়ায়, তারা এমন জামাই ছাড়ে? তবে জামাইয়ের হাত ধরে মা বলে দিয়েছিল, দেহেন, জামাই মিঞা নাবালেগ মাইয়া, হের দুষ অপরাধ আল্লার-ওয়াস্তে মাপ কইরা দিয়েন।

তা রজবালী দোষ অপরাধ বেবাক মাপ করে নেয় বৈ কি! কিন্তু বিবির যে দিনকে দিন কি সব হয়ে যাচ্ছে। কখনো সখনো খুব উদাস হয়ে বসে থাকে। ডাকলে সাড়া দেয় না। অপার বিস্ময়ে সামনে চেয়ে থাকে। কি দেখে কে জানে। তখন ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হয়, ওর মন থেকে দূরে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছে।

পলকহীন বড় বড় চোখের সেই শূন্য দৃষ্টিতে রজবালীর বুক কাঁপে। ভয়-ডর এবং বিস্ময় যুগপৎ তার শরীরে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ওই দৃষ্টির সম্মুখে অথর্ব করে দেয়।

রজবালী বললো, তুই বইয়া বইয়া কি চিন্তা করছ?

—'কুছতানা। কুছতা চিন্তা করি না আমি।'—জৈতুনের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। ঘাড় নেড়ে কানের রুপোয় মাকড়ি নাড়িয়ে বলে, 'ক্যারে জিগাও একথা?'

'ক্যারে জিগাই?'—রজবালী বলে, 'ঘরে আইলাম, তা আমার ফিলতো চাইয়াও দেখলি না। যেমুন বেখেয়াল আছলি তেমুনই রইলি।'

'ই আল্লা, এই অক্ষণই তো তুমি আইলা গো!'—জৈতুন উঠে দাঁড়ায়।

'এই অক্ষণ আইছি?' বেড়ায় হেলান দিয়ে রজবালী বললো, 'লাইজ্যারক্ষণ অইলো আইছি।'

রজবালীও ভেবে পায় না, মেয়েমানুষটা কি ভাবে। এ কি কোন বেমার নাকি! হতে পারে হয়তো। বেমার তো হরেক কিসিমের। এদিকে মেয়ে মানুষটা তো অন্য সময় ঠিক। খায়দায়, রান্নাবাড়া করে, পড়শির সঙেগ আলাপ-সালাপ করে, পুকুর থেকে পানি আনে, রজবালী দেরী করে ফিরলে অথবা না বলে কোথাও গেলে বকাবকি করে। দোষের মধ্যে এই ভাবনা। কার কাছে কিচ্ছা শুনেছিল কে জানে! রাতে রজবালীর কাছে তারপর কথাটা পেড়েছে। রজবালী হেসেছে। বলেছে, ''ধুস ধুস, মাইয়া মানুষের কান্না না কচু। ইতা মাইনষে বানাইছে।'

কিন্তু বিবি তা বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস না করাতে রজবালীর যে সে-সময় কিছু লোকসান হয়েছে, তাও নয়।

তবে দিনে দিনে সে টের পাচ্ছে, লোকসান তার একটা হয়েছে। বৌ-ডোবা পুকুরের পেত্নী তার বিবির মাথায় ঢুকেছে। বৌ-ডোবা পুকুরের ইতিহাস যে যতটুকু জানে, তার হাজার গুন জেনে ফেলেছে বিবি। যে-বৌ ডুবেছে, সেই কোন্ আদ্যিকালের তার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা, পান পাতার মতো ঢলঢল মুখ, দুধে আলতায় গোলা রঙ, পটলচেরা কালো ভ্রমর চোখ, কোমর বরাবর আঁধার রাতের মতো চুল থেকে কোথায় ছিল বাপের বাড়ি, কজন ভাই, কজন বোন শাশুড়ী কেমন কষ্ট দিতো, কেমন খেতে দিতো না, মুখে গোবর পুরে

দিতো—ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে পুরো আখ্যানটাই গলাধঃকরণ করে ফেলেছে। আর দিন দিন সোয়ামীর সামনে সে উগরে দিচ্ছে। এ পাড়ার কালুর মা, ওদিকের মিস্তিরী বৌ, যার পেটে যতটুকু আছে, জৈতুন সবটুকু বের করে নিয়েছে।

শুনতে তার কষ্ট কি? মাঝে মধ্যে তো শুধু এ্যাঁ হুঁ বলে সায় দেওয়া, কখনো-বা বিস্ময় প্রকাশ করা।

তবে তার মধ্যেও একদিন রজবালী বলে ফেললো, 'বৌ-ডুবা পুকুইরের অতো কিচ্ছা হুইন্যা তোর ফায়দা অইছে কি?'

'ফায়দা'—জৈতুন একটু থমকে বললো, 'কুছতা না।'

'তয় যে তুই এর কাছে ওর কাছে খালি জিগাছ!'—রজবালী কঠিন প্রশ্ন করে বিবির চোখের দিকে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলো।

—তা জিগাই।

—ক্যারে?

—ভাল্লাগে। জানো বৌটার কথা হুনতে জবর ভাল্লাগে গো। আহা, হুর-পরীর লাগান বৌ আছিল, বড় বড় চোখ, পানের পাতার মতো মুখ......।'

—তা তোর কি?

—কুছতা না।

—'তুই আর ও কথা কইছ না। গেরামে বহুত পুকুর আছে। আর এ পুকুরে যাইছ না!'—রজবালী যেন ঝেড়েমুছে সব সাফ সুতরা করে দিল। পুকুরে গেলেই নিশ্চয়ই বৌটির কথা মনে হয়? তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

তখনকার মতো চুপচাপ। তার পরের কয়েকদিনও চুপচাপ। রজবালী ভেবেছিল, সব ঠান্ডা হয়ে গেল। বিবির মাথার পেত্নী নামলো।

কিন্তু একদিন জৈতুন ফিস ফিস করে ভয়-পাওয়া গলায় আজব কথা বলে উঠলো, 'ওগো, আমিই হেই বৌটা। আদতে হেই বৌটা আর আমি এক। জানো আমার হাউড়ী আমারে এক......।'

—'মুখ বন্ধ করো'—জৈতুনের কণ্ঠস্বর এবং কথা শুনে রজবালী রেগে উঠলো। কত আর সহ্য হয়। সারাদিন কাজ করে। তার ওপর ঘরের মানুষ যদি এমন পাগলামো করে, তবে কতক্ষণ ভালো লাগে?

—'ওমা বিশ্বাস কর।' জৈতুন দমলো না। হাৎনার খুঁটিতে হেলান দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে চললো, 'তুমারে রাইতেই কইতাম গো। হারা রাইত ঘুম অয় নাই আমার। খালি চিন্তা করছি।'

খুব সকাল এখন রোদের হলদেটে ভাব কাটেনি। পাড়াপড়শি সবে মাত্র জাগছে। ওধারে খড় চিবুচ্ছে গরু। নিত্যকার কাকটা এসে ডাকছে। ঘরের পাশে জিগার গাছের ডালে শালিক আর চড়ুইগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছে।

গোপাটে মানুষজন হাঁটছে।

রজবালী বললো, 'তোর পাগলামী কথা রাখ। পানি ভাত আছে নি দে।'

—আহা হুন না ছাই। আমি সে বৌটাই গো। আমার অখন হগল কথা মনে পড়তাছে।

জৈতুন অল্পক্ষণ, থামলো। তারপর বলে চললো, 'আমার ঘর আছিল পছিম আড়ি। কি বড় বড় ঘর গো। আমার হাউড়ী, মাথায় পাকনা চুল, গতরের চামড়া কুঁচকানো, আমার এক দেওর গো......। হুন হুন আমার হাউড়ী আমারে কি কইতো হুন......।'

রজবালী তাজ্জব বনে স্থির হয়ে রইলো। জৈতুনের কথা সে থামাতে পারলো না। তাকিয়ে থাকলো। তারপর এক সময়ে ভয়-পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলো, জৈতুন! জৈতুন!

চমকে উঠে কাঁপা গলায় জৈতুন বললো, কি?

—'কাইল তুই বৌ-ডুবা পুকইরে গেছলি বুঝি!'

'না।'

—'মিছা কথা কইছ না?'

—'গেছি না গো।' জৈতুন খুঁটিতে শরীর এলিয়ে দিল। যেন পেরেশান সে। তারপর ক্লান্ত স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, আমি অতোক্ষণ কি কথা কইছিলাম গো?'

'জানি না, আমি জানি না।' রজবালী কি বলবে ভেবে পেল না। মাথা নাড়া দিতে থাকলো শুধু। বুঝতে পারছিল না, বৌ-ডোবা পুকুরের পেত্নী, না, হঠাৎ মাথা গরম হলো বিবির। জ্বর এসেছে নাকি? জ্বরের ঘোরেও তো মানুষ প্রলাপ বকে।

রজবালী বৌয়ের কপালে হাত রাখলো। ঠাণ্ডা। জ্বর নেই। তাহলে পেত্নী ভর করলো নাকি মাথায়? কিন্তু পেত্নী ভর করলে তো এরকম থাকতো না। এত ভালো মানুষ। হাঃ হাঃ করে হাসছে না, কাঁদছে না, হাত-পা ছুঁড়ছে না। পেত্নী ভর করলে গোঁ গোঁ করে মানুষ। তাও করছে না। কলিমুদ্দি এসে পরখ করে বললো, নারে পেত্নী না। তোর বিবি চিনতে পারছে আমারে, খাওয়া-দাওয়া করে ভালো মানুষের লাগান, কথাও কইতাছে। পেত্নী ভর করলে তো অতোক্ষণ ফাল্‌লাইয়া গাছে উঠতো।'

কলিমুদ্দি দোস্ত মানুষ। হামেশাই ঘরে আসে। বসে গল্পগুজব করে। রজবালীর বিশ্বাসও আছে কলিমুদ্দীর ওপর। তাই দোসরা ওঝা ডাকেনি। আগেই ডেকে এনেছে দোস্তকে দেখো, শোনা, তারপর বলা।

ঘর থেকে বেরিয়ে চাপা গলায় কলিমুদ্দী বলার পর রজবালী বললো, 'তা অইলে কি?'

—'মনের রুগ অইছে। মাথা গরম অইছে।' কলিমুদ্দী ইকড় ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ লোকের মতন, যেন এরকম বহু মানুষ সে দেখেছে, এমন করে বললে, 'কোনো ডর নাইরে। ইডা ঠিক অইয়া যাইব।'

—'তুইও. কছ ঠিক অইয়া যাইব? আমার তো কেমুন ডর লাগতাছে।'

—'তুই তো আগে কইলে না আমারে।'

—'আহা ইডা কি কওয়ার মতন? যহন কইতাছে যে আমি হেই বৌটা, তহনই তো ভাবনা অইলো আমার। কিন্তুক দেখ ভাই, আর কোনো মানুষের কাছে কইছ না। কইলেই বিপদ। ঘরে মাইনষের লাইন লাগবো পিঁপড়ার মতন।'

এ বলবে একথা, সে বলবে সেকথা। একটা হৈচৈ কান্ড, নানান লোকের নানান মন্তব্য। আহা উঁহুতে মেয়ে-মানুষটা আরো ক্ষ্যাপা হয়ে যাবে। তবে এটা কিন্তু সত্যি, জানতে বাকি থাকবে না গেরামের। জৈতুনই বলে দেবে সবাইকে। তবু যতক্ষণ ঢাকা-চাপা রাখা যায় আর কি। কলিমুদ্দী বললো, 'বৌ-ডুবা পুকুইরে আর যাইতে দিছ না।'

—'অহন তো আর যাইতে দেয় নারে।'

—'ঠিক আছে, দেখ দুদিন ভালো কইরা বুঝ, তা বাদে ব্যবস্থা করুম।'

দুদিন কেন রজবালী বেশ কয়েকটা দিন রাতে বৌয়ের পাশাপাশি থেকে কাজেকামে জলাঞ্জলি দিয়েও তো বুঝতে পারছে না বিবির কি হলো। মাথা গরমের তো কোনো চিহ্ন নেই? আজে বাজে কোনো কথাও বলে না। ঘরের কাজকাম যেমন করে, তেমনই করে। লোক চিনতে পারে। হাঃ-হাঃ করে হাসে না। নতুন বিবি মতন বেগানা পুরুষ দেখলে মাথায় ঘোমটা দেয়। তবু তার মধ্যে কি যে হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রজবালী বেশ বুঝতে পারছে ওর খাওয়া কমেছে, শরীরটা শীর্ণ হয়ে উঠেছে। চোখ গুলোও বেশ বড় বড় হয়ে গিয়েছে। শরীরের যত্ন নেয় না, ভাল করে তেল মাখে না, কাপড়-চোপড় কাচার দিকেও নজর নেই। তাছাড়া কথাও বাড়ছে। এখন আবার পানিতে ডোবার কথা বলে। কেমন করে পানিতে গিয়েছিল, সেই কালো-পানির তলে দম বন্ধ করা ভর-দুপুরের সেই অসহ্য কষ্ট, শীতল পানিতে জোর করে দেহকে চেপে রাখা, তারপর ক্রমশ চেতনার অবলুপ্তি, সয়ে সয়ে আসা কষ্টবোধ, লুপ্ত হয়ে যাওয়া ঠান্ডা পানি অনাবিল শান্তি, দেহের কোষে কোষে তীব্রতম সুখানুভূতির আশ্চর্য মুহূর্তগুলো বলতে বলতে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সারা শরীরটা যেন নেচে নেচে ওঠে। বলে, 'কি সুখ গো, কি সুখ। অদ্দিন বুক জ্বলছিল, মন জ্বলছিল, শরীর জ্বলছিল। বেবাক জুড়াইয়া গেল আমার।'

রজবালী চোখ বন্ধ করে শুধু বলে, 'চুপ কর মাগী। তুই চুপ কর। আর

শুনতে পারি না। তোর মনে কোনোদিন দুঃখ দেই নাই। সংসার কইতে তুই আর আমি। ঝামেলা নাই। তোর তো হাউড়ী-হুউরও নাই। তোরে কষ্ট দেওনের কেউ নাই। তো তুই যে ক্যারে ইমুন করছ বুঝি না।'

জৈতুন কিন্তু নির্বিকার। যেন জিভের ডগায় অজস্র নাড়াচাড়া খেয়ে বের হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। আর অবিরত বের হয়ে, উপচানো পানি-স্রোতের মতো বের হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে কলিমুদ্দী একদিন বললো, 'ম্যারে আমারই ভুল অইছে। অহন বুঝছি, তোর বিবিরে আদতে বৌ-ডুবা পুকুইরের পেত্নীটাই আদুর করেছে। হেই মাইয়ালোকটার রুহটাই পেত্নী পেত্নী অইয়া তোর বিবির উপর আছর অইছে।

রজবালী চোখ বড় বড় করে বললো, 'হ্যাঁচাই না কি? তাইলে কি অইবো?'

—'কুছতা অইতো না। ইডা ঠিক অইয়া যাইবো।'

—'তার বাপের বাড়িত্ খবর দিমু নাহি রে?'

—'তা দিতে পারছ, তারা আইয়া লইয়া যাউক। না অয় বিবিরে লইয়া তুই নিজেই যা। মোটকথা, ইহান থিক্যা সরাইয়া লইয়া যা।'

রজবালীর বেশ পছন্দ হলো কথাটা। বললো, 'ইডাই ভালো অইবো।'

কিন্তু বাপের বাড়ি আর যাওয়া হলে না। পরদিন রাতে বিছানায় শোবার পর আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে রজবালী দেখে, বিবি তার পাশে নেই। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ত্রস্তে উঠে বসলো বিছানার ওপর। তারপর উঠে দাঁড়ালো। বাইরে বেরিয়ে এলো। চারপাশ নির্জন, নিস্তব্ধ। চমৎকার চান্নিতে চারদিক ভরা। গাছে, ঘরবাড়িতে মায়াবী ছায়া পড়েছে। দূরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। ঘর থেকে পায়ে পায়ে বের হলো রজবালী। যা ভেবেছিল, হলো তাই। জৈতুন বেরিয়ে গিয়েছে ঘর থেকে। হ্যাঁ, এই আশঙ্কাই করছিল রজবালী। দিনে নয়, রাতে জৈতুন বেরিয়ে যেতে পারে। আর হাজির হবে ওই পুকুর পারে। পেত্নী! পেত্নী! এ পেত্নী না হয়ে যায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্না পক্ষ ধরে হনহন করে রজবালী বৌ-ডোবা পুকুরের দিকে হাঁটতে থাকলো। দ্রুত পার হয়ে গেলো ধানক্ষেতগুলো। পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়ালো। ওই তো শাড়িটা পড়ে রয়েছে। রজবালী প্রায় ছুটেই এসে শাড়িটার সামনে দাঁড়ালো। তারপর পানির দিকে তাকালো, দ্রুত তালে বুকে বাজনা বাজছে। উষ্ণ রক্তস্রোত আগুনের মতন শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে দ্রুত গতিতে চলাফেরা করছে। চোখের সামনে জ্যোৎস্নাপড়া পুকুরের পানি, গাছের ছায়া, জ্যোৎস্নার নিবিড় রং যেন অলৌকিক অত্যাশ্চর্য এক জগত তৈরী করেছে। রজবালী ভয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো, 'জৈতুন! জৈতুন!'

কোনো শব্দ নেই। জ্যোৎস্নাধোয়া এই রাতে বৌ-ডোবা নির্জন পুকুরের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর আকুলি-বিকুলি করতে থাকলো শুধু। তারপর, তার যেন আশ্চর্য স্তব্ধতায় মনে হলো, কে যেন তেঁতুলতলায় হাঁটু গেড়ে মাথার চুল আউলা-ঝাউলা করে বসে আছে। মায়াময় জ্যোৎস্নায় সেই ছায়া শরীর মৃদু মৃদু কাঁপছে। তার সঙ্গে ফোঁপানো কান্না।

—'জৈতুন, তোরে তো কোনোদিন দুঃখ দেই নাই। তুই তুই কই গেল? জৈতুন!'

—'গা-গতর আমার জ্বইলা গেছিলগা গো। এর লাগি পানির তলে গিয়া ঠাণ্ডা করলাম।'

—'গা গতর জ্বইল্যা গেছিলগা? ক্যারো?'

—'তুমি তো জানো না গো, পুরুষ অইয়াও তুমি যে পুরুষ না। তুমি তো জানো না গো, একদিনের লাগিও আমারে সুখ দিতে পারো নাই।'

—'জৈতুন!'

আর কোনো শব্দ নেই। রজবালী এই জ্যোৎস্নায় বৌ-ডোবা পুকুরের কালো উজ্জ্বল কাঁচের মতন অন্ধকার আবছায়া পানির দিকে তাকিয়ে পর মুহূর্তে পাগলের মতন পুকুরের শুকনো ঘাসের পাড়ের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। যেন জৈতুনকে ছেড়ে, এখন মায়াবী জ্যোৎস্না এবং রহস্যময় এই পুকুরের সঙ্গে খেলা শুরু হলো তার।

# অশ্বারোহী

**করুণাময় গোস্বামী**

বড় রাস্তার পাশেই একটা বিরাট প্লট নিয়ে বাড়ী করেছেন সামাদ সাহেব। সে আজ দশ বছর। তখন জমি সস্তা ছিল, সুরকি সিমেন্ট অতটা মহার্ঘ ছিল না। সুন্দর ফলকে নাম লিখছেন, গেট করে যথারীতি কুকুর থেকে সাবধান করেছেন।

পাশেই, ধরুন, গোলাকৃতি টিনের আস্তাবল ঘিরে একটা ঘিঞ্জি বস্তি। সামাদ সাহেব তো দশ কিংবা বিশ বছর ধরে এমনি দেখছেন। সে এলাকার কোনো নাম আছে কি নেই—সামাদ সাহেব জানেন না। সাত বছরেও কোনো হলুদ ব্যাগের ডাক-পিওন ওদিক মাড়ায়নি, ওদের কোনো পত্র নেই বলে। শুধুই ঘোড়ার মলের গন্ধ। পচা বা সদ্যমল আর চনার গন্ধে সর্বক্ষণ লেপ্টে

থাকে ওদের খুপরি, কাঁথা, কাঠের চিরুনি, তামাক পাতার বোঁটা, পেয়াজের খোসা। শুধু গন্ধে ডুবে থাকে ওরা। সুন্দর শ্বাস নেয়, কদাপি সেই অশ্বগন্ধী বাতাসকে ফেরায় না। আর অন্ধকারে। লাইট পোস্ট রাস্তার মোড়েই শেষ। আলো আর এগোতে পারে না। শুধুই তরল অন্ধকার নিমজ্জন।

উত্তরের জানালা সামাদ সাহেব কখনো খোলেন না। যদি শিক গলে সগন্ধ অন্ধকার কোঠায় ঢুকে পড়ে। দৈবাৎ ছাদে গেলে ওপাড়ার কোলাহল শোনা যায়, ইতর শব্দের ছোড়াছুড়ি নারী আর শিশুদের কণ্ঠে। দু' একটা গাল কুড়িয়ে এনে সামাদ সাহেব জিভের ডগায় বাজান, বিছানায় স্ত্রীর কানে গালগুলো বলে আদিরসে ঝাঁঝালো করেন।

ভোর বেলাকার আস্তাবলের চারিদিকে ঘোরানো নর্দমার ধারে বসে বাচ্চারা মুড়ি খায়, কিংবা দু'-একটা রুটির টুকরো আনন্দে চিবোয়। মাঝে মাঝে নর্দমার জলে মৈথুনরত মশাদের গায়ে ঢিল দেয়। ততক্ষণে পাড়ায় শিক্ষাদান হয়, ইহা কি?—ইহা একটি ঘোড়া। সামাদ সাহেব নিজেই তার ছোট ছেলেকে পড়ান, দি হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিম্যাল।

সেই ভোরের আলোয় ব্যায়াম করাতে ওরা রমনায় নিয়ে যায়। একটি বয়েসী মেয়ে চোখ টিপে বলে, দেখরে সখিনা, ঘুড়িটার পাছা কি তাজা।

তাজা তো হবেই, ছোলা খায় কতো, আর ভোরের ব্যায়াম।

আবিদের মা ছাব্বিশ-বছরি পাছায় হাত দেয়, গেঁজান দাঁতের মতো কটা হাড় শুধু আর বিড়বিড় করে বলে, কচি ছেলেটার গতরাতে কী ভীষণ জ্বর। বুকের তলায় সর্দির কী গমগম শব্দ। তবু ঘোড়াটাকে ওর বাপ হাওয়ায় নিয়ে গেলো। একটা নেড়ী কুত্তিকে কিশোরলালেব বউ বাপ-মা তালই তুলে আজগুবি গাল দেয়। বাচ্চারাও ঘোড়ার গল্প কবে। খোড়াব লেজের, ঘাড়েব চুল কাটা হয় সপ্তাহে তো বটেই। কেউ ভাবে জকি হবে। শোনা গেছে, জকিদের ফুর্তির জীবন। বর্ণালী পোশাক ছাড়াও, দৌড় দৌড় খেলা। ইত্যাদি ইত্যাদি গল্প হয় নর্দমার ধারে বসে।

খুপরির কুলুঙ্গিতে, বাঁশের পেটরায়, পানের চোঙায় যে-আঁধার চাপ-চাপ বাড়ে, কী কৌশলে সে নর্দমার ধারে শিশুদের মধ্যে খেলাচ্ছলে মিশে যায়।

রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা পুরোনো ঢাকায় কিংবা গ্রামান্তরে বিদ্যালয়ে পড়া হয়ঃ ঘোড়ায় চড়িল, আছাড় খাইল। মাধ্যমিক স্কুলে গ্যালিভারি ভ্রমণের চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা হয়ঃ অশ্বেরা প্রজ্ঞাবান। ঘেন্না জাগানিয়া মনুষ্যেরা ইয়াহুর নামান্তর। অশ্ব হয় মহত্তম প্রাণী। কেউ কেউ বাধা দেয়, মনে হয় করি করি, কিন্তু হয় না।

হাওয়ায় ভ্রমণ শেষ করে ঘোড়ারা ততক্ষণে আস্তাবলে ফেরে। কেউ কেউ

নিজেদের বিষ্ঠাগন্ধে ম ম বাতাসের দলা থু করে আকাশের দিকে ছোঁড়ে। ধারালো চিরুনি দিয়ে ফেলু কিংবা আবিদের বাপ ঘোড়াদের অঙ্গসেবা করে। তালে তালে খসখস শব্দ অনেকটা হকারী গানের মতো লাগে। ফেলুর স্ত্রী ভাঙা কাঠের কাকইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা লম্বা কালো নখ দিয়ে মাথার উকুন আনে। আবিদের বাপ ফেলুকে ইশারা করে। লাল টকটকে ঘোড়াটা ফেলুর ঘোড়ীর গাল চেটে দিচ্ছে, দুই কষে শাদা ফেনা জমে ওঠে। ঘুড়িটাও আধবোজা চোখে গালটা দিয়েই থাকে। ফেলুর বউ সেই দৃশ্য অপলক চোখ মেলে তেত্রিশ-বছরি ফেলুকে বলতে আসে, তোমার গামছাটা দাও, ধুয়ে দিই। আর তোমার চুলটা বেশ বড় হয়ে গেল।

সর্দির ঝাঁঝে আবিদের বাপ চিৎকার করে, কী-রে, কী রে ভাত দিবি না?

ঘুড়ীটা কেঁপে উঠে গলা সরিয়ে নেয়।

আবিদের মা দুটো গাল, আর একটা জবাব ছুঁড়ে দেয়। একবার যখন, হোক না বিলম্বে আরো। সুরুষ নিরুত্তর। স্বগত বিড়বিড় করে আকাশকে গাল দেয়। পাশের খুপরিতে একটা নিয়া বৌ মারের চোটে ভীষণ চেল্লায়। গাজারে বেহারীর ছেলে খকখক কাশে। রগদুটো সটান তারের মতো বের হয়ে আসে। সর্কাসের সঙের মতো দুই ছোকড়া কুস্তি লড়ে। নেড়ী কুত্তাটা আবার খুপরিতে গিয়ে ভাতের পাতিলে মুখ দেয়।

খুপরিতে কুলুঙ্গিতে বাঁশের পেটরায় পানের চোঙায়, কাঁথায়, বালিশে যে-আঁধার চাপ চাপ জমে, কী কৌশলে নর্দমার ধারে সুরুষ বা ফেলু কিম্বা গেঁজেল কিশোরলালের কাঁধে চেপে বসে।

বড় রাস্তার মোড়েই আলোর খুঁটি শেষ। নীলিমার রুপালি উত্তাপ নর্দমায় পড়ে শুধু বাতাসকে দুর্গন্ধ করে। অন্ধকার গাঁজার নেশার মতো ওদের গ্রাস করে নেয়। ফেলু কিম্বা সুরুষ কেবল ঝিমোয়। সুরুষ কিম্বা আবিদের মা কিম্বা চিল্লান নতুন বউ অন্ধকারে নরম বালিশে দিবানিদ্রা দেয়।

সামাদ সাহেব তো পড়ন্তবেলায় সুরুষকে দেখেই অবাক। কই, দশ বছরের মধ্যেও তো কেউ তার গেটের ভেতর ঢোকেনি। ব্যাটাদের সাহস বেড়েছে।

হুজুর, আবিদের, মানে আমার ছেলের ভীষণ অসুখ। বিকেল থেকে তবু ঘোড়া ঘোড়া খেলতে চায়। যদি কোনো কাঠের পুরনো ঘোড়া থেকে থাকে।

সামাদ সাহেব দুটাকা পঞ্চাশ পয়সার পরিত্যক্ত ঘোড়ার খেলনা দিয়ে দেন।

সুরুষ কী যে আনন্দ পায়। যাক, ছেলেটার ঘ্যানর ঘ্যানর বন্ধ হবে। দেখতে ঠিক তারই সেবাভোগী লাল ঘোড়াটার মতো, তেমনি পুরুষ মুখ। আবিদের মাও খুশি হবে।

আবিদের ঘ্যানর ঘ্যানর থামে না। কাঠের ঘোড়া নয়, আস্তাবলের লাল

ঘোড়া চায়। ভোরবেলা হাওয়ার আহ্বানে যাবে। ভোরের বাতাসভঙ্গী লাল ঘোড়াটার দিকে চেয়ে তকেও দেখে যাবে। বাবা আমি জকি হব—কখন কখন চিৎকার করে ওঠে। পাশের ছাপড়ায় গল্প শোনা গেছে, জকিদের বর্ণালী পোশাক।

সুরুষ নিজেও খুশি হয়। জকি তো হবেই। হোক না সারা বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, না হোক শ্বাসের টান। তবু জকি হবে। রোববার, রেসকোর্সে হাজার হাজার লোকের আড্ডায়, আবিদ, তার ছেলে, জকি হবে। গল্প শোনা গেছে, জকিদের ফূর্তির জীবন।

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে। বিশ কিম্বা ঊনচল্লিশ নম্বর রোডে রীতিমত পড়ানোর প্রাইভেট বাণিজ্য চলে। ফর্স্টারের 'লোকোত্তর রক্ষ' গল্পটি অত্যন্ত কঠিন। সারাটা গল্পই একটা রূপক কিম্বা প্রতীকের মতো। রথারোহী নায়ক কোনো শক্তিমান কবির প্রতীক। তার বাপ-মা অতি সাধারণ বাণিজ্যিক জীব। শেলীর সমগ্র রচনা তারা ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিয়েছে। সেই রথ তিনটি ঘোড়ায় টানে। দান্তের ডিভাইন কমেডির তিনটি সর্গের প্রতীক অশ্বত্রয়ে চড়ে গল্পের নায়ক নন্দন লোকে যায়।

আবিদ চিৎকার করে ওঠে, বাবা-গো আমার জকির পোশাক কই? আমি জকি হব। এই ঘোড়া নয়, তোমার লাল ঘোড়াটারে দাও। আমাকেও ছোলা দিও। তবেই ঘোড়াটার মতো তাজা হবো।

কিশোরলালের নেশা জমে। আবোল-তাবোল গান গায়। খুপরীতে বৌটা চিল্লায়। ঘোড়াদের ঘরে চুপচাপ ঘুম নামে। নর্দমার ধার দিয়ে কয়েকটা ছুঁচালো ইঁদুর নির্বিকার আসে যায়। বড় রাস্তার মোড় থেকে অন্ধকার আসে পাহাড়তলির রাক্ষুসে চক্ষুর মতো।

ভোরবেলা আবিদকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দেওয়া হল। লাল টকটকে ঘোড়া নয়, এবারে ছক্‌কা গাড়ী। গাড়োয়ান দিব্যি বিড়ি টানে। দেখেও না, কী অন্তরঙ্গ অন্ধকারে আবিদ নিদ্রিত।

নর্দমার ধারে শিশুদের আড্ডা জমে। সূর্যালোকে নর্দমার ক্লেদস্রোত বাষ্প হয়ে ওঠে। নেড়ী কুত্তীটা ছেলেদের মুড়ি খায়।

সন্ধ্যা রাতেই সুরুষ আবিদের মাকে কাঁথার আঁধারে ডাকে।

আয় বৌ কাছে এসে শুবি।

দুজনেই সরীসৃপ হয়ে যায়। কয়েকটা ইঁদুর ভাতের পাতিলে মুখ দেয়। কিশোর লালের নেশা বাড়ে। বৌটা চিল্লায়।

রাত কত হল উত্তর মেলে না। পাহাড়তলির মৃত রাক্ষসের চক্ষু কোটরের মতো অন্ধকারে আবিদের ছাব্বিশ-বছরি মা আর সুরুষ 'সাপ সাপ' 'মাছ মাছ' খেলে।

# জল ছলছল

## মাহবুব সাদিক

সে আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলো মোর্শেদের কাছে যাবে না। যদিও সন্ধ্যা মাত্র উত্তীর্ণ এবং তেমন তাড়া নেই, তবু একজোড়া চোখ তাকে অনিবার্য তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। ফুটপাতে চোখ রেখে জনারণ্যে দলিত তার মন তখন সেই পবিত্রতা এবং নিজস্ব স্বপ্নের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 'আমি যাবো না তাকে ডাকতে,' একথা নিজেকে অবিরাম বলেছে সে, কেননা তাব স্বপ্নের মৃত্যু ঘটছে। তবু প্রতিবার 'আমি যাবো না'—প্রতিজ্ঞ হবার সময় একজোড়া কঠিন চোখ তাকে বিদ্ধ করছে।

মোর্শেদ ছিল না বাসায়; তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসেই দূর অন্ধকার শূন্যে সে মেঘ দেখলো। সেই তখন সে চমকিত হেসে ফেললো। এই যৌবন-বতী মেঘ আমাকে স্বপ্ন দেবে, স্বপ্নে ভরিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে এই কথা তখন এক লাখবার হাতে হাতে লোফালুফি করতে করতে সন্ধ্যেয় সে ঘরে ফিরে এলো। স্বপ্নের বাহারি সম্ভাষণে আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে দরোজা বন্ধ করে আনন্দিত হাসলো সে। অন্ধকার মণিময় চুমকিতে বিদ্ধ সেই হাসি স্বপ্নময় মনোরম ঘরটিতে সারারাত শিশির হয়ে জ্বলে। বস্তুত বৃষ্টিঝরা রাতে একটি স্বপ্ন তার মনোজ খাঁচাটিতে সুখে ডানা ঝাড়ে, নিশিবিহারে অন্ধকারেও আহ্লাদে সুনীল হয়। কিন্তু মেঘহীন রাতে তার সযত্ন লালিত স্বপ্নের পালায়, তখন মুখখোলা সেই খাঁচার গায়ে যে ব্যাকুল মুখ ঘষতো; সজোরে নাড়া খেয়ে বিহ্বল তাকাতো শুধু, ছলছল রক্তেরা চমকাতো; তখন এক-একবার বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে হতো কেউ যেন দরোজায় কড়া নাড়ছে, সে সাড়া দিতো, দরজা খুললেই শুধু অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়তো তার মুখে। তখন তার স্বপ্ন খাঁচা উজাড় হয়ে কার কণ্ঠলগ্ন, সে কোন উদ্যানে ক্রীড়ারত। এইসব রাতে অচেতন সে দরোজায় পড়ে থাকে, মাতাল হাওয়ারা বিজন প্রান্তরে উদ্দাম ঘোড়া ছোটায়; আর অবহেলিত চৈতন্যহীন নিমজ্জিত তাকে ঘিরে তারার চুমকি বসানো রাত বিদ্রূপে মাতাল হয়।

'এই তো বিষ্টি নামলো' বলে অন্ধকারে শরীর হাতড়ে সে, রুনু অসংখ্য লেপটানো স্বপ্ন অনুভব করলো। তার গা বেয়ে চুলের সরু রেখায় হেঁটে

এসে তারা মেঝেয় ঘরে অন্ধকার অচেনা আলোতে নৃত্যে তাকে ভরে দিলো। রুনু জামার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে দরোজা খুললো। আর সেইসব শরীরহীন অস্তিত্বহীন তারা রুনুর ভেতরে বাইরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করে ব্যস্ত করে তুললো। তার কণ্ঠলগ্ন মাতাল বিষ্টিকন্যারা মুখখোলা মনোজ খাঁচার ভেতরে ঢুকলো। তারপর অশান্ত হাওয়া, তার কপালে চুল জড়িয়ে থাকা স্বাপদের সুড়সুড়ি দিয়ে পাগল করলো। এমন দমকা হাওয়ার কাঁপন এমন বৃষ্টি শিরশির রাতে কতোবার সে চমক খেয়েছে তার কণ্ঠ শুনে। বৃষ্টি রুনুর মুখে আঁচলের ঝাপটা মারলো; ঠোঁট চেপে ধরে চুপিচুপি হাসলো রুনু। 'আজ কেউ আসবে না, বৃষ্টি হলো আজ...আজ সারারাত বৃষ্টি থাকবে। আজ এসো হেনা খালা, তুমি আমার পবিত্রতম স্বপ্ন, তুমি পবিত্র হও, শুভ্র হও হেনা-খালা।' চুপি চুপি বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে আউড়ে গেলো রুনু। কার কণ্ঠ বাজলো চুপি চুপি, 'রুনু মামা, আজ বৃষ্টি হলো, দেখো কেমন ভিজে গেছি রুনু মামা! জলের স্বাদ; সুতীব্র স্বাদ; দেখো কত জল ভেতরে বাইরে। চোখ খোলো রুনুমামা।'

তখন চোখ খুলেছে রুনু, হেনা অন্ধকার আলোতে। হেনা আলোছায়ায় জল, হেনা জল হয়ে গেছে, গলে গেছে, ঠোঁটে চোখ-মুখে অজস্র বৃষ্টিকণায় হেনা তরল হয়ে গেছে। চুলের দীর্ঘ অরণ্য পথে কি নিটোল এক একটি স্বপ্নের ফোঁটা হেঁটে এসে, ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটের পাশে, হেনার ঠোঁটজল।

সেই ছলছল তরলতায় ডুবতো রুনু, এক ডুবে ছ' কুড়ি সুনীল জলের স্বাদে কার বন্দী আত্মাকে উদ্ধার করতে বাক্য ভেঙে মনভ্রমরাকে ধরে আনতে যেতো।

'রুনু মামা, কাছে এসো, আমার গভীর তরলতায় ডুবতে এসো, এইখানে দেহের বুকের মাঝে কতো জল, রুনু মামা।'

তখন চারদিকে কি অদ্ভুত স্বপ্ন-বিদ্যুতের ফোঁটা, সব তরলতার নেশায় একাকার; প্রতিটি কণা তখন অমূল্য হীরের অপরূপ ঝলকানি। সেই জল থেকে গন্ধ, সেই অতল থেকে ফিসফিস স্বর 'রুনুমামা, আমাকে দেখো, তুমি শুনছো না রুনুমামা, দেখো কত জল রুনুমামা।'

( দুই )

নীল আলো বন্ধ ঘরে সে চিৎ হয়ে শুয়ে; নীল আলোর সঙ্গে সিগ্রেটের জ্বলন্ত অবশিষ্ট থেকে একটি শিখা তার নাকে ধাক্কা দিচ্ছে। পাশে সরিয়ে রাখা তার দেহাবরণের ওপর দিয়ে সে বিস্ফার চোখে তাকিয়ে; হেনার নিরাবেগ চোখ কিছুক্ষণ আগের সেই আবিল মুহূর্তের দিকে বেড়ালের মতো ক্রমাগত

গুটিগুটি পায়ে এগুচ্ছে। এক পাশে শুয়ে থেকে দেয়াল জানালা ছাদ পরিক্রম করে এখন তার চোখ তীক্ষ্ম নিবন্ধ ঘরের কোণে রাখা একটা ছাতার উপর, যা এইমাত্র মোর্শেদ বৃষ্টিতে ভিজে যাবে বলে ফেলে গেলো। হেনার গায়ে সেই সুখ আবার সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার স্বপ্নময় রক্তিম সড়কে কার চমকিত গতায়াত আগুন হচ্ছে। সে, হানা উদ্ভাস হাসিতে ভরে গেলো, সারাঘরময় হাসির চুমকি ছিটিয়ে দিলো। ছাদ-দেয়াল জানালায় ঠোকাঠুকি হয়ে সেই হাসি আবার ফিরে এলো তার কাছে। খোলা চোখে বিস্ফারিত সে তাকিয়ে থাকলো সেই ছাতার বাঁটে। একবার নড়লো না, চোখ বুঁজে যেন অতল থেকে ফিসফিস করছে তেমনি উচ্চারণ করলো, 'আমি আবার যেতে চাই, আবার ফিরে যেতে চাই, কেউ আসুক, কেউ, যে কেউ এসে আমাকে বিদ্ধ করুক।' তার শিরদাঁড়া বেয়ে কিছুক্ষণ আগের সেই উষ্ণ স্রোত ক্রমাগত তাকে সুড়সুড়ি দিলো; নাড়া খেয়ে মুচড়ে উঠে ভেঙে দুমড়ে যেতে থাকলো সে, ক্রমাগত মোচড়াতে থাকলো; কেউ যেন আগুন বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে পিঠে, সারা গায়ে। সমস্ত বিছানাটা উত্তপ্ত স্পর্শ দিচ্ছে—উত্তপ্ত আদরে গলে তরল হচ্ছে হেনা। এই সন্ধ্যায় সে আর একবার নিবেদিত হতে চাইলো। দুই বাহু বাড়িয়ে চোখ বুঁজে ধরতে চাইলো, গ্রাস করতে, আমূল বিদ্ধ হতে চাইলো, বাতাসে উধাও কোন সুরভিকে দুহাতে ধরতে চাইলো প্রাণপণে। ততক্ষণে সিগ্রেটের জ্বলন্ত অবশিষ্ট ভস্মীভূত হয়েছে, শেষ ধোঁয়াটুকু পাকিয়ে পাকিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে। হেনা পাশবালিশটাকে সজোরে আছড়ে ফেললো বুকের উপর, 'তুই কোন রন্ধ্রপথে প্রালিয়ে যাবি। পাখি তুই কোন সুদূরে যাবি।'

হেনা হাসিতে বঙ্কিম হলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো মেঝেয়। হেঁটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা তুলে খাটের সাথে ঠেস দিয়ে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। 'সে আবার আসবে আজ রাতে, আবার...আর একবার মোর্শেদ আসুক এখানে তার ছাতাটা নিতে আর একবার আসুক।' হেনা দবোজা খুলে শোবার ঘর সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলো, কিন্তু তখন জল ফুরিয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই বাথরুমের ভাঙা শার্শিপথে তিন ফোঁটা যৌবনবতী বৃষ্টি তার চোখেমুখে ধাক্কা খেলো। তখন হেনার মনে পড়লো রুনুর কথা, বাইরে ইতিমধ্যে বাতাস মাতাল হ্.য়ছে, বৃষ্টি কণারা তুমুল ছোটাছুটিতে হেনার উচ্ছ্রিত নগ্নবুকে মাথা আছড়াচ্ছে। হাওয়া এবং বৃষ্টির তুমুল মাতলামি হেনাকে ঠেলে নিয়ে গেলো শোবার ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোনের অন্ধকারে, বৃষ্টির আলিঙ্গনে আবদ্ধ মাতাল হেনা উদ্ভাসিত হলো উঠোনে, উর্ধ্বমুখে নিবেদিত হলো হেনা, সর্বাঙ্গ গলে খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো বৃষ্টিতে। উর্ধ্বমুখে সেই অগ্নিবৃষ্টিকে আলিঙ্গনে ধরতে

থাকলো হেনা, সেই আগুন আবার জ্বললো তার বুকে, তার দেহে, সর্বাঙ্গ দগ্ধ হলো। বৃষ্টির নীচে নিবেদিত প্রাণ সে একটি সর্বনাশা শিখায় জ্বলতে থাকলো।

( তিন )

সন্ধ্যার আকাশে আজ মেঘ ছিলো। আকাশে বর্ষণবতী মেঘ দেখে অম্লান, আনন্দিত হয়েছিলো রুনু। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিতে মুখ ঘষতে তার ভালো লাগে, আসলে শুধু বৃষ্টিই তার ভালো লাগে না; ভালো লাগে বৃষ্টির রাতে হেনার কাছে কেউ আসে না, আসতে পারে না বলে। কেউ এসে কড়া নাড়ে না বৃষ্টির রাতে, তাকে চুপিচুপি বাইরের দরোজা খুলে দিয়ে ঘৃণিত শত্রুদের মুখ দেখতে হয় না এই সব রাতে। সে জানে নিরুপায় হেনা বৃষ্টির রাতেই শুধু আসে তার কাছে। আর এ জন্যেই বৃষ্টির রাতকেও রুনুর ভয়। হেনাকে সে পবিত্র দেখতে চেয়েছে, এখনও চায়। কিন্তু হেনার অবৈধ বন্ধুদের যেমন অনিবার্য যাতায়াত এ বাড়িতে, তেমনি হেনাও যথেচ্ছাচারে লিপ্ত। রুনু তার শত্রুদের উপর শুধু ঘৃণিত দৃষ্টিই ছুঁড়ে দিতে পারে, তাদের তীক্ষ্ম নখে ছিন্নভিন্ন করতে পারে না, আক্রোশে ফেটে পড়তে পারে না। 'আমি ওদের ঘেন্না করি হেনাখালা এবং নিজেকেও।' আকৈশোর এই ভাবনা রুনুকে ঘৃণিত জীবনে ঠেলে দিয়েছে।

রাণু তখন সবে কলেজে ঢুকেছে, হেনাখালা (দূর সম্পর্কের আত্মীয় হেনাকে তখন খালা বলতো রুনু, হেনা আদর করে ওকে রুনুমামা বলতো) তখন দু'বছর ওপরে পড়ে। একই বাড়িতে থাকতো, হেনাখালার ঘরের একটা ঘর পরে, মাঝের ঘরে হেনাখালার দাদু থাকতেন।

একবার কলেজের এক ফাংশন শেষে অনেক রাতে ফেরার পথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে-হাঁটতে হেনাখালাকে দেখে মন কেমন করে উঠেছিল রুনুর। অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে রুনুর গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল হেনা, 'উহ মাগো!

'ভয় পেলে হেনাখালা?'

'হু কেমন ভয় করছে।' হেনা আরো জোরে জড়িয়ে ধরেছে রুনুকে। হেনার সান্নিধ্যে রুনু তখন রোমাঞ্চিত; শরীরের ভেতরে সে টগবগ করে ফুটছে। রক্ত চমক খেয়ে উথাল পাথাল হুল ফুটাচ্ছে শরীরে। ঠিক তখন রুনু তার রক্তের এই মাতাল নগ্নতায় শিহরিত হলো। 'ভালবাসায় আমি পবিত্র বিশ্বস্ত থাকবো' প্রাণপণ শক্তিতে সে বলতে চাইলো 'ভয় কি হেনাখালা আমি তো রয়েছি।' সে কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ বুজে এলো, কন্ঠ বুজে এলো। হেনা তার ঠোঁটে চোখে মুখে অলৌকিক উত্তপ্ত ঠোঁট

ঘষতে ঘষতে আগুন ছড়িয়ে দিলো। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে উচ্চারণ করলো, 'আমাকে ছেড়ে দাও হেনাখালা, আমি মরে যাবো।'

তখন একটা দূরাগত গাড়ি মোড় নিলো এ রাস্তায়, তার আলোতে হেনাখালার ভয় পালালো। হাঁটতে থাকলো সে। তার পাশে পাশে। একবার মাত্র হেনার চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে রুনু ঘাড় গুঁজে চলতে আরম্ভ করলো।

সেই প্রথম রুনু ভালবাসলো, ভালবাসলো এবং ঘৃণা করলো। সেই রাতেই রুনুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিলো হেনা। হেনার চোখের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলো রুনু। সেই নীলকালো অতল জলভারনত আদুরে চোখে ডুবতে ইচ্ছে করলো রুনুর। চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে কেঁদে ফেলবে। তখন হেনা তার চিবুকে হাত রাখলো, আর রুনু চোখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'তোমাকে ভালবাসি হেনাখালা।' সেই ফিসফিস হেনার কন্ঠেও ধ্বনিত হতে শুনলো রুনু। তারপর চেয়ার ঠেলে সে উঠলো, হেনা ডাকলো, 'শোনো রুনু।'

রুনু আর শুনলো না, নিজের ভিতর ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে যেতে নিজের ঘরে ঢুকলো। বেশ কিছুদিন ঘর পালালো রুনু, কলেজ পালালো, একটা পবিত্রতা তাকে শুধু পীড়া দিতে লাগলো। কিছু একটা অচেনা সুরভি হেনার চুল থেকে এসে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকলো।

সেই হেনাখালা, হেনার সর্বনাশা গভীরে ডুবতে থাকা রুনু একদিন গভীর রাতে হেনার দবোজায় টোকা দিলো। দরোজা ফাঁক করে হেনা তাকে দেখলো, তাকে দেখে ঘরে টেনে নিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিলো।

খাটের বাজুতে মাথা রেখে কান্নারত রুনুকে টেনে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং ঠোঁটের কিনারে তীক্ষ্ন হেসে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলো গালে, বললো, 'যাও, আর এসো না।'

## ( চার )

জানালায় দাঁড়িয়ে হেনাকে উদ্বাহু উঠোনের অতলে ডুবতে দেখলো রুনু। সন্ধের সেই ঠোঁট সুরভি হয়ে, ধ্বনি হয়ে জলতরঙ্গ বাজাতে বাজাতে আবাব ফিরে এলো তার কাছে। রুনু মৃদুদব হাসলো, 'আজ সে আসবে, তার অতল সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিতে, ধ্বনিত করতে, চমকিত নৃত্যে মাতাল করতে। আজ অন্য কেউ আসবে না।' ফিসফিস করে নিজেকে এই কথা শোনাতে-শোনাতে রুনু বেদনাময় বিম্বিত হলো নিজের কাছে। 'কোন অবহেলায় সে এসেছিলো, আমি তাকে দেখতে পাইনি, আর সে পরিপূর্ণ আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে মোর্শেদ, কবীরের কাছে যারা পালাক্রমে

তার নিত্য শয্যাসঙ্গী। হেনার অমোঘ চোখ আমাকে দিয়েই এদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠায়।' রুনু নিজেকে নগ্নবোধ দেখলো, 'আমি তাকে ছুঁয়ে দেখিনি, জ্বালাতে পারিনি তার কাছে সেই পবিত্রতম আলো।' রুনু যেন আছড়ে পড়লো আকাশ থেকে, 'আমি তাকে ডাকতে পারতাম', রুনু ঘর ছেড়ে উঠোনে নামলো। একটা স্থির কিছু আলো হয়ে জ্বলতে থাকলো তার সর্বাঙ্গে, হাত বাড়িয়ে সে ছুঁয়ে ফেললো হেনাকে। একটা সর্বনাশা সুনীল শিখাকে রুনু তুলে আনলো হাতের মুঠোয়। 'হেনাখালা আমি তোমার তরলতায় ডুবতে চাই, আমি জ্বলতে চাই, আগুন হতে চাই', বৃষ্টিবিদ্ধ রুনু নিমজ্জিত হলো হেনার ঠোঁটে, ঠোঁট রাখলো হেনার উচ্ছ্রিত বুকে।

এমন সময় খোলা দরজায় কার ছায়া হেঁটে এলো ঘরের মধ্যে। দীর্ঘ ছায়া দাঁড়ালো হেনার সামনে, তাকে ঢেকে দিলো, দেয়াল তুললো রুনুর চোখে। রিনরিন বাজলো হেনার কণ্ঠ 'এ্যাতো দেরি করলে কবীর?'

কবীর একহাতে জড়ালো হেনার কন্ঠ, তারপর অলস উচ্চারণ করলো, 'চলো তোমার ঘরে।'

একটি দীর্ঘ সরলরেখা বর্শা হয়ে আমূল বিদ্ধ হলো হেনার পাঁজরে, বিদীর্ণ তার মনোজ খাঁচার দরোজা খুলে স্বপ্ন-বিদ্যুতেরা পালিয়ে গেলো, একটি সুনীল শিখা ঘর ছেড়ে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে এগোল রুনুর আর্তনাদের ওপর পা ফেলে-ফেলে।

## সংঘটিত হত্যাকাণ্ড

**আলমগীর রহমান**

দীর্ঘায়ু শব্দ করে খুলে যায় দরোজা। আমি ধনুক হয়ে পা বাড়াই বাড়ীর ভেতরে। কেননা, বিশালাকার প্রথম দরোজা যা পুনঃ পুনঃ উন্মুক্ত করা যায় না, তার দেহ কোণে ধারণ করে আছে ক্ষুদ্র একটি পিরামিড প্রবেশ পথ। গমনাগমনে সবাই তাই নতশির। বয়স বৃদ্ধিতে অধিনতামুক্ত এবং স্ব-নাম শেষে অলংকার ধারণের অধিকার প্রাপ্ত, অনন্ত নান্দীপাঠের পর গৃহে ফিরি সময়কে আন্তর্জাতিক দিনান্তরে পাঠিয়ে। তখন পড়শীরা আমার ব্যস্ততা নিয়ে ভিন্ন জগতের বেসাতি। গোপন কৌশলে করায়ত্ত করে খিল খুলি বাইরে থেকে, নেভানো অন্ধকারে সন্তরণ মহড়ায় খুঁজে নিই রোজ রোজ আপন শয্যা।

এবং এখন গোপন সে কৌশলের পুনরাবৃত্তি করে প্রবেশ করি স্বগৃহের অভ্যন্তরে। আমি স্থির বিশ্বাসে ঘনীভূত, রক্তসম্পর্কিত অন্যান্য স্বজনরা, যাদের প্রতি আমার অপ্রকাশিতব্য বিরক্তিমিশ্রিত করুণা অকুল দৃশ্য দৃশ্যপট, তারা অপরিবর্তনীয়। সংসারের আমৃত্যু ক্রীতদাস-দাসী। স্ব-আবাসে নিজের বাকযন্ত্রে নিহত, বৃক্ষে হরিদ্রাভ রসাল পক্ষীকুলের ক্ষুরধার চঞ্চুতে ক্ষত, শুধু মহীরূহের ছায়ায় অশ্লীল অগ্নিকান্ড ঘটাই। স্বীয় নামে অলংকার প্রযুক্তির পরও আমার ফল আসে না কোন মনুষ্য উপকারে। সুতরাং স্বাভাবিক সূত্রে আগমন ঘটে, আঘাত করে পরিচিত অবয়ব নিঃসৃত সত্য শব্দাবলী। উষ্ণ, সূচ্যগ্রধার ভরপুর বাতাস ধীরে ধীরে দু-হাতে সরিয়ে পথ পার হই, হা করে থাকা নিজ কক্ষ পর্দায় প্রতিফলিত হয়। চাতালে দীর্ঘ পথ, তারপর পর পর সরল রেখায় সিঁড়ি, এক দুই তিন ডান পায়ে বাঁ-পায়ে অতিক্রম করি। নিদ্রাচ্ছন্ন চিন্তার কোটরে নিশ্চিত হাই তুলে জঞ্জাল মুক্তির আনন্দে অগ্রসরমান শেষ সীমানায়। কয়েকবার পদচারণার পরই পৌঁছে যাবো নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সহসা বলশালী বিদ্যুত মস্তকের দু' পাশের 'তার' বেয়ে বেগবান হওয়ায় হতচকিত। বিমূঢ় অতি সেই নিষ্ঠুর আঘাতে। বজ্রাঘাতে নিহত মূর্তির মতো, প্রথমে বিস্ময় বোধক চকিত এবং পরক্ষণে স্থিরীকৃত দুটি প্রবাহ ধৈর্যবান সূক্ষ্ম শিল্পকারিগরের নিপুণতায় ক্রমশ বারান্দার নিকট অন্ধকারের পলেস্তারা কেটে কেটে আবিষ্কার করে চেয়ারের খোপ-বন্ধ অতি প্রাচীন একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য প্রতিকৃতি।

পিতা আমার পিতা, জনক এ প্রাণের; আপাদমস্তক বিস্তারিত স্ফীত শিরার অন্তর্গত প্রণালীতে প্রবাহমান নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যরক্তিম রক্তের নিরংকুশ অধিকারী। সুপুষ্ট দেহের যাবতীয় অস্থিমজ্জা এবং সাবলীল মাংসপেশীসমূহ একমাত্র তাঁর দ্বারাই সৃজিত। তিলে তিলে সমগ্র সঞ্চয় ব্যয়িত আমার হৃদপিন্ডে স্পন্দন সচল চলাচলে,, স্ব-হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনিতে এক সংগীকে আমৃত্যু শোনার বাসনায় ভবিষ্যৎ ভাবনা তখন অতিদূর নির্বাসিত। বাইশ বসন্তের দ্বারে উপনীত বক্ষে ধারণরত অমিততেজা অশ্ব এবং তার কালোচুলে গ্রীবায় দৃঢ় ত্বকে আলো-হাওয়া জ্বালানি যুগিয়ে একক কৃতিত্বে, বিবর্ণ বিরল কেশ, কুঞ্চিত দৃষ্টি, শিথিল চর্মাবরণে মেছেতো আক্রান্ত, শূন্য কপালে কুব্জ কৃশ উপস্থিত তিনি।

আমার চোখের কালো দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক প্রাগৈতিহাসিক তরুণ বর্তমানে পদার্পণ করে হীনশক্তি, নিঃস্ব সম্রাট; তাঁর যৌবন অপাত্রে হস্তান্তরিত, তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারী হাতে হত, পচন ক্রিয়ায় সমর্পিত শরদেহ, ভাগাড়ে নর্দমার স্রোতে গলিত অস্তিত্বে প্রাণ ধারণ করে আছে জ্বালাময়ী কীট। কীট দংশনে তিনি বিক্ষত, রুদ্ধবাক দর্শক আপন পটভূমিকার কৃষ্ণ চলচ্চিত্র দর্শনে।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ সমাহিত। চতুষ্পার্শ শব্দহীন। রাস্তায় কোন ভারী বুট খটখট আওয়াজ তুলছে না। কুকুরগুলো, যাদের একমাত্র কাজ চীৎকার করা, আজ এ সময়ে অনুপস্থিত। নিথর বৃক্ষের পাতা দালানকোঠা দেয়াল বিদ্যুৎবাহী তার, পিলার প্রভৃতির সাজানো বাগানে শহরের মধ্যাহ্ন রজনীতে জীবিত, উন্মিলিত চোখে, মুখোমুখি, অতীত বর্তমান দুকালের দুজন শিকারী, যাদের মধ্যে একজনের অরণ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা ভয়াল বাঘের থাবায় প্রতিহৃত, অপরজন লড়াই করে চলেছে। ফলাফল ঘোর অমাবস্যা কর্তৃক লুণ্ঠিত। কংক্রিট বাঁধানো বাতাসের কুণ্ঠিত শব্দে হেঁটে হেঁটে আমার শ্রুতিগুহার বন্ধ দ্বারে আঘাত করে পিতার কণ্ঠনির্গত অক্ষরবন্দী ধ্বনিসমূহ। ফিরে ফিবে ঘড়ির কাঁটার মতো একই প্রশ্ন এবং আমি অতিশয় পারদর্শী নই। ওষ্ঠ ও কণ্ঠকে পরম কৌশলে নিয়ে যাই আপন অবয়বে। চোখে, ললাটে নিঃশব্দে প্রতিফলন করে প্রকাশ করি নিদারুণ বার্তা, ঘুরে ফিরে একই পদ্ধতির অভিনয় চলে যে কোন সময়ে, কিছুদিন অন্তর অন্তর।

সম্মুখস্থ অদৃশ্য শূন্যতায় অনুভবের রূপালী পর্দায় দৃশ্যমান ক্রমশ দুপুরের সেই মহাপুরুষ। পর্দায় প্রক্ষেপিত দৃশ্যালোকে প্রাক্তন ঘটনার বিন্দু বিশ্লেষিত অনুবৃত্তি দর্শক দৃষ্টি সীমায় উপস্থিত। তিনি যেহেতু মহাপুরুষ, কেননা তাঁর ইচ্ছায় অনুরাগে, বিরাগে অনায়াসে নির্ণীত হতে পারে একাধিক ভবিষ্যৎ। যেমন আজ দুপুরে তিনি আমাকে বাতিল করে দিলেন। আমার অতিশয় বন্দিত অলংকার; যা এখনও উজ্জ্বল ওজনে ফোলা ফাঁপা নয় এবং তা তাঁর জানার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কাংখিত পুষ্পউদ্যানে আমাব প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি তাঁর প্রাচীরবেষ্টিত, এখানে প্রাচীব সংরক্ষণার্থে নয়, পদমর্যাদার বিজ্ঞাপন, কক্ষ অভ্যন্তবে অনুভব করি উন্মুক্ত প্রকৃতির বিপরীত মেরুতে তখন তাঁর অবস্থান। হাতে কলম নিয়ে একটা বই পঠনরত। সে কলমে লাল কালি ছিল। তিনি পড়ে পড়ে লাল কালিতে বইয়ের অংশ চিহ্নিত করছিলেন। আমার আগমন শব্দে বই রেখে আমার দিকে মনোযোগী হলেন। পূর্বে গৃহীত এবং শ্রুত কিছু ধ্বনিপুঞ্জ তাঁকে টেপরেকর্ডারে বাজিয়ে নিজে নিবেদিত হলাম। তাঁর শ্বেত ওষ্ঠের প্রত্যন্ত প্রদেশের মোহন শ্মশ্রুতে; কালীমূর্তিতে সহসা প্রলম্বিত শ্বাপদ জিহ্বা; চকচকে মসৃণ ধারালো আঙুলে বিনুনী কেটে আমার জনকের দেহ টিপে-টিপে তান্ত্রিক মন্দিরের পুরোহিত এক চট করে শুইয়ে দিল উপুড় করে এবং শিরযুক্ত গণ্ডদেশকে নকসা অংকিত দু ফালি কাঠের মাঝে। আমি অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শনের আনন্দে অবাক শিহরণ নিয়ে ছিলাম নিবিষ্ট দর্শক। বাল্যে দেখা পুতুল নাচের অবোধ্য পারদর্শিতায় গুণমুগ্ধতার নিগড়াবদ্ধ বর্তমানে

তিনি আমার রুদ্ধবাক প্রশ্নে বিস্ফারিত চোখের কুঠুরীতে উন্মোচন করলেন নীল সেই নাটকের অন্তর্গত পর্দা।

অসীম সাহসে আশায় ভর করে টেপ-রেকর্ডার বাজাতে উদ্যোগী হলাম পুনর্বার। তিনি এবার শোনালেন সুমধুর ঘন্টাধ্বনি। মেরুদেশে অবস্থান আমার দীর্ঘতর করা গেল না এবং বাইরে রোদ ওৎ পেতে ছিল।

অচিকিৎস ক্ষত নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন হাতলহীন চেয়ারে। পারি-পার্শ্বের করুণ আঁধারে সার্চলাইট নিয়ে প্রবেশ করি তাঁর দেহের পাতালে। যেখানে তিনি অশ্রুপাত করছেন এবং ঐ ক্ষরণপর্ব অমৃত পান করে আছে। কোন শব্দ নেই, তরঙ্গ অথবা স্রোত নিম্নমুখী গতি নিয়ে শুধু ফোঁটা ফোঁটা সঞ্চিত হচ্ছে নিশ্ছিদ্র একটি পাত্রে। একদিন হয়তো তরল পদার্থ সঞ্চয়ী সেই পাত্রভান্ডার দুর্মর বিস্ফোরণে রক্তিম করে দেবে আয়ত্তাধীন পৃথিবীটাকে।

নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরোজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি তখনও তিনি তেমনি বসে আছেন। প্রচুর দূরত্বে অবস্থান তাঁর এবং আমার, তবুও চোরা চোখে তাকাবার সম্বল পাই না। একটা কুয়াশা ঢাকা কাঁচ আমার চোখের মণিতে জাপটে বসে। সূত্রবিহীন ক্লান্তির সর্বব্যাপী ডানার কবলে প্রথমে বন্দী ও পরে আহতাবস্থায় ঝিমোতে ঝিমোতে গা উদোম শয্যায় মৃত মানুষের শায়িত শবের মহড়া দেই।

ঊর্ধ্বে অর্ধোন্মিলিত দৃষ্টি সীমায় ছাদের কড়িকাঠ নির্দিষ্ট দূরত্বে পরস্পর সাজানো উত্তর দক্ষিণে লম্বমান। যুগান্তরেও যাদের সংখ্যা নির্ণয় হলো না। বহুবার সচেষ্ট হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছি প্রতিবার। কড়িকাঠের খোপে খোপে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট ঘোলাটে চিত্রাবলী। সংখ্যার আধিক্যে একটি চিত্র প্রদর্শনী যেন আয়োজিত আমার এ প্রকোষ্ঠে। কিন্তু দৃষ্টি তার তীব্রতায় কোনক্রমেই আবিষ্কার করতে পারে না তাদের অবয়ব সমূহ। অনুভবের অনুপরমাণু ঘোলাটে ডানায় ভর করে নিক্ষেপণ কেন্দ্রে ফিরে আসে। আন্তরিকতার অভাব অদৃশ্য, বহুদূরত্বে নির্বাসিত, তবু ধরা দেয় না, ধরতে পারি না। ক্ষমতা, শক্তি বাসনা নিদারুণ পরাজিত। একতাল যন্ত্রণার অতল উদরে আহার যোগান দিয়ে দিয়ে এ-যাবৎকাল, তাকে বেগবান, অমিততেজা করে তুলেছে।

নদীর পারে ভাগাড়, সেখানে শকুনিদের চিৎকার। অপর পারে সাঁতার কাটছি। দূর থেকে তীর দেখা যায়, নদীর নিকট গমনে চোখের পলকে উধাও। কুয়োর ভেতর সাঁতার কাটার মতো, অল্পজলে। তলদেশে প্রজ্জ্বলমান বিকট একটি অগ্নিকুন্ড অফুরন্ত প্রাণশক্তি ভরপুর। ভেতরের পানি ছান্দিক শব্দ তুলছে। ধোঁয়াচ্ছন্ন চতুষ্পার্শ্ব তাতে রন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাসিত। দেহের সুচ্যাগ্র বিন্দু বিন্দু রক্তিম তরলতা ঝলসানো চর্মাবরণের অনির্ণয় সূক্ষ্ম পথে

চুইয়ে চুইয়ে সঞ্চরণশীল গোলাকার গর্তের ক্ষুধায়, পুরু অস্থির প্রলেপ এতকালের লালিত, ক্রমাগত প্রবল উত্তাপে খসে খসে থকথকে সমগ্র কুয়োর জল। মাংসহীন দেহের খাঁচায় আচমকা প্রবাহিত বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ বাজায়। অকল্পনীয় রূপান্তরে এই আমি, আলমগীর রহমান নামক একটি যুবকের আকার অস্তিত্ব পরিচয় ভবিষ্যৎ কালসূচক দিনপঞ্জির বিবরে অতীত বিষয়ক তথ্যাক্রান্ত গবেষণা পত্রের নির্বাচিত বিষয় ও বস্তু।

একসময় ধ্বনিলোকে জেগে উঠি পূর্ণাবয়ব শরীর, আত্মা, হৃদয়, রক্তপ্রবাহী শিরা, উপশিরা ইত্যাদির সমাহারে। এখন আমার দুঃখ আছে, সুখ, আনন্দের আশা আছে। রৌদ্রতাপ চন্দ্রালোক মরা দহন দংশন যন্ত্রণা সর্বত্র ছড়িয়ে যায় মুহূর্তে। বোধ ও অনুভবের তীক্ষ্মতায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় বিভাগ সতর্ক প্রহরীকে আপ্রাণ চেষ্টার পরও ফাঁকি দিতে পারে না। বর্তমানে সম্পূর্ণ জাগতিক রেখায় অবস্থান করছি।

শীতের আচ্ছাদন বোনার মতো কয়েকটা মশা লেপটানো মাংসে হুল ঢুকিয়ে পরম নির্ভয়ে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছিল লোহকণিকা, শ্বেত-কণিকা মিশ্রিত তরল সমষ্টি, জীবন ধারণের অপরিহার্য জ্বালানী। সজাগ দেহটা হঠাৎ নড়ে চড়ে প্রতিবাদ জানালে শুরু হয় তাদের সমবেত নৃত্য।

শরীর নির্গত জলে আমি সম্পূর্ণ স্নাত। আপাদমস্তক ছড়ানো ছিটানো অজস্র চুলের মূলদেশ এক একটি ঝর্ণার উন্মুক্ত মোহনা। ঢল ঢল জল অবাধ গতি নিয়ে স্যাঁত স্যাঁত ভিজিয়ে দিল। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ক্রমশ বনিয়ে বনিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথে পাচার হচ্ছে দেহাভ্যন্তরে।

টেবিলে আমার আহার্য ঢাকা। রোজ রোজ এমনি থাকে। দিনে বা রাতে কোনদিন আহার কালে আশেপাশে একই কর্মে নিযুক্ত কারো দর্শন লাভ আমার অতীত। সবাই ঘড়ির যুক্ত হয়ে আছেন। আমি শুধু ছিটকে বেরিয়ে গেছি, সংসারে আমার একটি মাত্র কাজ: সকাল দুপুর রাত; তিন সময়ে চুপচাপ আহার করে যাওয়া। এস্থানে বৈচিত্র্য সন্ধান কোন ফলবতী বৃক্ষ নয়।

খাবার আগলে রাখা ঢাকনা হাতের সঙ্গে উঠে আসে। অতি আয়েসে এবং শরীরের স্নায়ু পেশী শিরাসমূহে সহস্রখণ্ডিত সেকেন্ড সময়ে বিক্রম বিদ্যুতের অনন্য দাহ্য শক্তির প্রয়োগে স্তম্ভিত নিশ্চল মূর্তি। চোখ জোড়া রেডিয়াম ঘড়ির কাঁটায় টিকটিক জ্বলতে থাকে। দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী অতিকায় বেগবান ঢাকনা খোলার শব্দে সচকিত, একপলক আমাকে দেখে অতি দ্রুত পলায়ন করে প্রাণীটা, আশ্রয় নেয় মিটসেফের পেছনে। এতোক্ষণ আমার বরাদ্দ লুটতরাজরত গোপন সেই তস্কর তার প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্য বিনষ্ট সাধনে সিদ্ধসাধক প্রচলিত অর্থনীতির কূটকৌশলে।

উদরে এবং মস্তিষ্ক কোটরে প্রবল বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ড ঘটে

একসঙ্গে, দাউ দাউ দহন ক্রিয়ার পরিণামে রাজকীয় ভোজসভায় দগ্ধ কুক্কুট, বক্ষদেশে রুপালী-ছুরি আমূল প্রোথিত। স্থির হাতের আঙ্গুলে খাবারের অক্ষম ঢাকনা ক্ষমাপ্রার্থী অপরাধীর করজোরবদ্ধ দেহের মতো স্বল্প দোদুল্যমান।

আলোর অসীম ক্ষমতায় দ্রুতগামী পলায়নপর তস্করের পিছু পিছু দৃষ্টি ধাবিত এবং তার আশ্রয় স্থলে স্থির দৃষ্টি ছুঁড়ে তাকে চুলচেরা দর্শন করতে থাকি।

অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলাক্ত মসৃণ লোমাবৃত লোমশ দেহ, লম্বাটে অবয়বে চোখ কান নাক ও সজারু কাঁটার বিন্যস্ততায় কিছু সংখ্যক গোঁফ-আঁশ সমতল নাসারন্ধ্রের দুপাশে সম্প্রসারিত। তুলতুলে দেহের নিম্নাংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে চারটে পা এবং পশ্চাৎ অংশে লোমবিহীন সদ্য অস্থির সুদৃশ্য নাতি-দীর্ঘ একটি লেজ।

ইঁদুরটা হয়তো আমাকে দেখছে। মিটসেফের পেছনে সমান্তরাল দণ্ডায়মান বিছানো কাঠ পায়ের আঙ্গুলের নখে আঁকড়ে ধরে আছে। কুতকুতে বিষাক্ত অগ্নিদৃষ্টি যেন আমার দিকে সরলরেখায় নিক্ষেপিত। তার অভিযান অসফল করে দিলাম, তস্করবৃত্তির আকস্মিক প্রতিকূল পরিণতি, ইচ্ছাবিরুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণার বাধ্যবাধকতা তাকে দুর্দমনীয় হিংসাতুর করে তুলেছে আমার প্রতি।

চিন্তা-ভাবনা যাবতীয় বিষয়সমূহ একটি বিন্দুতে ঘূর্ণায়মান, মস্তিষ্ক কোটর যে জন্য নিয়োজিত। তথায় দাউ দাউ প্রজ্জ্বলমান দাবানল বিরতিহীন পোড়াচ্ছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড ক্রমানুক্রমিক গতিতে গ্রাস করছে আপাদমস্তক, সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জ্বলছে দুলছে অগ্নিশিখা এবং অভ্যন্তরভাগে ঘটছে প্রবেশ। শুধু আজ হঠাৎ ধরা পড়লো এ তস্কর। গতদিনগুলোতে
ঘটছে প্রবেশ। শুধু আজ হঠাৎ ধরা পড়লো এ তস্কর। গতদিনগুলোতে
ছিলাম কতো নিশ্চিত, আহারকাল ছিল নির্বিঘ্ন। অথচ অজান্তে আমাকে ঘিরে চলেছে হত্যা ষড়যন্ত্রের উদ্দাম বহুৎসব অশেষ। বৃত্তের সংজ্ঞায় আবর্তিত। দেহের চকচকে ত্বক ঝলসানো, চতুর্দিক মমতাতে, সাথে সাথে পুড়ে ছাই উদরবৃত্তির পূর্ব ঘোষিত বাসনা।

সর্বময় ঝলসিত চামড়ায় টান টান বেদনা, অবয়বের আদল দুমড়ানো প্যাপিরাস, শরীর গঠন সর্বত্র কাদামাটির ভাস্কর্য কর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং দু হাতের বর্ধিত শাখারা সব প্রথম বন্ধনী।

পূর্ণিমার প্রবল জোয়ারে ভেঙ্গে গেছে লোমকূপের সমুদয় বাঁধ। ঝাঁঝরি হতে ফোটা ফোটা অসংখ্য জলবিন্দুর অবিরাম বর্ষণে আমি সম্পূর্ণ সিক্ত। তাতে শীতলতা অথবা প্রশান্তির রাসায়নিক উপাদান অনুপস্থিত, অভ্যন্তর-

ভাগে একটা পাত্রে রক্ষিত সঞ্চিত টগবগ ফুটন্ত জলরাশির অপ্রতিরোধ্য নির্গমন।

প্রবল দোলায় দুলে ওঠে মিটসেফটা। ভেতরে ক্ষুদ্র ছিদ্র জালের পাহারায় তাকে তাকে সাজানো তৈজসপত্র; রংচটা টিনের কৌটা, আচারের বয়াম, শূন্য দুধের ডেকচি ইত্যাদি; সহসা স্থানচ্যুত, নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের বিনাশ চিন্তায় শংকিত। বিভিন্ন তরঙ্গ ধ্বনির আশ্রয়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করে প্রতিবাদ। ততোক্ষণে আমার দুই বাহু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লড়াকু ষাঁড়ের দুই শিং-এ ঠেলে দিয়েছে মিটসেফ, মিটসেফের পশ্চাৎ অংশ, যেখানে আমার চিরন্তন শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু নিশ্চিত আশ্রয়ে থু-থু নিক্ষেপ করছিলো, নিকট-বর্তী চুনকাম শাদা দেয়ালের শক্ত সমতল দেহে। মিটসেফ আর দেয়াল এ দুয়ের মাঝে পূর্বের সরলরেখা টানার স্কেলে কতিপয় ভগ্নাংশ দূরত্ব প্রায় বিলীন।

দেহের মাংসপেশী স্ফীত, স্ফীততর। শোণিতধারা শিরাসমূহ ত্বকের দেয়াল ফুঁড়ে মুক্তি অভিলাষী। পায়ের মসৃণতল কঠিন সিমেন্টে দশ আঙ্গুল দশটি খুঁটি পুঁততে প্রাণপন চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাতো মাটি নয়। শুধু ঘর্মাক্ত পায়ের তালু মেঝেয় স্থির হয় না কোন ক্রমেই। অথচ এখন প্রয়োজন প্রচুর, অফুরন্ত শক্তির। শক্তি আসুরিক শক্তি, চির দুর্জ্ঞেয় শক্তি। ধূপ গন্ধ চন্দন মৃগনাভি পুষ্প অর্চনায় বন্দিতকাল কালান্তরে, বর্তমানে আমার একক বাসনা, শুষ্ক কন্ঠে একটি বাসনা প্রার্থনা হয়ে অনুরণিত হয় বার বার। শংকা দোদুল হৃদয়ে অন্তহীন বুদবুদের আকুলিবিকুলি।

ঈশ্বর, শক্তি দাও হে ঈশ্বর। প্রবলতর কর এ হীনদেহ কর্মক্ষমতা। বিশালাকার দানব সাইক্লোপস আকৃতি অবয়বেও আমি কৃতজ্ঞ। এখন অতি জরুরী উপস্থিতি বীর্যবলবান দেবদূতের। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাবতীয় সন্ধি-স্থল শক্তিমান স্ক্রু বিদ্ধ, বিভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত বিভক্ত নয় আর। স্বইচ্ছায়, যে দিকে ইচ্ছা হয়; পরিচালনা করা যায় না। শক্তি উত্থিত সমস্ত চাপ একটি কার্যকর লক্ষ্য বিন্দুতে ধাবমান, যেমন নদী তার স্রোতে শুধু সমুদ্রে যায়। আরাধ্য একক বর্তমান কর্ম পাখীর ডানার মতো হাত দুটো মাংসময় দেহের বিপুল ভার ঠেলে দিচ্ছে, মিটসেফটা শাদা দেয়ালে যেমন ধনুক-মুক্ত তীর সদ্য সম্মুখ পানে অগ্রসরমান। ঈষৎ কম্পমান আয়ত ক্ষেত্রাকার মিটসেফটা ফলে শ্রুতিতে আঘাত করছে পুনঃ পুনঃ, ভেতরের কর্কশ দ্রব্যবস্তুর স্থান পরিবর্তনের শব্দ।

বিবিধ ঘটনা উদ্ভূত হতে পারে যে কোন সময়ে। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে একটি মাত্র আকাংখা পূরণ আমাকে অনাবিল, নির্মল উপহার দিতে পারে। দেয়ালটা গ্রাস করে নিক সম্পূর্ণ মিটসেফটা অদৃশ্য হয়ে যাক আমার শত্রু

সমেত দেয়ালের পুরু বক্ষে কাষ্ঠ নির্মিত চতুষ্কোণাকার নানাবিধ দ্রব্য সংরক্ষণ কল্পে প্রস্তুত এ বস্তু। সকালে সবাই অবাক, খুঁজবে বস্তুটাকে ঘরের একোণ ওকোণ। তখন আমি, একমাত্র আমিই বাজাতে পারবো প্রসন্নতায় প্রচুর হাততালি। কেননা, কেন এমন হলো তার কারণ জানা ব্যক্তি বিশেষ মাত্র একটি এবং তা আমি। প্রাণ খুলে লাগামহীন হাসতে পারবো অনেকদিন পর। মা, বাবা, ভাই-বোন এবং সংসারের অন্য সবাইকে শুনিয়ে। এটা তাঁদের বিচারে বেহায়াপনা, যেহেতু তাঁরা তো জানে না কারণ এর বিন্দু বিসর্গ। ওঁদের ভ্রূ কুঞ্চন, কিছুটা কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত চেহারা ও রক্তিম কপালের সমতলভূমিতে একাধিক ঢেউ অথবা অন্য অনুশাসন কোন ক্রমেই করতে পারবে না সংকল্প স্বভূমিচ্যুত।

স্পষ্ট শুনতে পাই ওটা দেয়াল ও কাঠের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান হেতু দেহে প্রচণ্ড চাপ অনুভূত হওয়ায় পলায়নের বা অন্যত্র সরে যাবার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেও পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ। পরাক্রম শক্তির আবির্ভাবে যথাস্থানে থেকে উদরে অবয়বে ও শরীরাংশের সর্বত্র নিষ্পেষণ অনুভবে, যেহেতু স্থান পরিবর্তনের সমুদয় পথ রুদ্ধ। পায়ের নখে ঈর্ষা, রাগ, বিদ্বেষ, হিংস্রতায় ফুঁসে বিকট খুড়ছে মিটসেফের কাঠ। বিচিত্র সে ধ্বনি, অকালে মৃত্যু ঘোষণায় অনিচ্ছুক একটি প্রাণীর আপ্রাণ প্রতিবাদ। তার নাতিদীর্ঘ দেহটা এখন অথবা যে কোন সময়, যা পূর্বে সঠিক ঘোষণা করা যায় না, মুহূর্তে বিদীর্ণ হতে পারে। একবার চিৎকারের পর পরই নিথর জগতে আশ্রয় নেবে নরম দেহটা। শাদা দেয়ালে সংকীর্ণ রক্তের ছাপ, তারপর আকাশের দিকে চারটে পা অসহায় নিক্ষিপ্ত সমতল মেঝের মাঝে এলায়িত লেজ, অবয়ব সংযুক্ত ঘাড় এক পার্শ্বে কাত, উদরস্থিত নাড়ি নির্গত ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত দু-একফোঁটা ছিটিয়ে যেতে পারে আশেপাশে এবং মুখ থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে দুটো শ্বেতাভ চকচকে দাঁত।

ইঁদুরের মতো দাঁত এককালে আমার কাম্যবস্তু। সোহাগী তুষার শুভ্র সৌন্দর্য সম্মুখভাগে বসানো থাকে। ইঁদুরটা দাঁতে কাঠ কামড়াচ্ছে। আক্রোশের চরম সীমানায় উপনীত। মৃদু মৃদু ধ্বনি-তরঙ্গ কানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দেহময় হিমশীতল ভয়াবহ পরিণতি।

কুট্ কুট্ শব্দে শত্রুর ভাষা অতিশয় পরিষ্কার। আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস অতঃপর জঠরের জারক রসে জীর্ণ করা স্পষ্ট শ্রবণযোগ্য ও বোধগম্য সংকেত ভাষ্য। শৈশবে ইঁদুর, তার শ্বেতকায় সরু দন্তরাজির রূপে রূপকথায় মোহাবিষ্ট ছিলাম। মিটসেফ ক্রমশ আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে। দেয়ালে, আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বন্দী 'তার' কন্ঠস্বর হৃদয়ের বোঁটায়

ঘাড়ির পেণ্ডুলামের মতো আঘাত করে। বায়বীর ধূসর কুয়াশা পথ খুঁজে খুঁজে স্রোতের বিপরীত দাঁড় ফেলি।

দল বেঁধে সন্ধ্যায়, সূর্যের আলো ডুবু ডুবু, হন্যে হয়ে গর্ত খুঁজছি। ছোট বড় মুখ নিয়ে অনেকগুলো গর্ত হাঁ করে থাকে। চিনে নিতে হবে আমাদের উদ্দিষ্ট প্রাণীর আবাসস্থল যদি পাই, উঠে যাওয়া আমার কদাকার দাঁতের বদলে 'ওর' একটা পরিশীলিত দাঁত চাই। শুনেছি যথাসময়ে তা পাওয়াও যায়। আমাদের সন্ধানী দূরূ দূরূ দৃষ্টি মন্থর গ্রামের পরিবেশে পথ কেটে কেটে পার হচ্ছে ঝোপ, ঝাড়, আমতলা, ঝাউতলা গৃহস্থ বাড়ীর নিকানো উঠোন...

অসম্ভব...। সহসা নির্গত স্বচিৎকারে চেতনায় ওরা আঘাত লাগে ঘোর ঝেড়ে জাগ্রত বর্তমান চতুষ্পার্শ্বে। দেহের সমুদয় বিবশ ভার নিমেষে ঢেলে দিই দেয়ালের প্রতি মিটসেফের নিষ্প্রাণ কাঠামোয়। কোন ধ্বনি আর নির্মিত হবে না, এখন থেকে। কর্ণযুগলে তরঙ্গ গ্রহণকারী দেয়ালগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অবিরাম বর্ষণে। শৈশব সম্মোহনের কাল। গোলাপ মহিলাদের, মহিলারা গোলাপ।

গোলাপ শৈশবে শ্রেষ্ঠত্বে একক অস্তিবাচক। মহিলা সমান গোলাপ সমান শৈশব। অতএব মহিলা গোলাপ ও শৈশব। সুতরাং মহিলা গোলাপ শৈশব তিন বস্তু সম্মিলিত শক্তিতে এক, জন্ম দেয় অগভীর আশ্রয়ী নিসর্গমালা। সেহেতু শৈশবের অনুর্বরা ভূমি স্থান দেয় অমসৃণ বিপুলাবীজ পক্ষে।

অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান। মোহনীয়, মহিলা গোলাপ শৈশব। ত্রয়ীর সমষ্টি ফল সম্মোহন এবং সম্মোহনের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ফসল ফলায় না কোন দিন।

# দুপুরের রোদ সবুজ

**মুহম্মদ নূরুল হুদা**

**পূর্বকথন :**

ভাবছেন ভণিতা করছি। হ্যাঁ, ভণিতাই করছি আমি। অত্যুজ্জ্বল মোড়কের মতো এক-একটি ভণিতা, এক-একটি নিভৃত পলায়নকুঞ্জের মতো আমার কাছে লোভনীয় ঠেকছে এখন। স্পর্শাতীত গুচ্ছ গুচ্ছ প্রলোভন আমাকে নাচায়, প্রতি মুহূর্তে আমি সে-সব অরূপরতনের অশরীরী ঘ্রাণে চুর হয়ে যাচ্ছি হয়তো-বা। চেতনার আপাত ঊষর জগতে সেই অলৌকিক

সবুজ শিখাটি এখনো জ্বলছে কিনা আমি জানি না। আমি জানি না অক্ষি-গোলকের কোন নিঃসীম দিগন্তে তার দীপ্তি চকিতে মূর্তিমান হয়ে উঠবে। অথচ আমার চেতনার প্রতিটি রন্ধ্রের তোরণে তোরণে হতচকিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি...... হয়তো-বা রাত্রিমালতী, কিংবা রজনীগন্ধার সুরভি-সম্ভারে আমার চারপাশ উর্বর হবে, আর মুহূর্তেই কুকারের তীব্রতম শিখার মতো সেই হৃতশিখাটি সবুজাভ হয়ে উঠবে আমাকে ঘিরে......

কালো রাত্রির মতো দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াতো যে-অভিশপ্ত অ্যানসেন্ট ম্যারিনার, আপনারা তাকে নিশ্চয়ই চেনেন। বিয়ের বাদ্যে মুখরিত গৃহাঙ্গন, অথচ সেই অভিশপ্ত নাবিকের হাত থেকে তার জাদুকরী চোখের প্রখরতা থেকে রেহাই নেই বিয়ে-বাড়ির শৌখিন অতিথিরও। দেখুন, কি ভয়াবহ আত্মতৃপ্তির লোভে নাবিকের চোখ দুটো জ্বলছে, বিয়ে বাড়ির অত্যুজ্জ্বল আলোকসজ্জাও মিইয়ে এসেছে তার চোখের প্রখরতায়, আর নিষ্প্রাণ নিস্তেজ হয়ে এসেছে অতিথির অস্তিত্বের সমস্ত অণুপরমাণু।

বিশ্বাস করুন, আমি সেই অভিশপ্ত নাবিক নই। আপনারা উৎসব করুন, তরঙ্গিত আলোকমালায় ভরে উঠুক আমাদের গৃহাঙ্গন, অতিথিরা আসুক... . আমি শুধু এই আলোকিত স্তম্ভের গোড়ায় অবিনাশী অন্ধকারে বসে থাকবো। হ্যাঁ, উৎসব হোক চারদিকে, আলো জ্বলুক সারি সারি, আর কোথাও একটি সবুজ শিখা জ্বলে উঠুক আমার হারানো শিখাটির মতো।

**একটি দুপুর ঃ**

কাকটা আজও আমাকে ঘুম থেকে জাগালো। এখন দুটো বেজে সাত মিনিট। প্রতিদিন দুটোর দিকে কাকটা আসে, এসে ডাকাডাকি করে। ঘুম থেকে উঠেই মনে হয় আপাতত আমার কোনো এলার্ম ঘড়ির প্রয়োজন নেই।

আমি জেগেছি, মানে দু'চোখের পাতাগুলো সিনেমার পর্দার ভঙ্গিতে সরে যাওয়ায় পরিচিত পৃথিবীটা আমাব সম্মুখে রগড় আরম্ভ করেছে। বেআব্রু নর্তকীর নৃত্যের তালে তালে যেমন অনভ্যস্ত দর্শকের স্নায়ুতে কুৎসিৎ মাকড়শার জাল বোনা শুরু হয়ে যায়, তেমনিভাবে চকিত আলোয় সহসা পরিচিত দৃশ্যাবলী আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অথচ আমি এখনো বামপাশের ওপর ভর করে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘুমোবার সময় ইচ্ছে করেই বাম পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। ডান পাশে শুয়ে স্বপ্ন দেখলে নাকি স্বপ্ন বাস্তব হয়। বাস্তবকে আমার ভীষণ ভয় করে, বিশেষত অনাগত বাস্তবকে।

আমার অতীত আমার বাস্তব, আর আমার বিগত ছ'মাস আমার স্মরণযোগ্য বাস্তব। এ ছ'মাস আমি একটা পাগলা কুকুরের তাড়া খেয়েছি। ভীষণভাবে।

প্রতি মুহূর্তে সেই অস্থিচর্মসার দাঁতাল কুকুরটা আমাকে তাড়া করেছে। স্বভাবতই ছুটতে হয়েছে আমাকে। নগরীর আঁকাবাঁকা অলিগলি ফেরি করে অসম্ভব দ্রুততায় দোতলার সিঁড়ি মাড়িয়ে এ নির্জন নীরন্ধ্র ঘরে পেঁছুতে হয়েছে আমাকে। আর আমার অভ্যন্তরীণ সেই সবুজ শিখাটি গতিময় বায়বীয়তায় লেলিহান অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়ে গেল। অর্থাৎ একটি সবুজ শিখার পরিণাম দেখলাম আমি, একটি অপূর্ণাঙ্গ পরিণাম।

আমার বিছানার পাশের জানালাটা এখন খোলা। একখণ্ড ত্রিমাত্রিক নীলিমা যেন নেমে আসবে এ ঘরে। প্রচুর আলো বাতাসে এ ঘব সুরভিময়। অন্ধকার গুমোটে আমার ঘুম হয় না। অন্ধকার পাগলা কুকুব অথবা অগ্নিকাণ্ড।

আমার চোখের গোলক দুটো আস্তে আস্তে ঘুরে গেল। ত্রিকোণ জানলার মাপে কাটা ত্রিভুজাকৃতি আকাশ দেখা যাচ্ছে এখন। শরৎকাল। আকাশে মেঘ নেই। আয়নার উপমা মনে পড়ল সহজেই। অথচ কোথাও আয়না নেই। কোথাও আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখি না। মনের প্রতিবিম্ব কোথাও পড়ে কি? আমি হলফ করে কিছুই বলতে পারবো না।

চোখ দুটো সামান্য প্রসারিত করতেই দেখা গেলো শহরের উঁচু উঁচু বাড়ি, আব বাড়িগুলোর পাশ ঘেঁষে কয়েকটা ধূসর চিমনি। চিমনির ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে যেন আকাশ ছুঁতে চায়। এখন কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ারাশিকে মনে হচ্ছে ক্ষ্যাপা সাপের মতো। ওদের নিম্নাংশ কালো, মধ্যাংশ ধূসর এবং ঊর্ধ্বাংশ নীলিমায় লীন—ফলতঃ নীল।

ঘুমেল ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করছে আমার মাথাটা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে লক্ষ কোটি পা-গজানো একটি অতিকায় পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে যেন। নিষ্কৃতি চাই, সেই ভয়াবহ পোকার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই আমার। বালিশটাকে আড়াআড়িভাবে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে নিয়ে মাথাটা উঁচু করলাম আরো খানিকটা। ঘুমের মাদকতা কাটাবার জন্যে মোচড় দিলাম বিছানায়।

এখন শহরের বাড়িগুলো স্পষ্ট, আর রেল-লাইনের পাশের খুপরিগুলো স্পষ্টতর। পুরনো টিন, বাঁশের পুরনো বেড়া আর পাটখড়ি দিয়ে বানানো অপ্রশস্ত ঘন সন্নিবিষ্ট খুপরির সারি। ঐ খুপরিগুলোতে নাকি মানুষ বাস করে। কথাটা উপলব্ধি করতে আমার বেশ কিছু সময় গেছে। কিছুদিন পুঁথিপুস্তক পড়ে মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা আমূল পালটে গিয়েছিল। হাত-পা-অলা জীবমাত্রই মানুষ নয়। মানুষ হতে হলে আরো কিছু অবান্তর জিনিসের প্রয়োজন। কথাটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে, আর অনুক্ষণ মর্মপীড়ায় ভুগিয়েছে। এখন আমি বই পড়ি না, হাত-পা-অলা জীবদের যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় অবান্তর বস্তুগুলো আমার বোধের অতীত। আমি ভাবি না,

আমি শুধু দেখি। আমি শিকারী বিড়ালের মতো শান্ত করেছি আমার চোখ দুটো।

বস্তির বুক ফুঁড়ে অমোঘ প্রত্যাশার মতো দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়াচুলো গাছটা। আমি তাকে দেখি। সদীপ্ত নক্ষত্রের মতো আমার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে রশ্মিময় হাত। হাত বুলোতে থাকি তার গোড়ায়, আশে পাশে। দুপুরের রোদে সব কিছু আলোকিত হয়। গাছটাও। হালকা বাতাসে তার পাতাগুলো নড়ে, হয়তো-বা কাঁপে। প্রতিটি পাতার বুকে টুকরো টুকরো ছায়া। ফলতঃ গাছটাই ছায়া-ছায়া।

ছ'মাস আগেও ঐ গাছের তলায় কোনো খুপরি ছিল না। কি এক বিবাগী নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ছিল তার আশপাশ। এখন তাকে কেন্দ্র করে একটি টিনের খুপরি। খুপরির উজ্জ্বল টিনগুলো জ্বলছে, বলা যাক জ্বল জ্বল করছে।

আমার মনে পড়ে কোনো অত্যুজ্জ্বল দীঘির কথা।

নির্জন মাঠ।

খা খা দুপুর।

একটা নিঃসঙ্গ দীঘি।

একজন ক্লান্ত পথিক।

জ্বল জ্বল দীঘি।

দীঘি আর চোখ।

না, আমার ভুল হয়নি। চোখ দুটো ঠিকই বিঁধে গেছে ওখানে। ও দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে এদিকে। আমি যেন জানতাম, আমি যেন এ-আশাই করেছিলাম।

**পুনর্কথন ঃ**

ভাবছেন ভণিতা করছি। হ্যাঁ, ভণিতাই করছি আমি। অত্যুজ্জ্বল মোড়কের মতো এক-একটি ভণিতা, এক-একটি পলায়নকুঞ্জের মতো আমার কাছে লোভনীয় ঠেকছে এখন। স্পর্শাতীত গুচ্ছ গুচ্ছ প্রলোভন আমাকে নাচায়, প্রতি মুহূর্তে আমি সে-সব অরূপরতনের অশরীরী ঘ্রাণে চুর হয়ে যাচ্ছি হয়তো-বা। চেতনার আপাত-ঊষর জগতে সেই অলৌকিক শিখাটি এখনো জ্বলছে কিনা আমি জানি না। আমি জানি না অক্ষিগোলকের কোন নিঃসীম দিগন্তে তার দীপ্ত চকিতে মূর্তিমান হয়ে উঠবে। অথচ আমার চেতনার প্রতিটি রন্ধ্রের তোরণে তোরণে হতচকিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি......হয়তো বা রাত্রিমালতি কিংবা রজনীগন্ধার সুরভিসম্ভারে আমার

চারপাশ উর্বর হবে...আর মুহূর্তেই কুকারের তীব্রতম শিখার মতো সেই হৃতশিখাটি সবুজাভ হয়ে উঠবে আমাকে ঘিরে......

**সেই দুপুরঃ**

ছ'মাস আগে প্রথম তাকে দেখি। লাল শাড়ির পরিধিতে আবদ্ধ ধারালো শ্যামল দেহ। দেহের ঘনিষ্ঠ বাঁক। বাঁকে বাঁকে ফেনিল তরঙ্গের উন্মত্ততা। পরম স্নানার্থী আমি যেন সেই বাঁকে অতল ডুবেছিলাম। আর মুহূর্তেই ঘেয়ো কুকুরটা পাকানো লেজে তাড়িয়ে দিল আমাকে। স্বভাবতই ছুটতে হয়েছে। নগরীর আঁকাবাঁকা অলিগলি ফেরি করে অসম্ভব দ্রুততায়। দোতলার সিঁড়ি মাড়িয়ে এ নির্জন নিরন্ধ্র ঘরে পোঁছতে হয়েছে আমাকে। আর আমার অন্তরীণ সেই সবুজ শিখাটি গতিময় বায়বীয়তায় লেলিহান অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়ে গেল।

আমার সেই মুহূর্তের অধঃপতন—তার কাহিনী—না, আমি লুকোবো না। আমি অন্তত আপনার কাছে সহজ হবো। এখন এই নির্জন দুপুরে আমি ছাড়া অর্থাৎ আপনি ছাড়া, মানে আমার মন ছাড়া আর কেউ তো নেই। আমি কাউকে কিছুই তো শোনাচ্ছি না। আমি ভয় করবো কাকে।

বিশ্বেস করুন, সুদীর্ঘ ছ'মাস আমি জলস্পর্শ করিনি। বাথরুমে গেছি, স্নান করিনি। সেই ছ'মাস আগের কথা। শাওয়ারের জলের ধারায় স্নাত হতে হতে জানালার ফাঁক দিয়ে চোখ দুটো গলিয়ে দিলাম। দুপুর। দুপুরে বস্তির অধিকাংশ মেয়েরাই স্নান করে।

ভেজা কাপড়ের ফাঁকে ফুটে-ওঠা সেই লালপেড়ে যৌবনকে আমি দেখেছিলাম। এর আগে এমন নিটোল যৌবন আমি দেখিনি। দেখেছি, হয়তো-বা চিনিনি। সব কিছু সব সময় চেনা যায় না, চেনা হয় না।

কোথায় সাইরেন পড়ল না, অথচ আমার রক্তে ঝড় উঠলো নিঃসঙ্গ নরম মাংসময় কারুকার্যের শিকার হলাম আমি। অতঃপর ভীষণভাবে গুটিয়ে গেলাম। ধরা-পড়া আসামীর মতো। নিজের নিঃসঙ্গ নীচতায় নিজেকেই ঘৃণা করলাম। চরমভাবে ঘৃণা করলাম নিজেকে। সেই মুহূর্তে বস্তির সেই যুবতী মেয়েটি আমার চোখে অনন্য পবিত্রতার মতো জ্বল জ্বল করলো। কি পবিত্র মহিমায় লালন করেছে সে তার বিপন্ন সম্পদ, যা মুহূর্তেই কদর্য হতে পারে,—এবং যাকে আমি অনায়াসে কদর্য করতে চেয়েছিলাম। তখন আত্মপলায়নহেতু আমাকে দার্শনিক হতে হলো। আসলে পৃথিবীতে কিছু কদর্য নয়, নেই।

তারপর ছ'মাস আমি সেই পাগলা কুকুরের তাড়া খেয়েছি। অগ্নিকাণ্ডে

দগ্ধ হতে হতে আত্মহননের প্রবল অনীহার মুখোমুখি হতে হলো আমাকে। অর্থাৎ, আমি জনাব......ইত্যাদি, আমার পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোকটির মুখোশ ফেলে আত্মবিন্যাসে মনোনিবেশ করলাম। বস্তির সেই অনন্য পবিত্রতা আমার কাছে পরশ পাথর হয়ে গেল। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। ক্ষ্যাপার মতো। আজ এ মুহূর্তে আমার বিছানার বালিশটা দেয়ালের সাথে আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে মাথাটা উঁচু করার মুহূর্ত পর্যন্ত।

**পুনর্কথনঃ**

কালো রাত্রির মতো দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াতো যে অভিশপ্ত অ্যানসেন্ট মেরিনার, আপনারা তাকে নিশ্চয়ই চেনেন। বিয়ের বাদ্যে মুখরিত গৃহাঙ্গন, অথচ সেই অভিশপ্ত নাবিকের হাত থেকে, তার জাদুকরী চোখের প্রখরতা থেকে রেহাই নেই বিয়ে-বাড়ির শৌখিন অতিথিরও। দেখুন, কি ভয়াবহ আত্মতৃপ্তির লোভে নাবিকের চোখ দুটো জ্বলছে, বিয়ে-বাড়ির অত্যুজ্জ্বল আলোকসজ্জাও মিইয়ে এসেছে তার চোখের প্রখরতায়, আর নিষ্প্রাণ নিস্তেজ হয়ে এসেছে অতিথির অস্তিত্বের সমস্ত অনুপরমাণু।

বিশ্বাস করুন, আমি সেই অভিশপ্ত নাবিক নই। আপনারা উৎসব করুন, তরঙ্গিত আলোকমালায় ভরে উঠুক আমাদের গৃহাঙ্গন, অতিথিরা আসুক... আমি শুধু এই আলোকিত স্তম্ভের গোড়ায় অবিনাশী অন্ধকারে বসে থাকবো। হ্যাঁ. উৎসব হোক চারদিকে, আলো জ্বলুক সারি সারি, আর কোথাও একটি সবুজ শিখা জ্বলে উঠুক আমার হারানো শিখাটির মতো।

**সেই দুপুরঃ**

না, আমার ভুল হয়নি। ওর মুখটা, এবং চোখ দুটোও, এদিকে ঘুরে যাচ্ছে। এবং সেই অলৌকিক ঘটনাটা ঘটলো। অর্থাৎ ও তাকালো, আমি তাকালাম। চোখাচোখি হলো। সুদীর্ঘ ছ'মাসের মধ্যে চোখাচোখি হলো প্রথম-বারের মতো। ও যেন হঠাৎ বোকা বনে গেলো। ফিক করে হাসলো। সবুজ শাড়ির খানিকটা বাতাসে উড়লো।

ধপ করে আমার মাথাটা বালিশচ্যুত হয়ে বিছানায় পড়লো।

এখন একটি সরু আলোকরশ্মি প্রবেশ করেছে ঘরে। অসংখ্য ধূলিকণা নাচছে, নেচে নেচে ভাসছে...আলোরেখাটা ধরে।

আমি পরশমণির স্পর্শ পেয়েছি। আমি আশ্চর্য বাগানে বাগানে ঘুরছি।

হে উৎসবমুখরিত বিয়েবাড়ির সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আপনারা সবাই দেখুন, দুপুরের রোদ সবুজ, দুপুরের আকাশ জুড়ে একটা সবুজ শাড়ি।

# জনক জননী

**পূরবী বসু**

পেটের অসহ্য ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জুলেখা। তখন ভেবেছিলেন খাবার কোনো গোলমালে পেট নাড়া দিয়েছে। ব্যথাটা আরেকটু কম হলে নিজেই একটা বড়ি খেয়ে পড়ে থাকতেন। কাউকে বলারও দরকার পড়ত না। কিন্তু বেদনাটা প্রচণ্ডতার দিক দিয়ে যেমন, অভিনবত্বের দিক দিয়েও কেমন নতুন মনে হয়েছিল জুলেখার কাছে। ফলে, ভয় পেয়েছিলেন। হাসপাতালে আসার কথা অবশ্য তখনো ভাবেননি। কিন্তু সারাদিন পর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে মঈনুদ্দিন স্ত্রীর চোখে-মুখে কি দেখলেন কে জানে? খোকাকে ডেকে বললেন, 'একটা রিকসা ডাকো। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' রাস্তায় যেতে যেতে প্রথমে জানতে চাইছিলেন জুলেখা, কেন হাসপাতালে যাচ্ছেন। মঈনুদ্দিন ফিসফিস করে যা বল্লেন, তাকে সাপের হিসহিস শব্দের চাইতেও শীতল ও ভয়ংকর মনে হলো জুলেখার। মঈনুদ্দিনের সন্দেহ যদি সত্যি হয়? প্রৌঢ় স্বামীর শীর্ণ হাতটি চেপে ধরে জুলেখা বললেন, 'আমার বড় ভয় করছে গো। তখন তোমাকে এত করে বললাম।' মঈনুদ্দিন নীরব, অবসন্ন। ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

হাসপাতালে আসার পর ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ পরই বিছানায় শুয়ে চিৎকার শুরু করলেন জুলেখা। ডাক্তার ছুটে এসে একটা বড়ি দিলেন খেতে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরও যখন তাতে ব্যথা কমলো না একটুও, বাধ্য হয়ে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিলেন। একটু পরই সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে ঘুম নেমে এলো দু' চোখে।

পরদিন জেগে উঠে ব্যথাটা কম মনে হলো জুলেখার। তাই স্বভাবতই মন কিছুটা প্রফুল্ল। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। দুপুর না গড়াতেই নতুন মারাত্মক লক্ষণটি স্পষ্ট হতে লাগল। ব্যথাটা ক্রমে পেটের নিচের দিকে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল জুলেখার। ভাবতে চাইলেন শরীর থেকে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণাটা। ঘটলও তাই। ব্যথা অনেকটা কমল, কিন্তু শ্রাবণের মত অবিরল উষ্ণ ধারা সর্বাঙ্গ নাইয়ে দিতে লাগল জুলেখার। বাথরুম থেকে বের হতে তাঁর মনে হলো পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসছে। শরীরের সমস্ত

শক্তি একত্রিত করেও জুলেখার মনে হলো না কয়েক হাত দূরের বেডটিতে আর কখনো ফিরে যেতে পারবেন। জুলেখা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে চাইলেন, কথা ফুটলো না। মৃত্যুকে উপলব্ধি করা গেল যেন। ছেলে মেয়ের মুখগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন একবার। ওপারে যেতে যেতে শেষ মুহূর্তে মনে হলো কে যেন তাঁকে দু-হাতে জাপটে ধরছে। চোখ খুলতে পারছিলেন না। অবসন্ন জুলেখার মনে হলো, মৃত্যুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু জুলেখার মৃত্যু হলো না। যখন চোখ খুললেন, বাইরে দুপুরেব কটকটে রোদ্দুর। দেখলেন, তাঁর বিছানার চারপাশে অনেক ভিড়। ডাক্তার, নার্স, দাইদের উদ্বিগ্ন মুখমণ্ডল। পাশের বেডের রোগিণীও উঠে বসেছিল খাটের ওপর। জুলেখা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল টানাটানি শুরু করেন। ডাক্তার জানতে চান কেমন লাগছে। ঘাড় কাত করে কুশল জানাতেই নার্সকে কি আদেশ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার। নার্স একটা ওষুধ খাইয়ে ঘুমুতে বলে চলে যায় অন্য রোগীদের কাছে। আর জুলেখা আবার ষোল নম্বর ওয়ার্ডের কোণের বেডটিতে শুয়ে কাতরাতে থাকেন।

বিকেলে মঈনুদ্দিন এলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে। জুলেখার আশ্চর্য ফ্যাকাশে মুখ দেখে বড় মেয়ে সালেহা ডুকরে কেঁদে উঠল। বড় ছেলে খোকা বেরিয়ে গিয়ে আঙুর ও ডাব নিয়ে এলো। একটু পর ক্লান্ত জুলেখা ছেলের হাতের আঙুর খেতে খেতে চোখ বুঁজলেন।

রাতে ব্যথাটা আবার বাড়ল। এবারের কষ্টটা আগের দিনের চাইতেও অসহনীয় মনে হলো। জুলেখা আবার চিৎকার শুরু করলেন। ডাক্তার এলেন। নার্স এলেন। ওষুধ দিল। ঘুম এল। আরেকটা রাতের পুনরাবৃত্তিতে ওয়ার্ডের রোগিণীরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারল।

পরদিন ভোরে পাশের বেডের অল্প বয়সী সম্ভাবনাময়ী মেয়েটি হেসে বলল, 'কাল রাতে সবার সামনে কি সব বলছিলেন আপনি! আমরা লজ্জায় মরি। স্বামীকে অমন গালাগালি করছিলেন কেন?'

জুলেখা মাথা নিচু করেন। যদিও এসব কোনো কথাই মনে নেই তাঁর। শুধু মনে পড়ে যন্ত্রণার তীব্রতায় নীল হতে হতে একটা ক্ষুধিত মুখ, দুটি তৃষাতুর চোখ, চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে দেখছিলেন জুলেখা। কিন্তু সেজন্যে স্বামীকে বকাবকি করেননি। তার এই কষ্টের লজ্জাকর কারণ কেমন করে খুলে বলবেন ঐ কন্যার বয়সী মেয়েটির কাছে? অতএব জুলেখা চুপ করে রইলেন। তবে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উত্তাপ কিছুটা কমে এলেও মঈনুদ্দিনের প্রতি ঘৃণার পারদের খুব একটা নিম্নগতি নিজের মধ্যে লক্ষ্য করলেন না। কাপুরুষ, অক্ষম আর কাকে বলে?

সেদিন মঈনন্দিন আসতে পারেননি। রোজ রোজ অফিস থেকে এ সময় ছন্টি পাওয়া যেতে পারে না জন্লেখা জানেন। তাই এ নিয়ে মন খারাপ করেননি। কিন্তু স্বামী আসেনি এজন্য উৎফন্ল্ল হবার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবন্ জন্লেখা খন্শি হয়েছিলেন খোকাকে একা ঘরে ঢন্কতে দেখে। মঈনন্দিনকে হয়তো সত্যি সত্যিই আজ সইতে পারতেন না। কিন্তু খোকার মন্খ এত গম্ভীর কেন? ফলের ঝন্ড়িটা শব্দ করে সেলফের উপর রেখেই খোকা পাশের টন্লটিতে বসে পড়ল। আর কোনো ভূমিকা না করেই বলে বসল, 'ছিঃ মা। এসব কি করতে গেলে তোমরা! ছোট ছোট কতকগন্লো ভাইবোন রয়েছে। ওদের কথাও কি একবার মনে পড়লো না? যদি কিছন্ হতো তোমার?'

জন্লেখার মাথাটা এমন ঝন্ঁকে পড়েছে কেন? খোকা, যে-খোকাকে জন্ম দিতে এই হাসপাতালে এমনিভাবে দন্টো রাত কষ্টে ছটফট করতে হয়েছে, সেই খোকা আজ তার মাকে উপদেশ দিচ্ছে, তিরস্কার করছে, বিশেষতঃ এ ব্যাপারে। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও কি চলে যাবার কোনোই উপায় নেই! হে খোদা! এ কি শন্নলাম আমি? জন্লেখার চোখ মন্খ কান গরম হয়ে জন্বালা করতে লাগল। তিনি জানেন, খোক্যর কথিত ছোট ভাইবোনদের দন্রবস্থার আশঙ্কাটা নিতান্তই বানানো। আসলে খোকা বলতে চায়, ছেলে-মেয়েরা বড় হলে মা-বাবাদের এমন কিছন্ করতে নেই যাতে তারা অন্যের কাছে লজ্জা পেতে পারে। কিন্তু কোত্থেকে এ খবর জানতে পেল খোকা? ডাক্তার তো মাত্র আজ সকালে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ। নিশ্চয়ই খোকার কোনো মেডিক্যাল বন্ধন্ বলেছে ওকে। জন্লেখার আবার মনে হলো মৃত্যু ত্বরান্বিত করা কত কঠিন। খোকা আজ বেশীক্ষণ বসল না। কথাবার্তায় খন্বই সংক্ষিপ্ত। যার প্রায় সবটাই উপদেশমূলক, অভিভাবকসন্লভ। এক সময়ে জন্লেখা বললেন, 'কাল অপারেশন। বড্ড ভয় করছে রে। কে জানে তোদের আবার দেখতে পাবো কিনা।'

খোকা কিন্তু আশ্চর্য, বিচলিত হওয়া দন্রে থাক, এতটন্কু প্রতিক্রিয়াও দেখালো না। বলল, ডি অ্যান্ড সি আসলে কোনো অপারেশনই নয়। ভয় পাবার কিছন্ নেই। খারাপ লাগে শন্ধন্ ইচ্ছে করে কষ্টটা গায়ে লাগালে।

খোকা চলে গেলে অনেকক্ষণ মরার মতো পড়ে রইল জন্লেখা। একসময় একটা চাপা হাসি কানে আসতেই মন্খ না ফিরিয়ে শন্ধন্ চোখ ঘন্রিয়ে জন্লেখা দেখলেন মেয়েটির স্বামী এসেছে। খাটের এক কোণে বসে শায়িতা স্ত্রীর শন্ন্যে উত্থিত বিশাল পেটে হাত বন্লোতে বন্লোতে কি যেন বলছে, আর দন্জনে মিলে হাসছে। জন্লেখা একটা যন্ত্রণার আভাস পেলেন বন্কে, যা জন্ম দিল এক ঝলক স্মৃতি।

'ছেলে না মেয়ে হবে বল তো?' একটা তরুণীর কণ্ঠস্বর, যা জুলেখার ছিল বিশ বছর আগে।

'মেয়ে। টুকটুকে সুন্দর। ঠিক তোমার মতো একটা মেয়ে।' ত্রিশ বছরের এক যুবক বলেছিল।

*'না'—জুলেখার পছন্দ হয়নি কথাটা।* বলেছে, 'ছেলে হবে তুমি দেখো। ছেলে হলেই ভালো। বড় হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। আর এত খাটতে হবে না তোমায়।'

এর পরই প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। কার মত দেখতে হবে সেই অনাগত সন্তান এই নিয়ে খুনসুটিতে মেতে গেছে এক তরুণ-দম্পতি, দারিদ্র্য যাদের তখন অনবরত আশা আর স্বপ্ন দেখাতো।

জুলেখা ওদের দিকে পিছন দিয়ে অন্য দিকে মুখ করে শুলেন। অনেকক্ষণ। যখন চিত হলেন, দেখলেন খানিক আগের চপলতা শেষে ওরা এখন গম্ভীরভাবে খুব মনোযোগ সহকারে কি সব আলোচনা করছেন। একটু পরেই জুলেখার কাছে ওদের কথাবর্তার বিষয়বস্তু স্পষ্ট হলো। ছেলেটির এক দৃষ্টিতে জুলেখাকে নিরীক্ষণ, আর মেয়েটির ঘন ঘন তাকে লক্ষ্য করে বকে-যাওয়া থেকে জুলেখা বুঝলেন, ওরাও সব জেনে গেছে। কোথায় যাবেন জুলেখা? কোথায় গেলে এ পোড়ামুখো প্রসঙ্গ আর উঠবে না?

মঈনুদ্দিনের ওপর রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শুধু কি এখন, সারা জীবনের অক্ষম পুরুষ এই মঈনুদ্দিন। প্রথম বয়সেও কি কম জ্বালিয়েছে তাঁকে? বড় খোকা পেটে এসেছে যখন টের পেলেন জুলেখা তখন সে কি লজ্জা! ছি! ছি! মুখ দেখাবারও উপায় ছিল না কাউকে। অবৈধ ছিল না যদিও, তবু এ মাতৃত্বে লজ্জা আর দৈন্য ছিল, যা জুলেখার নিদারুণ মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। ফলে, তখনো মরে যেতে মন চাইত মাঝে মাঝে। এখন অবশ্য বোঝেন, এ বয়সটাই মরণ চিন্তাকে রোম্যান্টিক করে তোলে। তাহলে, সে অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আজ তো জুলেখার পচে গলে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভাবীরা তখন কি পরিমাণ তামাসা করতো তাকে নিয়ে। যার ভেতরে ঠাট্টার আবরে খোঁচাই প্রচ্ছন্ন ছিল। মঈনুদ্দিন এসবের কোনই খবর রাখতেন না। বিয়ের যৌতুকের টাকায় মহানন্দে শহরে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। জুলেখা তাঁকে হাতে পায়ে ধরে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে যেতে চিঠি লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন, না খেয়ে থাকবো সেও ভালো, তবু আমাকে এ লজ্জা থেকে বাঁচাও। আমার সম্মান তোমার হাতেই তুলে দিয়েছেন আব্বা।' মঈনুদ্দীন স্ত্রীকে নিয়ে আসেন শহরে। এজন্যে এখনো মাঝে মাঝে জুলেখাকে খোঁটা দিতে ছাড়েন না। তখন যদি জুলেখা এমন ভাবাবেগে পরিচালিত না হয়ে আরো কটি মাস মুখ বুঁজে অপেক্ষা

করতেন, তাহলে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে ধুমধাম করে তাকে ঘরে তুলে আনতে পারতেন। জুলেখার সবুর সইল না বলেই এভাবে সারাটা জীবন গোটা সংসারকে পচে মরতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জুলেখার এই একটিমাত্র ভুলের জন্য সংসারের অভাব কষ্ট কোনো কিছুতে হাহুতাশ বা দুঃখ করার উপায় ছিল না মঈনুদ্দিনের সামনে। একে একে সব কথাই মনে পড়ছে জুলেখার। আর একা একা জ্বলছেন, ফুসছেন, উত্তপ্ত হচ্ছেন।

মাথার চুলে পাক ধরেছে জুলেখার। ছোট ছেলেটির বয়স ছয়। বড়টির উনিশ। এ অবস্থায় এ ধরনের কিছু কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রথম লক্ষণকে তাই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বয়সের স্বাভাবিক নিয়ম এটা। দ্বিতীয় লক্ষণকে আমল না দিতে নিজের জন্য বিশেষ রুচিকর খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবেই চলেছে তিন চার মাস। কিন্তু তারপর আর গোপন থাকেনি। মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। দশ হাত শাড়ির আবরণ ভেদ করে যখন জুলেখার ইঙ্গিত বহনকারী উদর ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল, তখন লজ্জায় দুঃখে আশঙ্কায় সত্যিই কেঁদে ফেললেন। এ নিদারুণ দারিদ্র্যে আরেকটি প্রাণের সংযোজন যে কী ভয়ঙ্কর, ভাবতেও শিউরে উঠেছিলেন জুলেখা। নিজের এই জটিল অবস্থার সামগ্রিক যন্ত্রণায় স্বামীকে সঙ্গে করে পেতে চেয়েই জুলেখা এ অঘটন ঘটালেন। অসীম সহনশীলা জুলেখার চোখের জল মঈনুদ্দিনকে বিচলিত করল। তারপর যা করলেন, তারই জন্য জুলেখার আজকের এই দুর্ভোগ। মঈনুদ্দিন নামক লোকটির জন্মই বুঝি হয়েছিল জুলেখার জীবনে কষ্ট সৃষ্টির জন্য।

জুলেখা ভাবলেন পরশু রাতে প্রসব করতে গিয়ে পাশের বেডের যে-মেয়েটি মারা গেল, যার শোকে তার অল্প-বয়সী স্বামীটিকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখলেন জুলেখা, যে না মরে যদি তার স্থলে জুলেখা নিজে মরতে পারতেন, কতই না ভল হত। প্রথম সন্তান জন্ম দিতে এসেছিল মেয়েটি। জুলেখা তাকে অভয় দিতেন, নানান গল্প করতেন। মেয়েটি নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতো। কে জানতো, মৃত্যু ওর এত কাছে ছিল। আশ্চর্য। চেহারাও এতটুকু বদলায়নি। মৃত্যুর দিনেও নয়। অপারেশন থিয়েটারে যাবার সময়ও জুলেখার কাছে দোয়া চেয়েছিল মেয়েটা। জুলেখা তো প্রাণ ভরে দোয়া করেছিলেন। তবু কেন জীবন নিয়ে ফিরে এল না মেয়েটি।

পরদিন বিকেলে মঈনুদ্দিন এলেন ছোট ছেলে-মেয়ে দুটোকে হাত ধরে। মঈনুদ্দিনের প্রতি ঘৃণার আধার তখন টইটুম্বুর। একটু নাড়া লাগলেই পড়ে যাবে—এরকম অবস্থা। এই সময় মঈনুদ্দিন ঘরে ঢুকলেন। জুলেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল মঈনুদ্দিনের দেওয়া সমস্ত কষ্ট লজ্জা যন্ত্রণা সঙ্গে দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেন। চিৎকার করে বলতে চাইছিলেন,

আমার রক্ত, শক্তি, সুস্থতা ফিরিয়ে দাও। কিন্তু কিছুই বললেন না। চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

অজ্ঞানকরা ওষুধটার গন্ধ এখনো শরীরে ভেসে বেড়াচ্ছে টের পেলেন, যদিও অপারেশন হয়ে গেছে সকালেই। ছেলেমেয়ে দুটির দিকেও তাকালেন না জুলেখা। ওরা অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো। মঈনুদ্দিন বললেন, 'সালেহা তোমার জন্য কি তৈরী করে দিয়েছে দেখো। মেয়েটা কেবল কাঁদে। বলে, মাকে ছাড়া বাড়ীটাকে আর সইতে পারি না।'

জুলেখা মুখ ফেরালেন। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলেন বিছানায়। আর কোনো কথা না বলে, কারো দিকে না তাকিয়ে, কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টিফিন-ক্যারিয়ারটা খুলে ছেলেমানুষের মতো গপগপ করে খেতে শুরু করলেন। ছেলেমেয়ে দুটি বিস্মিত। এক দৃষ্টিতে তারা মার দিকে তাকিয়ে আছে। মঈনুদ্দিন স্তব্ধ, বিষণ্ন। পাশের বেডের মেয়েটি এসময় এগিয়ে আসে পরিস্থিতির স্বাভাবিকত্ব রক্ষার্থে। বাচ্চা দুটোকে কাছে ডেকে ওদের হাতে যেই দুটো কমলা তুলে দিয়েছে মেয়েটি, অমনি চৈতন্য হল জুলেখার। মুখ হাত দুটোই থেমে গেল এক সাথে। ছোট ছেলেটিকে নিজের কাছে ডেকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন জুলেখা। উদ্গত অশ্রুকে আড়াল করতে করতে মুখ বিকৃত করে শব্দ করেন উঃ? মঈনুদ্দিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে জুলেখা?' জুলেখা মাথা নাড়িয়ে সায় দেন। সত্যি তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পেটে নয়। অন্য কোথাও। কোথায় ঠিক বুঝতে পারেন না জুলেখা।

ছেলেটিকে ছেড়ে দিতেই সে এক লাফে দূরে সরে যায়। জুলেখা চেয়ে দেখেন নিজের সন্তানদের। তাঁর রক্ত হেঁটে নেচে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখে পাংশুটে জুলেখা তার অসুস্থতা ভুলে যায় কিছুক্ষণের জন্য। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়। আচ্ছা ওটা বেঁচে থাকলে কার মতো হতো দেখতে? খোকা, কামাল, সালেহা, বেনু, না লিলির মতো? না কি ওদের কারোর মতো নয়? জুলেখা অথবা মঈনুদ্দিনের মতো।

একটু পরেই জুলেখার খেয়াল হলো, কি সব উদ্ভট ভাবছিলেন এতক্ষণ, জুলেখা লজ্জা পেলেন এবং হাসলেন।

স্বামীর দিকে এবার চোখ ফেরালেন। দেখলেন। একদিনেই মঈনুদ্দিন অনেকটা শুকিয়ে গেছেন। স্বামীর ক্লান্ত, ম্লান মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জুলেখা বুঝলেন, সংসারের ভেতরে-বাইরের ভার কি দারুণভাবে চেপে বসেছে তার ওপর।

জুলেখা বললেন, 'কাল বাড়ী যাবো। জানো, মনে হয় কতকাল বাড়ী ছেড়ে আছি। এখনো আমার সময় কাটে না একটুও।'

# রোমকূপ

## মাহবুব তালুকদার

অন্ধকার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ইতস্তত ঝুলে আছে। তারই কাছে আত্মগোপনের পরিত্রাণ কামনা করেছে রওনক। মনের শিরাগুলো ওর দেহের কোষে আঙুল চালিয়ে সব রক্ত শুষে নেবে বলে প্রতীতি জন্মেছিল তার। সেই ভয়ে বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে অবসন্ন ভংগীতে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের ঘরের বিছানায় ফেরার সামর্থ্য এখনও অবশিষ্ট নেই। সেখানে স্বপ্নের কাগজ আশার রঙিন নিশানগুলো নিষ্ঠুরা নিয়তি ছিঁড়ে রেখেছে। শরশয্যায় শুয়ে আহত পাখির মত নাজলিও যন্ত্রণার সব কটি সূচ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। প্রবুদ্ধ সময় শতচ্ছিদ্র চোখে এসব দৃশ্য টেনে নিতে বিমুখ হয়নি।

সত্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে—আকস্মিক ব্যাধির সংক্রমণে যেন রওনক বিমূঢ় হয়ে পড়ল। ওর নীচে পরিব্যাপ্ত শূন্যতা ছাড়া অন্য কিছুর অধিবাস অনুভূত হলো না। আকাশের ইজেলে একটুকরো ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ পিন্-আপ করা ছিল। মনের প্ররোচনায় রওনক ওটাকে অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করল। অথচ কিছুক্ষণ আগেও চাঁদের জ্যোৎস্না ঘরে নেবার জন্যে বিছানার পাশে জানালা প্রসারিত করেছিল সে। জ্যোৎস্নার অফুরন্ত আলো বুকভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাতাসের কাছে সে বিশ্বস্ত হতে পারেনি। রওনক একবার জানালায় নির্লিপ্ত দৃষ্টি সংস্থাপন করল। ওটা ভেতর থেকে চাপানো দেখে স্বস্তি অনুভব করল সে।

প্রাত্যাহিক নিয়মে সন্ধ্যা যখন প্রকৃতির কাছে সমর্পিত হয়েছিল, তখন বাড়ী ফিরে অবসাদগ্রস্ত রওনক খানিকটা প্রসন্নতার জলে নিজেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়েছিল। নাজলির সাহচর্যে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি তাকে অবশ করেছিল। চব্বিশ বসন্তের সঞ্চিত যৌবন নিয়ে পিপাসিত মুখের সামনে কামনার পেয়ালা তুলে ধরবার প্রতীক্ষায় ছিল নাজলি। রওনক তা সম্ভোগ করতে দ্বিধা করেনি। বিয়ের পর পরস্পরের উত্তাপে নিজেদের সেঁকে নেয়ার কথা। ওদের দু'জন ধর্মচ্যুত হয়নি। বরং আজ রাতের প্রথম পৃষ্ঠা উলটিয়ে ওরা দু'জন বিশিষ্ট ছবি আঁকতে উন্মুখ হয়েছিল।

নক্শা-কাটা শাড়িতে নাজলি তখন জড়ানো। সেসব ফুলের নক্শা।

ওর হাতে বেলফুলের মালা আর গলায় বকুল ফুল। খোঁপা থেকে রজনী-গন্ধার ঘ্রাণ উঠল। বুকে দুটো স্থলপদ্মের উপর রাশি রাশি রক্ত গোলাপের সমারোহ। অথচ শুভ্র বিছানা ধবধব করছে। রওনক অবাক হলো এবং ওর চোখের দৃষ্টি বিস্ময়কে সপ্রমাণ করল। কিছু বলার দরকার। চোখেমুখে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন স্পষ্ট করে তুলে ধরল সে।

ঃ ফুলকন্যা সেজেছি। নাজলি ওর ঘনিষ্ঠতর হলো, বলল ঃ তুমি আমার শরীরের ঘ্রাণ নাও।

রওনক ইতস্তত না করে ওকে কাছে টানল। ওর অধরে নাম-না-জানা ফুলের স্বাদ গ্রহণ। বলল ঃ কাঁটার আঘাত দেবে না তো।

তরল আনন্দ উপচে পড়ল নাজলির সর্বাঙ্গ থেকে। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে প্রসন্নতার ঢেউ ভেসে আসছে। বিদ্যুতের ঝলকে চোখ উদ্ভাসিত হলো তার। ওর গোলাপেব বনে নাজলি সন্তর্পণে হাত রাখল। ওটা সরিয়ে স্পর্শ বাড়িয়ে দিল সামনে। কি নিটোল নরম স্থলপদ্মের উপলব্ধি। রওনক আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকল। অসিদ্ধ নেশায় বুঁদ হলে যেমন হয়। রওনক দৃশ্যমান ঘন অদৃশ্যলোকে বিলুপ্ত হোল।

টেবিলে ঘড়ির বিরক্তির প্রতিরুক্তি এই মুহূর্তে অন্ততঃ সে সহ্য করতে পারল। জানালার অর্গল খুলে আলোর টুকরো কুড়োবার জন্যে যে ইচ্ছা অবারিত হয়েছিল, তা এখন বিক্ষত।

আহত হলেও সত্যের গর্ভে প্রবেশ করবার জন্যে রওনক এবার এগিয়ে আসছে। কারণ সময়ের বর্তমান উপকরণগুলো অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওর মনের ক্রিয়ার পাশাপাশি প্রতিক্রিয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। সত্যের অনিবার্য উপস্থিতি উপলব্ধি করবার জন্যে ওর বোধের ক্ষেত্র কর্ষিত হতে থাকল।

শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে রওনক নাজলিকে অনুসন্ধান করল। মুখ, চোখ, নাক, কান ও চামড়ার ক্রিয়া যথাযথ উন্মুখ রাখল। কিন্তু সে যেন ক্রমান্বয়ে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে গভীরতর বনানীর দিকে চলে যাচ্ছে। সেই বাগানের মধ্যে সে যা যা দেখবে বাসনা করেছিল, সেখানে কিছু নেই। ঈশ্বরের অলৌকিক দ্বীপে যেখানে প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাতে ভুগর্ভ থেকে নতুন সৃষ্টির বীজ উদ্গারিত হবে ধারণা করা যাচ্ছিল, সেখানে গহনতম অরণ্য-প্রদেশে তরুলতার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। রওনক ভয় পেল। তার দেহ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে গেল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য যেন ওর স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা নামীয় রসগুলোকে শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। রওনক কাঠ কাঠ গলায় চীৎকার করে ডাকল ঃ না-জ-লি!

*ঃ অমন করে উঠলে কেন? অপ্রতিভ শোনাল নার্জলির কণ্ঠ। মধ্যসমুদ্রে নার্জলি কি এখন একটা ভাসমান জলযান!* রওনক সাঁতরে তার নিকটে যেতে পারল না। কেবল সে যেন আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছে। জলমগ্ন হতে হতে অন্তিম বাসনা প্রকাশ করল ঃ আমাকে তোমার ভালবাসার কথা বল।

ঃ তোমার কি যে বাতিক! নার্জলি হাসল ঃ তার কথা তো একদিন বলেছি।

—ওটা কি হাসি? নার্জলির মুখমণ্ডল থেকে একটা বীভৎস হাঙ্গর যেন বেরিয়ে আসছে।

সব শক্তি দিয়ে নিজের পলায়ন প্রতিরোধ করল রওনক। নিঃশ্বাস থেকে প্রশ্বাসে যাওয়ার বিরতিতে স্তব্ধ হল।

তারপর দু'জনের মধ্যে ঘনীভূত নীরবতা। নার্জলি আরও নিকটবর্তী, আরও সান্নিধ্যকামী হলো। কিন্তু রওনক অনুভব করল, একাকী নিঃসঙ্গতার হাতে সে ক্রীড়নক হয়ে ঝুলছে।

ঃ আমার চুলের সমুদ্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তৃপ্ত হচ্ছো না?

সুনিপুণ প্রেমিকার মত নার্জলি প্রশ্ন করল।

ঃ না, অকপট সংলাপের মলাট খুলল রওনক ঃ কতকগুলো শক্ত কালো সুতোর জটে আমি আটকে গেছি। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

ঃ এইত আমি। আরও নিবিড় হল নার্জলি। আবেগরুদ্ধ গলায় বলল ঃ তোমার প্রেমে আমাকে জড়িয়ে নাও। তোমার সত্তার মাঝখানে আমি যেতে চাই।

রওনকের সমগ্র চেতন মুক্তির আশায় ছটফট করল।

ঃ তুমি! তুমি একটা পাষণ্ড। নার্জলি বিছানার অন্যপ্রান্তে নিজেকে নির্বাসিত করল। বলল ঃ তুমি একটা অর্থহীন কাপুরুষ।

বাইরে এসে বারান্দার রেলিং আঁকড়ে ধরে পরিশ্রান্তের মত হাঁপাতে শুরু করল রওনক।

ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে অনুসরণ করে রওনক সত্যের গহ্বরে আশ্রয় নেবেই। ওর মনে যে রঙিন কল্পনার মুখোশ আঁটা আছে, তা একদিন খুলে পড়বে।

আশা এবং স্বপ্ন নামক অদৃশ্য জিনিস দুটো মনের সত্যিকার রূপ আড়ালের অহর্নিশ চক্রান্তে মেতে আছে। তাদের সরিয়ে রওনক ধীরে ধীরে সত্যকে স্পর্শ করল।

ছোটবেলায় একটা কাগজের খেলনা কিনেছিল রওনক। একটা কাগজকাটা মানুষ বাঁশের কাঠি আর সুতোয় ভর করে থাকত। কাঠিটা ধরে নাড়লেই এক একবার ভিন্নতর দেহভঙ্গী করত কাগজের বহুবর্ণ মানুষটা। আসলে সেটা রক্তমাংসে সজ্জিত মানুষের প্রতিও প্রযোজ্য। শুধু সেই কাঠি ও সুতোটা দৃষ্টির অগোচর, যাকে খুঁজতে গিয়ে রিক্ততা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে

*না। তবু রওনক এবার নিজের ছবির সামনে দাঁড়াল। নিজের বর্তমানকে হাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে পারল। এই প্রথম যেন দিব্যদৃষ্টির দরজা খুলে* সত্যের অন্তরে প্রবেশ করতে রওনক দ্বিধাকে উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হলো না। বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রওনক স্পষ্ট অনুভব করল ঘরের ভেতরে এক সাপ খোলস ছেড়ে উঠে আসছে। রওনক নিজের দিকে ফিরে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকল ঃ সাতাশ বৎসর বয়সেও তোমার অর্বাচীনতা দেহকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য। খোলসটাকে তুমি তখন চিনতে পারনি। ওটার ভেতর থেকে যে একটু একটু করে দৃশ্যমান হচ্ছে, তারই আলিঙ্গনে তুমি ধরা দিতে হাত বাড়িয়েছিলে।

আকাশে চাঁদটা প্রতি মুহূর্তে স্থানচ্যুত হচ্ছিল। বাতাসে ঘোড়-সওয়ার হয়ে শীত এল। দূরে কোথায় রাতের ঘণ্টাধ্বনি শুনে চারপাশের ব্যস্ততার মধ্যে রওনকের অশরীরী অস্তিত্ব ক্ষণিকের জন্যে কর্বুর হলো। তাছাড়া, একটা মশাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে পর্যন্ত সে নিজের দেহে আঘাত করল। এ মুহূর্তে সিগারেটের পিপাসায় কাতর হতে রওনকের বাঁধল না।

ঘনতর রাতে ঝিঁঝিঁর অবিশ্রান্ত সংলাপ। প্রকৃতির ফ্রেমের ওপরে রাতের যে চিত্রলিপি আঁকা আছে, তাতে বাস্তবতার চিরাচরিত রং অবসন্নতার প্রতীক বলে বোধ হচ্ছিল। পটের স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রওনক নিজেকে সরিয়ে আনল। সে নিজেকে পৃথক করল। তারপর একবার রওনকের মনে হলো ওর মগজের সবটুকু পদার্থ যেন পচে নষ্ট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যে বোধগুলোকে এতক্ষণ শান দিয়ে আসছিল, তা ক্ষয়ে ক্ষযে নিঃশেষ হয়ে আসছে। একটা ীমাহীন সমুদ্রের অতলে যেন সে ডুবে যাচ্ছে, অথচ তার কোন ভাবান্তর নেই। একান্ত অক্লেশে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ইচ্ছা অনিচ্ছা শূন্য হয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারল রওনক। ঢেউয়ের ফণা জাপটে ধরার জন্যে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘরের ভেতরে নাজলির দেহে কিংবা মনে যন্ত্রণা ছিল না বরং বিমূঢ়ের জাল তাকে চারপাশে থেকে ঘিরে ফেলেছিল। নিজের অকপট সত্যতার জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। -'অকপট সত্যতা?' একবার স্বীয় ভাবনার ওপরে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল নাজলি' ভাবল ঃ আমি সত্যের একাংশ অনাবৃত করেছি মাত্র—বাকীটুকু অন্ধকারের আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে রেখেছে। তা হোক; এর নাম মিথ্যাচার নয়। কিন্তু রওনক একটা কাপুরুষ। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে ভয় পায়। আমার অতীতেব চলন্ত ছায়াচিত্রটি তার কাছে উন্মোচিত না করা সম্ভব ছিল। অথচ তাতে হৃদয় খুঁড়ে যন্ত্রণা পেতে গেলে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়? রওনকের কথা ভেবে নিজের তরফ থেকে সে বেদনাবোধ করল।

*ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি অমূল্য শব্দের যথার্থ অর্থ সম্পর্কে নাজলি* চিরকাল সন্দিহান। তবে বিয়ে যে অনতিরিক্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহ নাস্তি। দেহ ও মনের ক্রিয়াকীর্তির অংগন সংসার। সেখানে সহ-অবস্থান ব্যতিরেকে সাফল্য দূরপরাহত। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নাজলি ভবিষ্যতের কল্পিত মানচিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। তার ধারণা বিগত পথ-পরিক্রমকে ভ্রান্তি বা অভ্রান্তি হিসাবে মেনে নিলে আগামী যাত্রার দিকনির্ণয় সহজতর। এজন্যে রওনকের চোখের সামনে নিজের সত্য ঘটনার কিয়দংশের ঢাকনা তুলে ধরেছিল। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত নিয়মাবলী ভিন্নতর।

নাজলি বিমূঢ় হল। ইতিমধ্যে সে তার অতীত প্রেমের স্মৃতিময় তথ্যগুলো সন্নিবেশিত করে দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মত গুরুত্বের তারতম্য হিসাবে মনের সম্মুখে সাজালো। সেখানে যাবতীয় ঘটনার মধ্যে জনকয়েক পুরুষের সাথে মানসিক ও দেহময় সম্পর্কের উল্লেখ প্রতিভাত হলো।

কথাগুলো মনে হতেই সচকিত হয়ে সে আবার ওগুলো বিস্মৃতির অবয়বহীন প্রকোষ্ঠে ঠেলে দিল।

নাজলি একসময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। স্খলিত আঁচল, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার প্রভৃতি আবরণী সরঞ্জাম পনুর্বিন্যাস করল। স্যাণ্ডেল পায়ে গলাতে খানিক দেরী হলো। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বারান্দায় এল সে। রওনকের কাঁধে আলতোভাবে করতল তুলে দিল।

রওনক টের পেলো, কিন্তু ওর অনুভূতিশূন্য অস্তিত্বে টের পাওয়া ছাড়া অন্যকিছু উপলব্ধ হলো না।

নাজলি ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে বলল ঃ ঘরে এসো।

ঃ আমি ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেছি। টেনে বলল রওনক।

ঃ ও-ঘরের চাবি ছাড়াই ঢুকতে পার। নাজলির কণ্ঠ জলস্রোতের মত শোনাল ঃ চাবি হাতে থাকলেই ঘর আপনার হয় না।

রওনকের নিশ্চুপতা অর্থবহ হলো। চতুর্দিকে দৃশ্যাবলী সময়ের হাত ধরে চলচ্চিত্রের মত অনর্গল ছুটে চলেছে। রাত্রির পশ্চাৎপট নির্দিষ্ট গতিতে সরে যাচ্ছে আসন্ন ভোরের দিকে। অন্ধকারের জঠর ছিন্ন করে ভোরের প্রথম আলো একটি নবজাতক দিনের জন্ম ঘোষণা করবে।

ঃ আমি একটি নিষ্পাপ পুষ্পের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। রওনক একসময়ে স্বগতোক্তি করল।

ঃ নিষ্পাপ হলেই পুষ্প সার্থক হয় না। নাজলি বিরুদ্ধকথনে ম্রিয়মাণ হলো ঃ সৌরভের মধুরতাই তার সাফল্য।

হঠাৎ যেন নায়কের সম্পূর্ণ সংলাপ ভুলে গেছে, এমনিতর অবস্থায় রওনক কথার উত্তর হাতড়ালো। ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুর মধ্যে আঙুল চালানো গেল না।

*গভীর স্বপ্নের ভেতর নিরুত্তাপ কণ্ঠে যেমন অর্থবোধক শব্দ অনুচ্চারিত থাকে ঠিক তেমনি হলো।*

এরপর দৃশ্যতঃ কি ঘটবে, কি ঘটা স্বাভাবিক; তার জন্যে সময়ের ব্যাকুলতর প্রতীক্ষা। কিন্তু নৌকার হাল রওনকের হাতে ছিল না, নার্জলি ওর হাত ধরে গুন টানার মত টানল। আশ্চর্য নয়, রওনক কোনো শব্দ ব্যয় না করে ঘরে এল। সুইচ টেপার যাদুতে ঘর আলোকিত করতে চাইল। নার্জলি বাধা ছিল।

বাধা দিতে ওর হাত ধরে টানল নার্জলি। অনেক, অনেকটুকু দূরত্ব সত্ত্বেও রওনক তার বাহুতে বন্দী হলো। এবারে যেন একটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা বেরিয়ে এল বলে সে অনুভব করল।

ঃ আমি এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ঝাঁপিয়ে পড়ে দিগ্বিজয়ের বাসনায় রওনক নিজের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্রাটের প্রতিচ্ছবি কল্পনা করল।

ঃ নার্জলি ছটফট করল। সারাদেহে যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হলে বুঝি এমন হয়। যন্ত্রণার অন্য নাম বুঝি আনন্দ!

সন্ধ্যারাতের সব ঘৃণা, প্রতিবাদ, ব্যর্থতা থেকে এখন মধ্যরাতে যেন এক নতুন রওনক জন্ম নিয়েছে। সে আর দ্বিধাগ্রস্ত নয়। গোপনে, অতিগোপনে নার্জলি নিজের মনের কাছে বলল, উদ্ধত সাপকে বশীভূত করা হয়েছে। মনে মনে হাসি পেল তার।

অথচ একসময়ে রওনক ওকে চমকে দিয়ে সেই সন্ধ্যারাতের কথাই পুনরাবৃত্তি করল ঃ তোমার ভালবাসার কথা বল।

ঃ কি! চমকে উঠে অজ্ঞতার ভান করল নার্জলি।

ঃ তোমাকে পেয়ে সে কি এমন করেছিল?

নার্জলি উত্তর দিতে পারল না। দম বন্ধ হয়ে এল। ওর কণ্ঠের বাক্যগুলোকে যেন ক্রুশবিদ্ধ করে জিহ্বার সাথে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু মনের গভীর গোপন আকাঙ্ক্ষায় অতি সন্তর্পণে নার্জলি বিগত কোনো এক স্মরণীয় রাত্রির নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

# গোরনিদ্রা

**শওকত ওসমান**

দমকা নির্বাপিত কোলাহলের রেশ বাতাসকে হটিয়ে দিয়ে যে গুমোট সৃষ্টি করে তা কান পেতে শোনা যায় না। কিন্তু রক্তের প্রবাহ তার যেই দুই হাতে তেড়ে ধরে, শত্রুর কাছ থেকে আলিঙ্গন দাবীর ভঙ্গীতে। ছলাচ্ছল বুক তড়পে তড়পে চোখকে সজাগ করে, পায়ে বেড়ি লাগায়। তোমাকে হাঁটতে দিতে চায় না। তবু তুমি হাঁটো। হৃদয়-সড়কে অন্ধ রাত-ভিখিরীর হাতড়ানি তখন আরম্ভ হয়।

আমি হাঁটছিলাম। জন শূন্যতায় প্রেতায়িত পথ হঠাৎ সুমসাম শরতের নদীর মত আকাশে চোখ রেখে বিশ্রাম প্রার্থী। দু পাশের ইমারৎ শুধু মাথা তুলে তার নক্ষত্র অভিসারে বাধা দিচ্ছে। সন্ধ্যা ত কখন পার হোয়ে গেছে। আজ টেরও পাইনি। কিন্তু জানি, সায়ং প্রহর ক্রমশঃ অনেক অনেক অন্ধকারকে ডাক দিয়ে গেছে ঢ্যাঁড়াদার বাদুড় মারফৎ। এই জানা কোন্ অনুভূতির মারফৎ পাওয়া, তা বলতে পারব না।

নিজের শুকর-অভ্যাস ভুলে আকাশের দিকেও চেয়েছিলাম একবার। হাজার হাজার নক্ষত্র ফুটে আছে। কিন্তু চোখ কোথাও ত স্থির থাকতে চায় না। সড়ক-পার্শ্বস্থ গাছের শাখা-প্রশাখারা বেয়নটের মতো খোঁচা খোঁচা কদর্যতায় দৃষ্টিকে ঠেলে ফিরিয়ে দিলে। দুঃসহ নির্জনতা এক দানবীয় রূপে আমার পেছন পেছন পা ফেলছে নিছক বিদ্রূপের জন্য। ক্ষীণকায় নাগরিকের অনুকরণ মহড়ায় বিপুল-কদ্ মল্লবীরের হাস্যাবতারনার মত। আশে পাশে দাঁড়ায়, এমন দর্শকেরাই হাসে। কিন্তু বিন্দুতম যেমন শব্দ আমার কানে আঘাত করে না। খুব জোর চাপা ফিসফিসানির আওয়াজ আন্দাজে ধরা যায় মাত্র। গ্রাম-জনপদে বাঘের সংবাদে যেমন সূর্যের আলো-নেভার সঙ্গে সব নিশুত হোয়ে যায়, এও তেমনি। পথ ফাঁকা। সড়ক নির্জন। অথচ সবাই জেগে আছে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে। আসন্ন দিন ও বিপদের কথা ভাবছে। বাতাসে শুনছে হুঙ্কার বা থাবা-বন্দী মানুষ কি জন্তুর দূরাগত আর্তনাদ।

হাঁ, সড়কের সারি সারি ঘরে মানুষ এখনও ঘুমোয়নি। কয়েকটা ঈষৎ খোলা খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। ওর পেছনে কি মানুষ নেই? ঝাপসা চাঁদের আলোর আমার তীক্ষ্ম দৃষ্টিজালে তা ধরা পড়েছে।

কিন্তু এই গুমোট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কোন দরজায় টোকা দিলে, কেউ সাড়া দেবে না। এই সড়কের বাসিন্দাদের খলসৎ আমার জানা আছে। ভান করবে, তারা ঘুমোচ্ছে আসহাব কাহাফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বাতি নিভিয়ে ঘরের কামরায় কি বারান্দায় যদি ওরা হাঁটে, তোমার উপস্থিতি টের পেলে তারা সুট্ করে থেমে যাবে—যেমন গৃহস্বামীর পদধ্বনি—ভীত চাউল-গোলার নেংটি ইঁদুর।

তাই একা একাই হাঁটছিলাম। থামিনি কোথাও। কথা হৃদয়ের উত্তাপ বিকীরণের স্টেশন। মনের গুমোট থেকে রেহাই পেতে তাই মানুষ খোঁজে মানুষ। একান্ত মনের দোসর না হলেও চলে। কিন্তু এই পল্লীর হদিস আমার জানা আছে বলেই, পায়ের কামাই ছিল না। সব খিড়কী বন্ধ, সব দুয়ার রুদ্ধ। বিচিত্র কিছু নয়। জীবনযাপন পাঁয়তারা মাত্র! বাঁচতে চাও, শুধু পাঁয়তারা কষো। সকাল থেকে চৌপর দিন, সারা রাত্রি। সহজ বাঁচা এ পাড়ার লোকেরা কবেই বিস্মৃত। পাঁয়তারা, পাঁয়তারা। এই কষাকষির হদিস না জানলে তুমি মড়া। দরজা জানালার ওপারে কৌশলবিদরা সব জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে। রাস্তা জনহীন।

আমি কিন্তু এগোচ্ছি। গ্যাসের স্তিমিত আলো আজো জ্বলছে কোথাও কোথাও। জানালার দুই পাল্লা দুই কোন ঘরে একদম সাঁট সাঁটা। পিপীলিকার প্রবেশ ফাঁক করে ঠান্ডা বাতাসের জন্য কেউ কেউ দুই পাল্লা হয়ত পেছনে ধরে বসে আছে। গ্যাসের আলোয় দেখলাম, হঠাৎ একটা পাল্লা চট করে খুলে গেল, বেরিয়ে এলো একটা নগ্নহাত। সে হাত নাড়ছে। কার জন্য? হাতের ভাষা আমার জন্যে নিশ্চয়। ইশারার অর্থ ফিরে যাও। একা একা কোথায় যাচ্ছো ওদিকে। নিমেষে হাত উধাও। দোতালা জানালার দুই পাল্লা আবার সেঁটে মিশে গেল। গ্যাসের আলো রং ছুট কাঠের দাঁত খিঁচুনি স্পষ্ট করে তুললে। ঘরের বাসিন্দাগুলো কাঠের তৈরী, বাইরে তাদেরই মুখ দেখতে পেলাম যেন।

বেদনার ক্রুশবাহী আমি যীশুখ্রীষ্ট। হয়ত ক্যালভেরীর সড়কে এগিয়ে যাচ্ছি। কন্টক মুকুট আমার মাথায়, নয় বুকে। ধর্ষিতা বাতাসও আজ গোঙানি ভুলে গেছে। অসহ্য গুমোট ভেতরে, বাইরে। চোখের জ্বালায় অশ্রুর উঁকি পর্যন্ত অসম্ভব। দগ্ধ ঘায়ের উপর পানির সিঞ্চন কোনকালেই তাপহর ছিল?

আর এক সড়কে এসে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। এখানে দুপাশে মাঝে মাঝে গাছ আছে, আগাছার বন আছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, শুনতে পেলাম। মাথার উপর গাছ-আশ্রিত পাখীর ডাকও কানে গেল। হয়ত পাখী। তখন অত লক্ষ্য করিনি। বনজশীতলতা আছে, এখানে না থাক বাতাস। সড়কের

উপর কয়েকটা ছুঁচো ছুঁ ছুঁ শব্দে দৌড়াদৌড়ি করছে। এরাও বুঝেছে, সড়ক জনশূন্য। তাই স্বাধীনতা উপভোগ-মত্ত। ছুঁচোরাও টের পায়, স্বাধীনতার মর্ম বোঝে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে পাথুরে সড়কের উপর। আমার উপস্থিতি তাদের ভয়ের কারণ হোল না। কারণ, একটা মানুষ তো আর মানুষ নয়। দল বেঁধে গেলে না। ভয় পাওয়ার কথা। তা-ও ছুছুন্দর যেমন বোঝে। হুম্পোড় তুলে জীবগুলো আগাছার রাজ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

সটান সড়ক। চোখ তুলে সামনে দেখে নিই। এবার আমার বিস্ময় সহজে কাটে না। আমার কাছ থেকে দু'শ গজ—হাঁ, কি তার কিছু বেশী দূরে—দেখলাম, চারজন লোক হাঁটছে। এই সড়কে আরো মানুষ চলাফেরা করছে। বিস্ময় বৈকি। চোখ কচ্‌লে নিই। ওরা কী যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাঠের উপর তার লক্ষণ স্পষ্ট। সবকিছু নিজের কাছে আরো স্পষ্ট করে তুলতে আমি দ্রুত পা চালাতে লাগলাম।

অতি ঢিমালয়ে হঠাৎ আলোড়ন দেখা গেল গাছপালায়। মড়ার খুলির মধ্যে বাতাসের শীৎকার যে ফিসফিসানী তোলে, তারই মৃদু রব কানের কাছে এসে পৌঁছায়। আমি কিন্তু চলা বিস্মৃত হইনি। দূরত্বের ফারাক অনেক কমে এসেছে। হয়ত আর একশ গজও নয়।

এবার দেখতে পেলাম, সেই জন চতুষ্টয় একটা লাশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সকলের কাঁধে শবাধারের ডাঁট। আধেয়টা পরিষ্কার না হলেও চোখে দেখা যায়। লাশ চাদরে ঢাকা। শবাধার একেবারেই নিরাভরণ। কাঠে পালিশ পর্যন্ত নেই। আর ফুলের কোন নাম-গন্ধ কাছাকাছি আছে বলে মনে হোলো না। তা থেকে অনুমান করা যায়, এ মৃত্যু অতি সাধারণ মৃত্যু। তার কোন আলোড়ন জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্‌বুদ্‌ তোলে না। আর শব যে অতি সাধারণ কোন জীব, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। মাত্র চারজন শব-বাহক। শোকযাত্রী একজন থাকলেও বোঝা যেত, এই মৃত্যু কিছু রেশ রেখে গেছে পেছনে।

আমার আর কৌতূহল থাকার কথা নয়। রোজই ত কত মৃত্যু ঘটে, আর গোরস্তানে কত মড়া পোঁতা হয়—এর আবার খোঁজ নেব কি? যে মৃত্যু জানা দিতে পারে, তার খবর শহরে বনাগ্নির মত দাহন তোলে নিমিষেই।

কিন্তু পথে মানুষ আছে—এই ত আজ বিস্ময়। তা জীবিত কী মৃত দেখার প্রয়োজন কী? আর জীবিত মানুষ ত চারজন রয়েছে। ওদের সঙ্গ আজ না লাভ করলে, অনেক আপসোস থেকে যাবে। পথে যে বেরুলাম, তার দাম চাইব না? নিছক কৌতূহল যদি মেটে তাই মন্দ কী। সাথ ধরতেই হবে ওদের। গ্যাসের স্তিমিত আলো হেথাহোথা ছড়িয়ে আছে, চাঁদ উঠেছে ইতিমধ্যেই। তাই পথের ছমছম অস্পষ্টতা দূর হোয়ে গেছে। পথ চলতে তেমন অসুবিধা ঠেকে না। আর সব শ্রান্তি চুরি করে নিয়ে গেছে কৌতূহল।

মানুষের গন্ধ পাওয়া রাক্ষসের মত আমার দুই চরণ তখন দ্রুততার প্রতীক।

কিন্তু সাথ ধরা যত সহজ মনে করেছিলাম, তা আর হয় না। আমার অগ্রবর্তীরা বেশ জোরে হাঁটছে। এক শ' গজের ব্যবধান আর ক্ষয় করতে পারছি নে। মনে হয়, কত যুগ না হাঁটলাম। অথচ গন্তব্য পারদতরলতায় পিছলে পিছলে যাচ্ছে। হয়ত দিগন্তের মতই এর অবস্থান মরীচিকাময়।

আমি রীতিমত ঘেমে উঠলাম পথ হাঁটতে। হাঁটতে শ্রান্তি-জাত বৈকল্যে আমার কানের ভেতর তখন নানা শব্দ উঠেছে। হিসহাস চিচাদ্রুমদ্রাম ঠংঠাং। গোটা পাওয়ার হাউস্ যেন মাথার মধ্যে ঢুকেছে। আমার পা পরাজিত শববাহীদের কাছে। একবার ভাবলাম দৌড় দিয়ে দেখলে কেমন হয়। কিন্তু প্রেতায়িত মৌতাতে বুঁদ শরীর, কোন শক্তি নিয়ে বা দৌড় দেবে?

পিছু নিলাম ঝানু গোয়েন্দার মত। জানি স্থানের ফারাক দূর করতে পারছিনে, তবু। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি, ওরা এগোচ্ছে আর আরবী দরূদ পড়ছে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে। ওদের সহযাত্রী হতে পারলে ত শব-বাহনের কিছু শ্রম হ্রাস করতে পারি। লোকগুলো একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। চীৎকার দিতে গিয়ে নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পেলাম। বহুদিন আহার ব্যতীত আমার গলা ত আর বিশেষ কোন কাজে লাগে নি। ছোট বিলের মাছের ফুলকার মত আমার কণ্ঠ কমজোর। চীৎকারে ওদের চলা থামাতে পারব না।

জোরেই হাঁটতে লাগলাম। এবার আমার কোনদিকে আর কোন দৃষ্টি নেই। নিজের সমস্ত অক্ষমতা-জাত লজ্জা আমি ভুলে গেছি। এক ওদের সাথ-ধরা ছাড়া আর সব চিন্তাই ঝেঁটিয়ে ফেললাম বুকের দম নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বেঁধে। পায়ের পেশী তখন হুকুম শুনলে। দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর টের পাই, আমি ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছি। হাঁ, লাশ শবাধার, শববাহক—আমার চোখ বিন্দুমাত্র ভুল কিছু দেখেনি। আমি আরো নিকটবর্তী। ওরা জোরে জোরে আরবী কলমা পড়ছে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে। আমার কানে তার স্বরে সব ফুটে উঠে। ঘন ঘন কানে ঢেউ আছড়ে পড়ে প্রার্থনার। আমার চোখ শুধু শবাধরের উপর। অন্ধকারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই পথশ্রম থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

চাঁদের আলো হঠাৎ উছলে পড়ল আরো উজ্জ্বল প্রভায়। গাছপালা শন্‌শনিয়ে উঠল বুকের চাপা নিঃশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে। ফিকে অন্ধকার স্বপ্নের আবরণের মত দুলে উঠল ঘুম ভাঙ্গার পূর্বে। পাখীর পাখনায় চিড় খায় সড়কের গুহা-নির্জনতা। আমি হাঁটছি। লক্ষ্যবস্তুর উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আমার আর মাত্র এক ধাপ দূরে ওরা হাঁটছে। না,

হাঁটছে না। চারজনে থ দাঁড়িয়ে গেছে। এই অভাবনীয় ব্যাপারে আমিও থমকে যাই, দাঁড়িয়ে পড়ি। চোখ কচ্‌লে তাকাই ওরা আর নড়ছে না। একদম অনড় দাঁড়িয়ে গেছে। বিশ্রাম নিচ্ছে, তাও নয়।

তারপর আমার চোখ বিস্ময়ে হাবুডুবু খায়। প্রথমে আমি ত ভয় পেয়ে যাই। কোন ভুতুড়ে কান্ড ঘটছে না ত?

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম চাদর ঢাকা শব খাটের উপর বসল না শুধু এক কিনারা ধরে লাফ মেরে নীচে নেমে আমার দিকে এগোতে এগোতে হেঁকে উঠল, "স্লামালেকুম! স্লামালেকুম!"

আমি ভুতের সঙ্গে কথা বলব? আমার ভয় কাটে না। তবু প্রেতেরও মন রক্ষা করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোনরকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, 'আলায়কুম আস্‌সালাম।'

সদ্য-জীবিত লাশ দ্রুত আমার করমর্দন করতে করতে বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভূত নই। ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম মাত্র। আমি জ্যান্ত। আসলে ওগুলো মড়া, দাঁও-মত আমাকে বয়ে আনছিল। আসুন, দেখুন—।'

সে আমাকে আঙুল বাড়িয়ে এক একটার কাছে নিয়ে গেল। আশ্চর্য, চারজনই মড়া। মাথার মগজ মাংস বহুদিন উধাও। স্যাঁতলা দাগ পড়ে গেছে। খুলীর মধ্যে দাঁতগুলো বিকট।

বিপদোত্তর শঙ্কায় চোখ বন্ধ করে নিলাম।

## অন্ধকার আছে

### শেখ আতাউর রহমান

এই শহরের নিচে একটা বিরাট ক্ষত আছে। তাছাড়া এ শহরের মাটি যন্ত্রণায় এমন কেঁপে উঠবে কেন? শহর কি লাভাস্রোত? সারি সারি পোড়া মানুষগুলো ফুটপাথ দিয়ে ভেসে চলে কোথায়? এবং আকাশের রং এমন ভয়ঙ্করভাবে আমার চোখের সামনে ধূসর হয়ে যাচ্ছে কেন? অবক্ষয়ের পাতালে ডুবে যাচ্ছে কি শহর? মহাকাল কি রক্তচোষা বাদুড়ের মতো উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে অসীমের অন্ধকারে? এবং এই অন্ধকার গলিই কি এই বিভীষিকার বাদুড়ের প্রথম শিকার?

আমি এসেছি অরু। গলির সাত নম্বর দরোজায় আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো সন্ধ্যার অন্ধকারে। যেহেতু আমি আসন্ন সংবর্তের সংবাদ পেয়েছি।

কিন্তু আমি কোনো সাড়া পেলাম না। শুধু বন্ধ দরজার ওপার থেকে রুগ্ন শিশুর ক্রন্দনের মতো ভেসে এলো হারমোনিয়ামের একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ। তখন বন্ধ দরোজায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘড়ির দোকানের আলো। আমি কাঁচা কাঠের ভ্যাপসা গন্ধ পেলাম।

কিন্তু আমাকে রুগ্ন শিশুর এই বিরক্তিকর কান্না স্তব্ধ করে দিতে হবে। যেহেতু তা অসহ্য, কাঁচা কাঠের গলিত ঘ্রাণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে, যেহেতু সেটিও অসহ্য, এবং দরোজা উন্মুক্ত করতে হবে। তাই আমার প্রতীক্ষার হাতটা আরেকবার অসহিষ্ণুর মতো জোরে জোরে নাড়া দিয়ে উঠল, কড়াটাকে, এবং জানিয়ে দিতে চাইলাম, আমি এসেছি, আমার যন্ত্রণার শরীরটা এই দরোজার সামনে এসে হাজির হয়েছে। তখন অকস্মাৎ থেমে গেল রুগ্ন শিশুর কান্না এবং আমি শুনতে পেলাম, কে?

আমি। দরজা খোল। আমার কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ শোনালো।

কে, মাস্টার সাহেব?

হ্যাঁ।

এরপর এ বাড়ীর কনিষ্ঠা মেয়ে, যা আমি কণ্ঠস্বরেই সনাক্ত করতে পেরেছি, মেঝেতে লাফিয়ে পড়লো। বন্ধ দরজার ওপার থেকে আমি তার শব্দ পেলাম। তারপর ছেঁড়া শ্লিপার একটা করুণ পরিচিত আওয়াজে বাতাস সচকিত করে দিয়ে দরোজার দিকে অগ্রসর হলো। এবং আমি কপাটের ছিদ্রে আলো দেখলাম। অকস্মাৎ ছিটকিনি খুলে গেল। উন্মুক্ত কপাট। এবং এক ঝলক তীর্যক রশ্মি।

প্রথমে অরু লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুললো এবং আলোতে আমাকে সনাক্ত করলো। তারপর দু ঠোঁটে একটা বিশেষণহীন হাসি তৈরী করে বলে উঠলো, আসুন মাস্টার সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, না? আমি একটুও টের পাইনি। আসলে হারমোনিয়াম বাজাতে থাকলে আশেপাশের কিছুই শোনা যায় না।

এবার অরুর হাসিটার একটা বিশেষণ দিতে পারলাম। অরু অপরাধীর হাসি হাসছে। এবং এ বাড়ীর এ মুখটিই শুধু ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এই চঞ্চল মুখটা ছাড়া এ বাড়ীর আর সবার মুখ কোনো দিন হাসে না। হাসতে জানে না। হাসতে ভুলে গেছে। আর এই গলির এই আদিম অন্ধকারের সঙ্গে বরাবর শত্রুতা করে এসেছে, এই উজ্জ্বল বিদ্রোহী মুখ। যেন এই মুখ ধূসর মহাকালের সব জাল-জুয়োচুরি ধরে ফেলেছে। আর ধরে ফেলার উল্লাসে অনাবিল হাসতে পারছে এই বিশাল অন্ধকারের রাজ্যে।

ওভাবে তাকিয়ে দেখছেন কি? অরু আমার চোখে চোখ রাখলো, চলে আসুন ভেতরে। আজ অমাবস্যা। দেখছেন না গলিটা কি অন্ধকার?

এরপর আমি চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম। আর এখন দরোজা বন্ধ করতে করতে আবার হেসে উঠলো এ বাড়ীর ছোট মেয়ে, এ বাড়ীতে থাকতে আমার যা ভয় করে মাস্টার সাহেব? বাড়ী তো না যেন পাতালপুরী। অরু পেছন ফিরলো, এবং আমাকে কেন্দ্র করলো, কন্ট্রাকটারের সাদা বিল্ডিংটা যদি আমাদের হতো, তাহলে আজকের সারা রাত আমি ঘরে একটা একশো পাওয়ার বালব জ্বালিয়ে রাখতাম।

কিন্তু কন্ট্রাকটারের সাদা বিল্ডিংটা যে অরুদের কোনো দিন হবে না, সেটা শুধু অরু নয়, আমি নয়, আমাদের ছায়া দুটোও জানতে পেরেছিল। তাই তারা দেয়ালের পাংশু প্রচ্ছদপটে কৌতুকে নৃত্য করছিল এবং যখন আমরা এগুচ্ছিলাম, তারাও আমাদের সঙ্গ নিয়ে নাচতে নাচতে এগুচ্ছিল।

কোনো কোনো দিন রাত্রিতে আমার ঘুমই ভেঙে যায়। যা ভয় করে তখন। এবার অরু গম্ভীর হলো, বাতি তো শোবার সময়েই নিভিয়ে শুতে হয়। ভয়ে পাথর হয়ে মুখ বুজে থাকি তখন। এত করে বলি, আমার ঘরে বাতি জ্বলুক একটা। তা কাউকে রাজী করাতে পারলাম না। বলুন তো মাস্টার সাহেব, একটি লণ্ঠনের জন্য কতটুকুই বা তেলের প্রয়োজন?

আমি কোনো উত্তর করলাম না। আমি ছায়াদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

বুঝলেন মাস্টার সাহেব, এখন এ শহরে একটা ধ্বংসের প্রয়োজন। একটা ভূমিকম্পের।

এবার আমার চোখ সরে এলো দেয়াল থেকে এবং অরুর চোখে তা নিবন্ধ হলো, কেন?

এ গলিটা তাহলে সবার আগে ধ্বংস হতে পারতো। একেবারে মিশে যেতে পারতো মাটির সঙ্গে। অরুর মুখটা ধীরে ধীরে একটা ভোজবাজির মতো আমার চোখের সামনে হলুদ হয়ে যাচ্ছে, ব্যস তাহলে এ বাড়ীব আনাচে কানাচে সারাক্ষণ অন্ধকার দেখে অমাকে ভয় পেতে হত না, এবং মরেই সব জ্বালার অবসান হতো।

এ শহরের নিচে নিশ্চয়ই কোথাও একটা ক্ষত আছে। এবং সেই ক্ষত এই গলিটার নিচেই বাসা বেঁধেছে। আর সে ক্ষতেও পচন ধরেছে। ক্ষত বাড়ছে, যন্ত্রণা বাড়ছে। কিন্তু আমি এই ক্ষতের কথা, যন্ত্রণার কথা, সব কিছুই ভুলতে চাইলাম। তাই আমার কণ্ঠস্বর প্রবল প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় প্রসঙ্গকে টেনে আনতে চাইলো, গানটা কতদূর আয়ত্তে এসেছে?

সবটাই।

বেশ।

অরু দ্বিতীয় দরোজায় চৌকাঠ পেরিয়ে এলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। এবং মৃতের মতো শীতল মেঝে অতিক্রম করে রুগ্ন চৌকির উপর

এসে বসলাম। তখন আমার চোখের সামনে এ-ঘরের কাঁসার বাসনগুলো নকল সোনার মতো হলুদ হয়ে উঠল লণ্ঠনের দুর্বল আলোয়। এইবার এই চতুর্ভুজ ঘরটা হারমোনিয়াম, অরু, আমি, রুগ্ন চৌকী, লণ্ঠন, লণ্ঠনের আলো, কাঁসার বাসন এবং বন্ধ বাতাস—সমস্ত কিছুর উপাদানে চমৎকার। একটা নিঃশব্দ নরক তৈরী করল। এবং এই ভয়াবহ নৈঃশব্দে মুহূর্তে আমরা সবাই চমকে গেলাম।

কিন্তু এতসব প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও অরু হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চৌকির উপরে বসতে পারলো এবং এমন অপরূপ ভঙ্গিমায়, শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢাকলো যে, মুহূর্তের জন্য আমার ইচ্ছাকে ভয়ংকর কামুক মনে হলো। তাই এই লজ্জাকর মানসিকতায় ভারসাম্য আনবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, লণ্ঠনটা হারমোনিয়ামের ওপর রাখো।

আচ্ছা। অরু আদেশ পালন করলো। এবং ঝুঁকে পড়ে লণ্ঠনের ফিতে আরেকটু বাড়িয়ে দিল।

আমি এবার অরুর চোখে চোখ রেখে, গাও—এই আদেশ করে পর মুহূর্তেই চোখ বুজে ফেললাম। এবং এভাবে আমার মানসিকতায় ধীরে ধীরে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করলো।

বেজে উঠলো হারমোনিয়াম।

চমকে উঠল নৈঃশব্দ।

দেয়ালে প্রেতাত্মারা কাঁপছে।

এরপর অরুর দরদের কণ্ঠটা আরেকবার চমকে দিল নৈঃশব্দকে। করুণ হয়ে উঠলো সুর। বিলাপ করতে শুরু করলো সমস্ত বাতাস ঃ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব—ঘোর কুটিল পথে তারও লোভ জটিল বন্ধ—।

এ গলির আদিম বন্দীরা তমসার পাতাল থেকে সার বেঁধে আলোর কোরাস গাইছে। অরুর কণ্ঠে আমি তাদের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। এ গলির শতাব্দীর অভিশপ্ত অশ্রুর স্রোত সর্বহারার বন্দীশালার ভিতে নোনা ধরিয়ে দিয়েছে। তমসার পাইথন ছুটে আসছে। আমার চোখে প্রভু বুদ্ধের ছবিটা ভাঙছে, গড়ছে। কিন্তু কোনো নবজন্ম হচ্ছে না। আর সেই যন্ত্রণায় আকাশ-ছোঁয়া এক-একটা তমসার স্তব্ধ বোমার মতো ফেটে পড়েছে এ ঘরের বিমর্ষ প্রাণহীন সাম্রাজ্য। সংবর্ত কি আসন্ন?

'ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপ দহন ক্লিষ্ট।'

থেমে গেছে বন্দীর বন্দনা। রাত্রির বুকে আর কোনো স্পন্দন নেই। শুধু বুকের মধ্যে অস্বস্তির কীটগুলো নিয়ে নিশ্চল বসে থাকা। কিন্তু এই

নিশ্চলতা ধীরে ধীরে চারদিকে বিস্তার করলে আমি আর বাঁচবো না। তাই এই স্তব্ধতাকে ভাঙতে আমি বলে উঠলাম, গাইবে আরেকটা?

আজ থাক মাস্টার সাহেব।

আচ্ছা। আমি দেয়ালে চোখ রাখলাম। কিন্তু তখন অরু আবার কথা বললো, যার জন্য আমার চোখ ফিরে এসে অরুর চোখে নিবন্ধ হলো।

আপনাকে একটা ধাঁধা শুনিয়ে দিতে পারি এখন। কি দেবেন বলুন? অরু সর্বনাশের হাসি হাসতে শুরু করলো। আর তখন চমকে মাথা তুললো বড় মেয়ে এবং বুঝতে চেষ্টা করলো ছোট বোনের হাসি। কিন্তু তার আগেই, জানেন, আজ দুদিন আমরা প্রায় উপোস, কিন্তু এই বলে অরু দু-হাতে মুখ ঢেকে যাত্রার নটির মতো প্রবলভাবে হেসে উঠলো।

অট্টহাস্য করে উঠলো একটা পেঁচা উঠোনের আকাশে। আঁতকে উঠলো বড় মেয়ের চোখ আমার বিস্মিত চেখের ওপর। তারপর সে চোখ মৃতের মতো ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে একেবারে নিথর হয়ে গেল। তখন এ ঘরের সমস্ত অস্বস্তির কীটগুলো পরম উল্লাসে চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। এই সময়, কোথায়, গেলিরে পোড়ারমুখীরা, বার্লিটা দিবি, না আজই শেষ হব—এই বলে উঠোনের ওপাশের অন্ধকার কুটুরী থেকে চিলের মতো ভৌতিক কেঁদে উঠলো একটা অদৃশ্য পেত্নী।

আসছি মা, দাঁড়াও। বড় মেয়ে আর কোনোদিকে তাকালো না। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর উড়ন্ত আঁচলটাকে ইলেকট্রিক শকখাওয়া একটা বাদুড়ের যন্ত্রণার ডানা বলে আমি ভাবতে পারলাম।

শীতুটা চিরদিনই অমন। অরু বিরক্তির হাই তুললো, সারাদিন মুখ গোমড়া করে থাকবে। কি রাশভারি স্বভাব রে বাবা।

চলি আজকে। এবার আমি মেঝের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। কারণ, বিষাক্ত গ্যাসে ভরে গেছে সমস্ত ঘরটা। এবং এর সূক্ষ্মতম স্পর্শেই অসম্ভব জ্বালা। এবং আমার চোখ, কণ্ঠনালী ও সমস্ত শরীর এ ভয়ঙ্কর গ্যাসে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছিল।

এখনই যাবেন? অরু অবাক হলো, নতুন আরেকটা দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন সেদিন।

আজ থাক। আমি পেছন ফিরে দরোজাকে উদ্দেশ্য করলাম। অরু আমাকে অনুসরণ করলো।

থাক, তোমাকে আসতে হবে না। আমি আমার কণ্ঠস্বর, এবং শরীর দিয়ে অরুর সামনে একটা প্রাচীর তৈরী করে দিলাম। সে প্রাচীরে অরু বাধা পেলো। আমি সরে এলাম।

দেয়াল—অন্ধকারের দেয়াল উঠছে সারা গলি জুড়ে। আলকাতরার মতো

অন্ধকার। আকাশ নেই, মেঘ নেই, জ্যোৎস্না নেই, বাতাস নেই,—কোনো দৃশ্য নেই। আমার সামনে পেছনে, ডানে বামে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

এই যে মিস্টার, চললেন দেখছি। ওঁত পেতেছিল অন্ধকার। এবার দুর্লভ সুযোগে নিজেকে অকটোপাসের মতো বিস্তার করল। জীর্ণ থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এ বাড়ীর বড় ছেলের নাদুস-নুদুস শরীর। এবং আমার সামনে, আমি যেমন করে অরুর সামনে করেছিলাম, তেমন এক সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরী করলো। আর তাতে আমি বাঁধা পেয়ে, ভয় পেয়ে বললাম, হুঁ।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ঘটনাটা শুনে গেলেন না। আমার আতঙ্কগ্রস্ত কানের কাছে অশ্লীলভাবে হেসে উঠল চর্বির শরীর।

কি? আমি প্রাচীর ভেদ করতে চাইলাম। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। যেহেতু অন্ধকার আমাকে অনুসরণ করল।

একটু দাঁড়ান। অতিবিচক্ষণতার সঙ্গে আমার পেছনে ছুটে এলো অন্ধকার। ওভাবে টর্পেডোর মতো ছুটলেন কোথায়? দাঁড়ান বলছি।

অতএব আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। আর তখন আমার মুমূর্ষু কানের কাছে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কণ্ঠস্বর প্রবল হল্লা করে উঠলো, আজ কন্ট্রাকটারের বাসায় একটা জিনিস চুরি গেছে।

কি?

একটা নতুন স্নোর-কৌটো। কণ্ঠস্বর দাঁত বের করে হাসলো, খুব হৈ চৈ হল তা নিয়ে।

তাতে কি হয়েছে?

কে চুরি করেছে ওটা আমি জানি। তার টেবিলে ওটা আমি দেখেছি।

কে করেছে?

অরু। নিকৃষ্ট কণ্ঠে অশ্লীল হাসিটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করলো। হাসির তালে-তালে স্যানাটোরিয়ামে জমানো চাক-চাক চর্বির দলা, যে-চর্বি দিনকে দিন ভয়ঙ্করভাবে গলে যাচ্ছে। অশ্লীল নাচতে শুরু করলো, এবং আমি এই হাসি, এই চর্বির নৃত্যে ভয়ঙ্কর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারাত্মকভাবে বিক্ষত হলাম। যেন আমার মাথা লক্ষ্য করে কেউ একটা ভীষণ আঘাত করেছে এবং আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মূর্তিমান যন্ত্রণার মতো আমি দ্রুত চলতে শুরু করলাম।

আরে এখনই যাবেন কি? আমার দুঃখের কথাটা শুনবেন না? ছুটে এসে আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলো এ বাড়ীর বড় ছেলে। এবং তখন, কি বলবেন বলুন—এই বলে আমি এক ঝটকায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

জানেন, আজ স্নান করে গায়ের কাপড়টা গায়েই শুকিয়েছি। এবার আমাকে চমকে দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে করুণ হয়ে উঠলো সে, এই অসুখ

শরীরেই। অর্র একটা শাড়ি চাইলাম কিছুক্ষণের জন্য। শাড়িটা পরে আমার কাপড়টা শুকিয়ে নেব শুধু। একটিই কাপড় কিনা। তা কিছুতেই দিল না। চর্বির শরীর এবার হাঁফাতে শুরু করলো। মাঝখান থেকে আগুনের মতো অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। অথচ ওরা আমার কত ছোট। ওদের আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। বলে কি জানেন, কাপুরুষটা অসহিষ্ণুর মতো আবার আমার একটা হাত চেপে ধরলো, আমি নাকি কুঁড়ের বাদশা, কাপুরুষ, বাপের ওপর বসে-বসে দুবেলা গিলছি। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস নিঃশেষিত হয়েছিল। তাই সে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিল, এবং তারপর, দুবেলা গিলছি! কি ডাহা মিথ্যে কথা।—এই বলে কলিক পেনের রুগীর মতো ছটফট করে উঠলো চর্বির শরীর অন্ধকার তোলপাড় করে। আর তাতে করে একটা পাশবিক শব্দ উঠলো তার নাসারন্ধ্রে।

তখন আমার মাথার উপর সেই পরিচিত পেঁচাটা আবার আর্ত চিৎকার করে উঠলো।

বলুন তো, ওদের আমি কেমন করে বোঝাবো? নিকৃষ্টতম নয়, এবারে করুণতম কণ্ঠস্বর, কিছু করতে গেলেই যে আমার বড্ড ভয় করে। মনে হয়, এই বুঝি অসুখটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবার হলে কি আর বাঁচবো মশাই? জানেন তো ডাক্তারের হুকুম, কমপ্লিট রেস্ট। যেন এবার সে কেঁদেই ফেলবে, দেখুন তো বিধাতার কি বিচার, ভিখারীর শরীরে রাজরোগ।

গলির অন্ধকারটা গুমোট বাতাসের সঙ্গে পাইথনের মতো হেলে-দুলে অগ্রসর হচ্ছে। এ বাড়ীর প্রাচীন প্রাচীরগুলো গ্রাস করে সে উঠোনের কাঁঠাল গাছটার দিকে তেড়ে গেছে। আর তাতে করে ভীষণ ভয় পেয়েছে বাদুড়টা। আর্ত চীৎকারে পাখা ঝটপট করে সে নিথর হয়ে গেছে কাঁঠাল পাতার অন্ধকার।

চলি এবার। আমি তখন আলোর জন্য মুমূর্ষু হয়ে উঠেছি। কিন্তু চমকে উঠলো স্যানাটোরিয়াম। খপ করে চেপে ধরল আবার আমার একটা হাত, যাচ্ছেন? কিন্তু আমার যে একটা জিনিস চাইবার ছিল মিস্টার?

আমি জানি, বিরক্তিকর ভাবেই জানি এখন সে কি চাইবে। তবুও আমি বললাম, কি?

আট আনা পয়সা।

নেই।

তা হলে! আর্তনাদ করে উঠলো সে, পর-পর পাঁচ-দিন যে আমার মোটেই দুধ ছোঁওয়া হয় নি। এক চামচও না। অথচ ডাক্তারের হুকুম রোজ দু সের করে—

যাক, আর কথা বাড়াবেন না। আমি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম, এই নিন।

আমার একটা ক্লান্তির হাত একটা অস্বস্তির সিঁড়িকে আরেকটা ব্যাকুল হাতের ওপর ছেড়ে দিল। এবং দিয়ে ক্ষোভে ও গ্লানিতে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকলো কাঁধের সঙ্গে।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মিস্টার! হাতের মুঠোয় শিকার পেয়ে হায়েনার মতো হেসে উঠলো, এতেই আজ চলে যাবে আমার। অন্তত এক পোয়া তো হবে। জানেন, গতকাল কন্ট্রাকটারের বিড়ালটাকে জিভ দিয়ে গোঁফের দুধ চেটে খেতে দেখে আমার যা কান্না পেয়েছিল।

আমার শরীর আর পারলো না নিজেকে স্থির রাখতে। তাই সে একটা মূর্তিমান আর্তনাদের মতো সরে এলো অন্ধকার প্রাচীর ভেদ করে। এবং তখন আমি নরকের উত্তাপ পেলাম। এবং বুঝতে পারলাম আজ একটুও বৃষ্টি হবে না। চাঁদ তো উঠবে না আকাশে, কিন্তু বাতাস? না আজ বাতাসও বইবে না। সেহেতু এখানে যদি নরকের যন্ত্রণা থাকে তবে এটা নরক; আর নরকে চাঁদের আলো, বৃষ্টির স্নিগ্ধতা ও বাতাসের ঝিরঝির কোনোদিন থাকে না।

করিডোর ছিল, করিডোরের রেলিং ছিল, এর পর তিন ধাপের সিঁড়ি ছিল, সিঁড়ির নিচেই মৃতের মতো ঠাণ্ডা মাটিও ছিল। এবং আমি ঠাণ্ডা মাটিতে পা রাখতেই সন্দেহের সুর কেঁপে উঠলো খিড়কি দরোজায়।

কে?

আমি।

মাস্টার?

হ্যাঁ।

আরে শোন-শোন। ভালুকের মতো বিশাল পা ফেলে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এ বাড়ীর কর্তা। তাতে করে আমার সত্তার সামনে আবার একটা প্রাচীর তৈরী হলো। কাউকে বলিনি ব্যাপারটা। তোমাকে বলবার জন্য সেই সকাল থেকে উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। আমার কানের কাছে সংলাপগুলো মোটরের হর্ণের মতো বেজে উঠলো। আমি তার বুকের মধ্যে প্রাচীন কফের আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

বলুন।

বলবো কি হে? বলার কি আর মুখ রেখেছে? তার কণ্ঠস্বরে এবার দুঃখকে শোনা গেল, রোজকার মতো আজ ভোরেও দোকানের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিলাম। তা যেই কিনা দরজার কাছে এসেছি, আর অমনি—

কি?

আর অমনি আমার মাথার উপর, মানে আমার টাকের উপর টক করে ইঁটের মতো কি যেন কি এসে পড়লো। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায় আর কি। বৃদ্ধের দু হাত আমার যন্ত্রণাকে স্পর্শ করলো, মাথাটা এখনো সুপুরির মতো ফুলে রয়েছে।

পাড়ার কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ।

আরে রাখো তোমার দুষ্টু ছেলে। প্রাচীন কফ হুঙ্কার ছাড়লো, দুষ্টু ছেলে না হাতি একেবারে ধাড়ি ছোকড়া। যাকে তোমরা বলো তরুণ নাগরিক, দেশের ভবিষ্যৎ। উত্তেজনায় তিনি যেন উন্মাদ হয়ে যাবেন, ভবিষ্যৎ? দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি একথা উচ্চারণ করলেন। হাত দুটো মুঠো হয়ে এল শূন্যে। যেন কাউকে খুন করে ফেলবেন।

কেন কি ব্যাপার? অনির্দিষ্ট আতঙ্কে আমার কণ্ঠস্বর বাতাসে হিস-হিস করলো একটা অশরীরী আত্মার মতো।

আবার ব্যাপার? অন্ধকার স্তব্ধ হয়েছে। মাথাটা নাড়তে-নাড়তে যেই কিনা নিচে তাকিয়েছি, দেখি ইঁটের টুকরোয় জড়ানো একটি কাগজ। তুলে খুলতেই—

কি?

বিলেড়ু, খাসা বিলেড়ু। একটা পশুর মতো মুখ বিকৃত হয়ে এলো, একেবারে নির্ভেজাল প্রেমপত্র।

কন্ট্রাকটারের তেতলার কার্নিস বেয়ে তরল অন্ধকার গড়িয়ে পড়ছিল এতক্ষণ। এবার হঠাৎ জমাট বেঁধে গেছে। আর তাই ভয় পেয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠেছে একটা চামচিকে উঠোনের আকাশে।

ছোটটাকেই লিখেছে। বৃদ্ধের দু ঠোঁটে ব্যঙ্গ, আর তার কি ভাষা। দুঃখ, ক্ষোভ আর ঘৃণায় বৃদ্ধ যেন কেঁদেই ফেলবেন, সত্যি মাস্টার, অবাক করলে তোমরা। প্রেমের বেলায় শেয়ালের মতো ঠ্যাং-ঠ্যাং করে ছুটবে, অথচ বিয়ের কথা তুললেই পিঠটান। দুর্বল পদযুগলের একটি ভয়ঙ্কর আঘাত করলো স্যাঁত-স্যাঁতে দুর্বল মাটিকে, যত্তো সব স্কাউনড্রেলের দল!

বাদুড়টা এবার পাইথনের আক্রমণে কাঁঠাল পাতার অরণ্যে ছটফট করে উঠলো। পাতার বিশ্রী আওয়াজটা অন্ধকারকে চমকে দিয়ে আবার নিথর হয়ে গেলো। আমি চারদিকে অবসাদ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম, সে নিপুণ যাদুকরের মতো ধীরে-ধীরে আমাদের চারদিকে গভীর ও জমাট বেঁধে উঠছে। কিন্তু অকস্মাৎ আমাদের দুজনের মধ্য দিয়ে একটি ভয়ঙ্কর ছুঁচো আর্তস্বরে ডেকে পালিয়ে যেতেই, বুঝলে, কত দিন থেকে একটা কথা ভাবছি, এই বলে বৃদ্ধ স্তব্ধতা ভাঙলেন এবং স্বগতোক্তির মতো আবার বলে উঠলেন, কাশেম মৌলভীর মেয়েটা সিনেমায় নামার পর থেকে কথাটা আমার মনে হয়েছে।

তিনি থামলেন। কাশলেন খুকখুক করে। গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর হিস-হিস করলেন আমার কানের কাছে, আমার মেয়ে দুটোর রূপ-যৌবন তো নেহাৎ মন্দ নয় মাস্টার। বরং একটু প্রাচুর্য আছে বলেই তো মনে হয়। তাছাড়া গান-বাজনাও তো নেহাৎ মন্দ জানে না ওরা। তা তুমি কি বলো?

ভুতুরে গাছটা থেকে ধপ করে আছড়ে পড়লো সেই বাদুড়টা। আমি চমকে উঠলাম। এবং কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারলাম না—এই বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলাম। কিন্তু তবু জিভ আর্দ্র হলো না।

বলছিলাম কি, আমার মেয়ে দুটোকেও সিনেমায় নামিয়ে দেবো। শত্রু-পক্ষের গুপ্তচর বারুদঘরে আগুন লাগাবার পূর্ব মুহূর্তে আমার মুমূর্ষু কানের কাছে ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো, একটা ছোকড়া ডাইরেকটার এসেছিল আমার কাছে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। বারুদ ভাণ্ডারে আমার অতো নাক উঁচু স্বভাব নেই মাস্টার। প্রগতির যুগ এটা। তাছাড়া এটাও তো একটা আর্ট, মানে ফাইন আর্ট, হেঁহেঁ। এতে দোষের তো কিছু দেখি না আমি। প্রবল প্রচেষ্টায় গুপ্তচর হাসতে চাইছেন। কিন্তু শক্তি পাচ্ছেন না। হাসিটা তার বার-বার তাল কেটে ধসে পড়ছে, কি হে, তুমি চুপ করে আছো কেন? আমার দুর্বল কাঁধে নাড়া দিলেন, কিছু বল? দেশে যখন একটা মহৎ শিল্প গড়ে উঠতে চাইছে, তখন আমরা যদি সহযোগিতা না করি, হেঁ—হেঁ—হেঁ।

আগুন এবার বারুদ স্পর্শ করলো, আর তাতে করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, প্রচণ্ড উত্তাপ এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা। তাই আমার শরীর যন্ত্রণাকাতর পদযুগলকে কার্যকর করে এই গলি থেকে এই বাড়ী থেকে, এই অন্ধকার থেকে পালাতে চাইলো। কিন্তু গুপ্তচর আমার পেছনে হায়েনার মতো ছুটে এলেন, এ কি, ওভাবে চললে কোথায়, শোন-শোন। হায়েনা আমার পেছনে তাড়া করেছেন, দাঁড়াও কথা আছে।

বলুন। আমি প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় নিঃশ্বাস ধরে রেখেছি, একটা এনগেজমেন্ট আছে আমার।

তাই তো। গুপ্তচর লজ্জা পেলেন, তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু একটা কথা যে না বলে পারছি না মাস্টার।

কি?

সাতটা টাকার জন্য আজ আবার তোমার কাছে আমায় হাত পাততে হচ্ছে। কুঁজো হয়ে আমার দুটো হাতই চেপে ধরলেন গুপ্তচর, যেন আরেকটু হলে তিনি আমার পা-ই জড়িয়ে ধরবেন।

ছাড়ুন। আমি ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করলাম, এভাবে হাত ধরবেন না।

প্লিজ, একটু দয়া করো। কথা দিচ্ছি, হাতে টাকা এলে সবার আগে আমি তোমার টাকাগুলো শোধ করবো। এবার তিনি কাঁদতে পারলেন, বিশ্বাস করো, আজ পনর দিন দোকানে কোনো কাজ পাই নি। অথচ এদিকে দু হপ্তার রেশন আনা হচ্ছে না। দুদিন ধরে বাড়ীতে তো সবাই উপোস। বল তো মাষ্টার, আমার এ দশা হবে কে জানতো? কে জানতো ওখান থেকে এভাবে বাজারটা সরে যাবে। অথচ নতুন জায়গায় দোকান দেবার আমার সাধ্যও নেই। নজরানাই লাগবে দশ হাজার টাকা।

আমার এই হাত, এই মুখ, এই নাক—সমস্ত শরীর আলোর আকাঙখায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তাই টর্পেডোর মতো হাতটা ছুটে গেছে পকেটের ভেতর, মুখ ঝড়ের মতো বলে উঠেছে, এই নিন, এই আছে, আর পা টলতে টলতে ছুটতে শুরু করেছে মৃতের মতো ঠাণ্ডা মাটির ওপর দিয়ে। তখন হাতের মুঠোয় শিকার পেয়ে উল্লাসে হেসে উঠলেন গরিলা। আমার পিঠের পেছনে সে উল্লাস-ধ্বনি বাতাস সচকিত করলো, যাও শিগগির যাও। কোথায় যেন এনগেজমেণ্ট আছে বললে। আজকালকার ছেলেরা যা কুঁড়ে—

আমি ছুটছিলাম ভয়ঙ্করভাবে, ছুটছিলাম আলোর প্রত্যাশায়। কিন্তু আমি কোথাও আলো দেখতে পেলাম না। শুধু নষ্ট সিনেমার রিলের মতো শাঁ—শাঁ করে সরে যাচ্ছিল পুরনো প্রাচীর। সাদা চুনের ছিটে-ফোঁটাতে মনে হচ্ছে ভূতের চোখ, এবং কৌতুকে নাচতে নাচতে তারা পেছনে সরে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, আজ তাদের নারকীয় উৎসব।

উঠোন শেষ, তিন ধাপের সিঁড়ি—বারান্দা—চৌকাঠ—মেঝে, জমাট অন্ধকার। এরপর মেঝেটা পেরিয়ে গেলেই দরোজা, আর দরোজা খুললেই মুক্তি—

যাচ্ছো?

আমি চমকে উঠলাম। আমার আর দরোজা খোলা হল না। আবার আমার সমনে প্রাচীর তৈরী হলো। এবং আমি পেছন ফিরে অন্ধকারে এ-বাড়ীর বড় মেয়েকে দেখতে পেলাম।

হুঁ। অন্ধকারের বুকে আর কোনো স্পন্দন নেই।

আচ্ছা। রাত্রির তমসার তরঙ্গেরা নিথর।

বিদায় নেয়া হল। এবার আমি চলে যেতে পারবো বাইরের পৃথিবীতে। অন্ধকার হাতড়ে দরোজাটা খুলতে পারলেই ঘরের ভেতর আছড়ে পড়বে ল্যাম্প পোস্টের ধূসর আলো। আর তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবো সেই চিরাচরিত স্যাঁতস্যাঁতে গলি, যা কিছুক্ষণ আগে আমার আগমনের পথ ছিল। এবার সেটা আমাকে ফিরিয়ে নেবে। এবং আমি এবার ছুটে গিয়ে দরোজাটা খুলে ফেলবো।

বড়দা তোমার কাছে আবার নালিশ করেছে, না?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। যেহেতু কেনো উত্তর নেই।

ভেনটিলেটারে ঢুকে পড়েছে চামচিকে। শনির চক্রের মতো ঘুরছে মাথার ওপর। এবং তার পাখার বিরক্তিকর আওয়াজটা আমাকে ধ্বংসের মতো অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

*বাবা আজ তো আবার তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। চামচিকেটা কড়িকাঠে ঝুলে গেছে। ঘরটা এবার মৃত্যুর মতো স্তব্ধ।*

*এ টাকা এরা কোনোদিন শুধতে পারবে বলে মনে করেছ তুমি?* যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে এ বাড়ীর বড় মেয়ের করুণ কণ্ঠস্বর। এবং যন্ত্রণা সংক্রামক। তাই আমিও এ যন্ত্রণায় শোচনীয়ভাবে সংক্রামিত হয়ে গেলাম। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে এ-বাড়ীর বড় মেয়ের করুণ কণ্ঠস্বর।

আমার চারপাশের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারলাম, এ-ঘরের মাটির নিচে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে। বাতাসের হাজার অনুকোয়ান্টাসের মতোই ছিটকে পড়ে আমার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

বাবা আর যেন কি বললো? এবার সে আর্তনাদ করলো, আমাদের সিনেমায় নামতে হবে?

কথা শেষ হলো না। হঠাৎ আমি ক্ষ্যাপার মতে ছুটতে শুরু করেছি। আমার উপমা আমি আবিষ্কার করলাম এভাবে, হীন কাপুরুষ রাজা শহর-প্রাচীরের ওপারে অত্যাচারী রাজার কামানের আওয়াজ শুনে আতঙ্কে প্রাচীন প্রাসাদ ছেড়ে পালাচ্ছে। আমি এবার দরজার কছে এসে দাঁড়ালাম। এবং প্রথম প্রচেষ্টায় খুলে ফেললাম কপাট।

দাঁড়াও।

কেন? অন্ধকারে ওকে খুঁজলাম। কিন্তু শরীর নয়, শুধু তার চিবুকটিকেই দেখতে পেলাম। অন্ধকারের বুক চিরে একটা ধূসর আলোর রশ্মি বর্শার মতো আছড়ে এসে পড়েছে এ বাড়ীর বড় মেয়ের চিবুকের ওপর। বুকের কাছে পাল্‌সের দ্রুত স্পন্দন এবং পাল্‌সের এই তান্ডবনৃত্য দেখে আমি ওকে আর কেউ নেই বলে ভাবতে পারলাম।

তুমি না বললে কি হবে, আমি সব শুনেছি। আলোর বুকে কেঁপে উঠলো কণ্ঠস্বর। পৃথিবীর সমস্ত গতি এখন থেমে গেছে।

শোন।

বল।

এ-বাড়ীর সবাই তো তোমার কাছে অনেক ভিক্ষা নিয়েছে। আজ আমিও তোমর কাছে একটা ভিক্ষা চাই।

আবার—আবার সেই ভিক্ষা! বিদ্রোহে আমার দুটো হাত মুঠো হয়ে এলো শূন্যে। এ-বাড়ীর প্রত্যেকটি অন্ধকার কি বাদুড়ের মতো আমার সমস্ত

রক্ত শুষে নেবে? আসলে এরা সবাই নরখাদক। আমাকে ফাঁদে ফেলে এ'রা আদিম জন্তুর মতো উল্লাস শুরু করে দিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমার চারদিকে শত্রুরা কর্মরত। অতএব আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম।

তুমি, তুমিও দেখছি এ পথেই নেমেছো। এতক্ষণ ধরে মনে মনে যে ঘৃণার সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছিলাম, এবার তো এ বাড়ীর বড় মেয়ের অসহায় মুখের উপর একটা বজ্রের মতো ফেটে পড়লো, আমার কাছে আর কোনো টাকা পয়সা নেই।

কেঁপে উঠলো তার শরীর, যেন একটা ভয়ংকর চাবুককে সে হজম করলো।

তুমি আমাকে এত ছোট ভাবতে পারলে? তোমার কাছে আমি টাকা চাইবো? সে লম্বা করে একটা ঢোক গিলে বেদনাকে হজম করতে চাইলো, না ওসব কিছু নয়, একটি প্রার্থনা। শুধু একটি প্রার্থনা করবে তুমি আমার জন্য। এইটুকু ভিক্ষা চাইছি আমি তোমার কাছে।

চামচিকেটা আবার আর্তনাদ করে উঠলো এ সময়। এবং আমার মাথার ওপর অনির্দিষ্ট আতঙ্কে ঘুরতে লাগলো।

তা কিসের প্রার্থনা? আমার কণ্ঠস্বরে আমিই অবাক হয়ে গেলাম। কেন না, আমার কণ্ঠস্বরে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘৃণার জন্ম দিতে পেরেছিলাম, আমার কোনো ধনী বন্ধুর সঙ্গে তোমার বিয়ের ঘটকালি করি, এই তো?

না। তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে, সে প্রার্থনা নয়।

তবে কিসের? আমি একটা শয়তানের মতো অশ্লীল হাসলাম, রুপালি পর্দার নায়িকা হয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠো—এই প্রার্থনা তো?

না, তাও না।

তা হলে কি? আমি তখন নিকৃষ্টতম শয়তান হয়ে গেছি, আর ন্যাকামি করো না, যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। আমার অনেক কাজ আছে। অন্ধকারে আমার বুঝতে কোনো অসুবিধাই হলো না যে শীতু কাঁদছে। আমি এবার ভয়ংকর রাগান্বিত হয়ে উঠলাম।

এই ঘাট মানছি। একটা শয়তানের মতো ভঙ্গি করে আমি মাথা নোয়ালাম। তোমার জন্য একশোবার প্রার্থনা করবো আমি। একশো বার কেন, হাজার বার। সন্তুষ্ট? এবার দয়া করে প্রার্থনাটা নিবেদন করুন।

তখন শীতু আঁচলটা মুঠো করে চেপে ধরলো দুহাতে। এবং প্রার্থনা ব্যক্ত করবার জন্য অন্বিষ্ট শক্তিকে সঞ্চয় করলো।

প্রার্থনা করো, আমি যেন মরে যাই। প্রচন্ড যাতনায় সে মুখ ঢাকলো। প্রার্থনা করো, দ্বিতীয়বার এ বাড়ীতে এসে আমাকে যেন আর না দেখতে পাও।

এরপর সে দুহাতে মুখ ঢেকে অন্ধকারে ছুটে গেল। আর তাতে করে ভীষণ ভয় পেয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুরু করলো চামচিকেটা। এবং তার আর্ত

*চিৎকার আর থামলো না। ঘরটা তখন নরকের দিকে ছুটে চলেছে। আমি নরকের উত্তাপ এবং পাপাত্মার বিলাপধ্বনি শুনতে পেলাম।*

# দূরদৃষ্টি

**জ্যোতির্বিকাশ দত্ত**

মানুষ কখনো ত্রিকালদর্শী নয়। এমন কি, পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, জীবন পদ্মপত্রে নীরবৎ। অতএব মাত্র মুহূর্তেক পরে কি ঘটবে তা-ও বলতে পারো না। অথচ তারুণ্যের ধর্ম এ নয় যে সে বসে বসে ভবিষ্যতের হিসাব পেতে রাখবে তারপর সেই ছককাটা ঘরে পা ফেলে স্বর্গগামী হবে।

পাঠাভ্যাস, জীবিকা নির্ণয়, অন্নসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর বিবেচনা ব্যয় করা হলেও বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগ অস্থিরতা প্রভৃতিই প্রধান হয়ে থাকে। যতোই কোনো না উপদেশ বর্ষণ করা হোক, অনুশাসনের গণ্ডী আঁকা হোক তরুণ মন সে সব মানবে না।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এমনি ঘটলো না। আমি যেনো বা বদ্ধপরিকর ছিলাম যে, সুবিবেচনা, দূরদৃষ্টি, স্থির চিন্তা, আবেগ বর্জিত সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আমায় বজায় রাখতেই হবে। এবং সেই জন্যেই পঁচিশোর্ধ আমি—শিক্ষিত, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক, কিছুতেই হৃদয় দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিতে পারছি না। অথচ তীব্র আকাঙ্ক্ষার দহনে দগ্ধ হচ্ছি।

ঠিক স্মরণ নেই, কখন কিভাবে আমার মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কোনো বিশেষ রমণীর জন্যে বাসনা এত তীব্র হয় যে, রাজসিংহাসন অক্লেশে বর্জন করা যায়, আমি শুনেছিলাম। কেবল শোনাই মাত্র। নিজ জীবনে কখনো এই তথ্যকে সত্য মানবো এমন ভাবিনি। অথচ আমার সমস্ত চিন্তা, সিদ্ধান্ত, দৃঢ়তাব মূলে অলক্ষ্যে কে কুঠারাঘাত করেছে এক সময় আর দেখছি আমিও এক বিশেষ রমণীর জন্যে দাহক বাসনার দাস হয়েছি। এ-ও লক্ষ্য করেছি। সেই রমণীও আমার ইচ্ছায় সানন্দ সম্মতি জানাতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা, দুঃসময় অতীত এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যে কোনরকম তীব্র আবেগের পরিপন্থী।

অতি শৈশবেই আমি বুঝেছিলাম, আর আর সমবয়েসীরা যেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আমার জন্যে তেমন কিছু নির্দিষ্ট নেই।

অবশ্য বালসুলভ খেলাধুলা, খেয়ালখুশি ইত্যাদি যে একেবারে করিনি এমন নয়, তবে সবকিছুর আড়ালে স্বাতন্ত্র্য ছিল।

আমি বুঝেছিলাম আমি বড়ো অসহায়—আমি এবং মা। কেবল টাকা পয়সার নয়। সহানুভূতি ভালবাসা সবকিছুরই অভাব আমাদের পর্বত প্রমাণ ছিলো।

সেই বয়সেই আমি জেনেছিলাম, মা ছাড়া আপনার জন কেউ আর নেই। মাতুলালয়ে মানুষ হলেই যে সর্বব্যাপী রিক্ততায় চরাচর ভরে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু দৃঢ় মনোবল, আত্মমর্যাদা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কোনো নারী যদি স্বেচ্ছায় স্বামী সংগ পরিত্যাগ করে আসে, আপন ব্যক্তিত্বকে ভুলতে না পেরে কোনো নারী যদি পরবর্তী সমস্ত জীবনে সেই স্বামীর মুখদর্শন না করতে চায়, তাহলে অন্ততঃ আমাদের দেশে তার জন্য গুটিকতক সজ্জন ব্যতীত আর কোন শুভানুধ্যায়ী থাকে না।

মাতামহের কাছ থেকে আমার মা উত্তরাধিকার সূত্রে যে মনোবল মর্যাদা জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ববোধ লাভ করেছিলেন মাতুলের মধ্যে তা তেমন প্রস্ফুট হয়নি। সেইজন্যই কেবল মাতামহের দেওয়া কিছু সম্পত্তি ও মাতুলের নিরাশক্তি সম্বল করেই আমার মা জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য মামারও এমন কিছু সংগতি ছিল না যার ব্যয়ে তিনি আমাদের পরম সহায়ক হতে পারতেন। তবুও আমাদের দিন কাটতো।

আমি জেনেছিলাম, পরিপূর্ণ যৌবনকালেই মা একাকী হয়েছিলেন। আমার পিতা, যাঁর মুখাবয়বও এখন আমি স্মরণে আনতে পারি না, অন্ততঃ এটুকু আত্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যার বলে তিনি আমাকে মা-র কোল থেকে সরিয়ে নেননি। সম্ভবতঃ পরবর্তী বিবাহিত জীবনে আমার অনুপস্থিতি তাঁর কাম্যও ছিলো।

যাই হোক, নিঃসংগ জীবনে আমিই আমার মার একমাত্র সংগী ছিলাম। একথা আমি বলবো না যে, তিনি আবার বিবাহ না-করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অতো কৃতঘ্ন আমি হ'তে পারবো না। বরং পরিণত বয়সে আমি ভাবতাম, যদি সেই কালে আমার সমস্ত ব্যাপার বুঝবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে স্বেচ্ছায় তাঁকে সুখী করার দায়িত্ব নিতাম। যে-কালে সেই জ্ঞান আমার হ'লো তখন আর কিছু করার ছিলো না।

পাছে এইসব ভেবে আমি কষ্ট পাই এবং নিজেকে অপরাধী মনে করি সেইজন্য সেই পরম বিবেচক, সম্মানী মহিলা,—আমার মা, বুঝবার মতো ক্ষমতা হবার পরই আমায় জানিয়েছিলেন যে, আসলে আমার জন্যে তাঁর ত্যাগ স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বিশুদ্ধভাবে নিজের জন্যে, এই পথ

বেছে নিয়েছিলেন। আমি বরং তাঁর উপকারই করেছি বাকী জীবনের সঙ্গী হিসাবে।

ঠিক সর্বজয়ার মতোন করে তিনি আমায় মানুষ করেননি এতো দেখাই যাচ্ছে। এবং আমারও ইচ্ছা ছিলো না যে, এককালে অপু-র মতোনই আমি তাঁকে নিশ্চিন্তপুরের কুঁড়ে ঘরে একলা ফেলে যাবো। তবুও ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আরো বড়ো শহরে না যেয়ে উপায় ছিলো না। অপুর সঙ্গে আমার তফাৎ হলো এই, আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামা আমাদের দু'জনের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। এবং শহরে যাবার আগে আমার দ্বিধাহীন বিশ্বাস ছিলো, পুত্রের অবর্তমানে মামা তার ভগ্নীর কোনোরকম অসুবিধা ঘটতে দেবেন না।

শহরে যাবার আগে মা আমার হাতে জনৈক অধ্যাপক চৌধুরীর নামে একখানা চিঠি—তাঁর ঠিকানাসহ, দিয়ে দিয়েছিলেন। সারা জীবনে যিনি কারো কাছে সামান্যতম করুণা প্রার্থনা করেন নি, কেনো জানি না কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়ে আপন পুত্রের শুভাশুভ অপরের হস্তে ন্যস্ত করলেন। তবে জানতাম, অধ্যাপক চৌধুরী এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এককালে।

বড়ো শহরে অধ্যাপক চৌধুরীকে খুঁজে পেতে আমার মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরই সুচারু ব্যবস্থায় অন্যান্য সমস্যাও আমার কাছে অনেক সহজ হয়ে এসেছিলো। প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার জীবনে অধ্যাপক চৌধুরী আমার সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন যে, বয়সের অসমতা সত্ত্বেও তাঁকে আমার পরম বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। আমি অসংকোচে এবং কোনোরকম গ্লানি বোধ না করে বলতে পারি, তিনি না থাকলে আমার পক্ষে আদৌ কোনো পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর সঙ্গে আমার দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি। কেবল তাঁর উপদেশ, নির্দেশ প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্বল করেই আমি যেহেতু সমস্ত পথ পাড়ি দিয়েছি, সেই জন্যেই আমাদের সম্পর্কে কোনো ম্লানিমার ঠাঁই রইলো না।

অতএব আমি সমগ্র জীবনে আমার মা ও অধ্যাপক চৌধুরী এই দুজনের প্রিয় থাকার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। কোনো হঠকারী চিন্তা, চিত্তদৌর্বল্য প্রভৃতিকে স্থান দিয়ে আমি এ'দের মনোবেদনার কারণ হতে চাইনি। এবং এইজন্যেই প্রিয়রমণীর প্রসঙ্গে আমি এত দ্বিধান্বিত।

আমি নিজেকে কখনো অসাধারণ ভাবতে পারিনি। অধ্যাপক চৌধুরী আমায় শিখিয়েছেন, তোমার চিন্তা কাজ, আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা এ সমস্ত যে একান্তভাবে তোমারই একথা ভেবো না। তুমি বলতে পারো না, তোমার আগে—তোমারই পথে ভ্রমণ করে আরো কতজন যন্ত্রণা অথবা আনন্দ অনুভব করেছেন।

এই সমস্ত কথাই আমি প্রিয়তমাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপাতত যদিও সে আমার সামনেই বসে আছে, কিন্তু আমি জানি, এই দিন এবং এই সান্নিধ্য বহু বিলম্বিত করা যাবে না। আর করা যাবে না এই কথা ভাবতেই আর্ত বেদনায় সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অনুভূত হতে থাকে।

তবুও আমি ওকে বললাম, দেখো আজ আমরা মনে করছি আমাদের দুজনের সম্মিলিত পৃথিবী সর্বোত্তম সুখের স্থান হবে। কিন্তু তুমিও জানো না, আমিও বলতে পারবো না, সেই সুখ কতকাল স্থায়ী হবে। এমনো তো হতে পারে যে, ক্ষণজীবী সুখকাল অতিক্রান্ত হবার পরে তুমি আমাকে অথবা আমি তোমাকে ঘৃণা করতে শিখবো। তোমার আরো আলাপী আছে, আমারও অনেক আলাপিতা আছে তাই কোনো সময়ে আমরাতো ভাবতেও পারি, এ না হয়ে অমুক যদি আমার জীবনে আসতো তাহলে জীবনের চেহারাটা পালটে যেতো। তখন সর্বাপেক্ষা বেশী যাকে ভালোবাসা যাচ্ছে সেই হবে আমাদের চোখে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। অতো বড়ো কদর্যতার মুখোমুখি হতে আমরা কেউই পারবো না। সেইজন্যে বরং আমাদেব পরিচয়কে অস্বীকার করাই শ্রেয়। আমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কাউকে নয়, সামাজিক পথে যে কাছে আসবে তাকেই বরণ করে নেবো।

*আমি সমস্ত কথা শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করলাম। কারণ এইসব সময়ে নিজেকে কেমন অপরাধী আর দুর্বল বলে মনে হয়।*

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর আমার চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো। গ্লাসের পানীয়ে আঙ্গুল ডুবিয়ে নানারকম নক্সা আঁকলো কিছুক্ষণ টেবিলের রঙিন কাপড়ে। তারপর নিশ্বাস মুক্ত করে বললো, তুমি বড়ো বেশী সামনের দিকে চেয়ে আছো। অতো দূরে মানুষের দৃষ্টি যায় না।

আমি বললাম, কিন্তু হাতের কাছে যে আছে তাই কি তুমি নিঃসংশয়ে হৃদয়ে ধারণ করতে পার?

এবারে ও আর কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখালো না, শেষ কথা বললো, তা ঠিক। তবু সব শেষের কথা হচ্ছে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, যার দাম আপাততঃ অনেক। তুমি সব কিছু আবার ভেবে দেখো। বলে সেদিনের মতো নিজের পথে চলে গেলো।

তুমি তো আমায় ভাবতে বলে গেলে এখন নূতন করে আমি কি ভাববো? এ-পিঠ ও-পিঠ দু-পিঠই আমি ভালো করে দেখে রেখেছি। তোমায়ও বলেছি, এখন আবার কি করা যায়?

আমার আর ভাবনা করবার ক্ষমতা ছিলো না বলে আর একজনের কাঁধে এই দায়িত্ব চাপানো স্থির করলাম। অধ্যাপক চৌধুরীর অজ্ঞাতে কোনো

কিছু করবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয় নি। মনোবাসিনী মহিলার সম্পর্কে তাঁকে আমি বলেছি। কেবল তাঁকে নিয়ে আমার ভাবনার কথাগুলো এখনো গোপন রয়ে গেছে অবশ্য আমি তাঁর পরামর্শ চাইনি বলেই তিনি তাঁর মতামত আমায় জানাননি, একথা বলাই বাহুল্য।

আমি যখন পৌঁছলাম অকৃতদার প্রৌঢ় অধ্যাপক তখনো প্রায়ন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালাননি। টেবিলের সামনে চুপ করে বসেছিলেন। ওঁর নিশ্চয়ই স্মৃতির সায়র আছে, এমন সময় সেখানেই তিনি ডুবে যান বলে আমার বিশ্বাস।

এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিষণ্ণ আবহাওয়াকে বিষণ্ণতর করে তুলতে চাইছিলাম না। সেজন্যে পিছন দিকের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের আলো এবং উনুন উভয়ই জ্বলছিলো। পাচকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম কথাবার্তায় সময় কাটাতে চেষ্টা করলাম।

তিনি বোধহয় আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলেন। একটু পরে উঠে ভিতরে এসে এখানে সেখানে কয়েকটা আলো জ্বাললেন। তারপর আমার সামনে এসে হাঁসিমুখে দাঁড়ালেন। আমিও হাসিতেই জবাব দিয়ে বললাম, খুব গম্ভীর কিছু ভাবছিলেন নিশ্চয়।

কি করে বুঝলে? এ-সময়ে আপনি লেখাপড়া করেন না, আমি জানি। হুঁ ঠিকই। ভাবছিলাম, বুঝলে, মানুষ কি বিচিত্র, কেউ কামনার উদ্দামতায় কাম্যকে জোর করে আয়ত্ত করে, কেউ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে, আবার কেউ কেবল বাসনার নির্বাসন, কেবল স্বার্থত্যাগ, কেবল মঙ্গলেচ্ছা নিয়েই বেঁচে থাকে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনাব জন্যে এসব তো খুব জটিল সমস্যা নয়, তাছাড়া আমি আজ মানব-চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। বরং মানবজীবন সম্পর্কে কিছু গভীর তথ্য আলোচনা করবার আছে।

তাঁর সঙ্গে আবার আমি বসবার ঘরে গেলাম। তারপর সাধ্যানুযায়ী গুছিয়ে সব কথা ও সমস্যা তাকে বলবার চেষ্টা করলাম। শেষে তাঁর কি ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত জানতে চাইলাম।

কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম একটু আগের সেই হাসি, আর ওষ্ঠ প্রান্তে নেই। অকস্মাৎ ক্লান্ত, অস্থির ও গম্ভীর দেখাচ্ছিলো তাঁকে। মুখমণ্ডলে কয়েকটি কঠিন, ভারাক্রান্ত রেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো।

আসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। আমি নিস্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে রইলাম।

তিনি যে উত্তেজিত তা তাঁর আচরণ থেকেও বুঝা যাচ্ছিলো। এইরকম উত্তেজনা তার মধ্যে আমি খুব বেশী লক্ষ্য করিনি। প্রথম সাক্ষাতের দিন

সম্ভবতঃ তিনি এর চেয়েও বেশী বিচলিত হয়েছিলেন কিন্তু আমার বয়স ও *তার চেষ্টা সেই ভাবকে প্রকট করে তোলেনি।*

একটু পরে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। কিছু সময় আমি তেমনি বসে থাকলাম। তারপর উঠে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দার আলোটা জ্বালা ছিলো না বলে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে এক মহান্ মূর্তির মতো দেখা যাচ্ছিলো।

ফিরে তাকালেন না তিনি, বললেন, তাহলে তুমি ভাবছো ওকে তোমার জীবনের সাথে না জড়ানোই ভালো হবে?

হ্যাঁ, ভাবছি। তবে,—বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

তাঁর নিশ্বাস পতনের শব্দ একটু দ্রুত শোনা যাচ্ছিলো, বললেন, তোমার মনে হচ্ছে না যে, যা করতে চাইছো তেমন আর কেউ করে না অথবা তুমি অনন্য, একক?

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না, তেমন ভাবি না। আপনার কাছে জেনেছি, আরো অনেকে একই পথে হেঁটে গেছেন মন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে।

কেননা, তাঁরা কেউ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন, বলে আবার তিনি হাঁটতে লাগলেন বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। মনে হলো, কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। একবার জোর করে গলায় শব্দ তুললেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এমন মনে হচ্ছে না যে এই সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে?

ততোক্ষণে তাঁর আবেগ আমাকেও স্পর্শ করেছে, জবাব দিতে গিয়ে আমারও গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেলো বহু-দিনে আয়ত্ত করা স্থির চেতনা আর কিছুতে বজায় রাখা যাচ্ছিলো না, বললাম, ভাবছি এমনো তো হতে পারে যে অল্পকাল পরে আমরা বুঝবো—

তিনি আমার মুখ থেকে কথা তুলে নিয়ে বললেন, যা ভাবা গিয়েছিলো তা হয়নি। কিসের শূন্যতা দিগন্ত বিস্তারী। আর তখন—, এইখানে তিনি প্রাণপণে গলার স্বরকে সহজ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর তখন আপনাপন মূঢ়তাজনিত পরস্পরের প্রতি অভিমান সমস্ত জীবনের পরম দুঃখ বলে বিবেচিত হবে। সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করে সে হবে নিঃসঙ্গ, নির্বাসিতা, আর তুমি—

তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না, শেষ করা সম্ভবও ছিলো না, তাই আমিই সজল আবেগে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, আমি সারাজীবন নিয়তির মতো তাকেই ভালোবেসে যাবো।

আর সেই ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্যে অনেককাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সেই সামান্য অনুরোধের সুযোগ—

বলতে বলতে তিনি তাড়াতাড়ি বারান্দা ছেড়ে বাগানে গেলেন।

# মাছ

## হাসান হাফিজুর রহমান

ডাক্তার এসে পেঁাছুতে পারেনি, এরই মধ্যে সব শেষ। মারা গেছে কলেরায়। মাছ খেয়ে হয়েছিল কলেরা।

ফজল আলি হাঁ করে পড়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। মাছের মতো চোখকে খোলা রেখে যারা ঘুমায়, হঠাৎ দেখলে সেরকমই মনে হয়। ঠোঁট দুটো যেন এই মাত্র একটা কথা বলে শেষ করেছে। আর সারা শরীর সিঁটিয়ে যাওয়া লতার মতো। শিড় দাঁড়া ভাঙা, নেতানো। বিছানার সংগে লেপটে আছে।

ডাক্তার ভেতরে ঢুকেই সটান দরজার দিকে ফেরত গেল। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললো, আর দরকার নাই। এমনি কলেরার কল আরো তিন জায়গা থেকে এসেছে। ঐ মাছ খেয়েই কলেরা। যেতে হবে। বসলোও না, টাকাও নিলো না।

শুধু শুধু কলেরায় মরলে এতো কৌতূহল সৃষ্টি করে না। গাঁয়ের অর্ধেক লোক ভীড় করে আছে। বাড়ীটার কেউ ভেতরে—আঙিনায়, বেশীর-ভাগ বাইরে, দঙগল করা। একজন বললো, একটু সুর করে কথা বলে সে, ছন্দের মতো দোলা না লাগলে বলতেই পারে নাঃ মাছ খাওয়া নিষেধ, সারা গাঁয়ে গাঁয়ে তিন দিন হইল কইয়া দেওয়া হইছে—আর খাইও না মাছ। ভুঁই কাপে আসামের পানি খারাপ হইল। সেই পানি সারা দুনিয়ায় ছড়াইল, সেই পানির মাছ যাই খাব তাই শেষ। কথা তো আর শুনব না! কথাত আছে, বুদ্ধি নিও তিন মাথার কাছে। তারা কি আর না বুইঝি কিছু কয়। দেহ এলা।

ভূমিকম্পটা অকস্মাৎ। অসম্ভব ক্ষতি করেছে আসামের মাটি চিরে ধাতু উঠেছে বলকিয়ে। ধসে গেছে রেল লাইন। স্রোতের গতি ফিরেছে নদীর। দুটো তিনটে ধারা একখাতে একাকার হয়ে বইতে শুরু করেছে। কোনোটা বা উষর প্রান্তরকে ছাপিয়ে দিয়েছে বন্যায়। অদ্ভুত বন্যা, মাথা পাগলা বন্যা—মানুষ, পশু আর মাছ-কুমীর একস্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পুরো একটা পাহাড়ই নাকি গেছে ধসে। সেখানকার ত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে এখন থৈ-থৈ জল। লোক গেছে মারা, বিরাট একদল সৈন্য ছিল পাহাড়ের চূড়ায়, তারাও নিখোঁজ।

এর দোলা লেগেছে পূর্ব বাংলাতেও। তাছাড়া আসামের স্তূপ ধ্বংস-নজীর ভেসে আসছে যমুনার স্রোত বেয়ে বাহাদুরবাদ, ফুলছরিঘাট-যমুনা পারের এখানে সেখানে আটকে আছে বিরাট দেহ মরা হাতী, বাঘ, ভালুক আর গলিত দেহ মানুষের শব। ছিন্নমূল গাছ ভেসে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কচুরী পানা যেমন জাম হয়ে ভাসে।

জলে ফর্মালীনের গন্ধের মতো তীব্রতা। ডিসেকশন করা মড়ার কাছে গেলে এরকম ঠেকে। খোলা পানি, চাপ-চাপ কাদা। আসামের মাটির নীচে সালফার রয়েছে, তাই মিশে দূষিত করেছে জল। সালফারের গন্ধ পচা ডিমের মতো। এ কিন্তু সে রকম নয়। এতে তীব্রতর ঝাঁঝ। বাতাসের বুকে বলকে বলকে উঠছে। নদীর পাড়ে বসতি যাদের, হাওয়ার ঝাপটা লাগলে দরজা জানালা বন্ধ না করে শ্বাসই টানতে পারে না তারা। ময়মনসিংহের উত্তরের দিকটায় ইতিমধ্যেই খাল, নালা, বিলঝিলের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে এই জল। অনেকেই মনে করছে, এবারের আমন পচে যাবে; একদম শেষ হয়ে যাবে। এই পচাপানি যা কিছু স্পর্শ করবে না কেন, বিষাক্ত করে দেবে।

আতঙ্কে মাছ খাওয়া ছেড়েছে সবাই। জীয়ন্ত মাছের পাতলা চামড়াটুকু তুললেই পচা দগদগে মাংস বেরিয়ে পড়ে। ইসলামপুরের হাটে তিনটি বড় বাইগড় আর একটি শঙ্কর মাছ উঠেছিল এই হাটবারে। হাটের জীবনে এতো বড় মাছ একসঙ্গে এতগুলো এই প্রথম। হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেনি কেউ। শুধু শঙ্কর মাছের একটু-আধটু নিয়ে গিয়েছিলো কেউ-কেউ অষুধ করার জন্যে।

এই আতঙ্ক এড়িয়েও যারা দু-একটা বড়ো মাছ অতি সহজে ধরে ফেলে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না, তারাও কাণ্ড করেছে কম নয়। হয়েছে কলেরা! আর সৃষ্টি করেছে গবেষণার হৈ-চৈ শুধু। শুধু মাছ খেলেই যে কলেরা হবে এও অনেকে মানতে চায় না। অনেকেই মাথা খুঁড়ে চালাচ্ছে তর্ক। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছে একপেশে। আর সবারই চোখ দুটো হয়ে উঠেছে লাল। অদ্ভুত কৌতূহলে হয়েছে বড়ো বড়ো, ফাটা-ফাটা। ফজল আলির মৃতদেহটা ঘিরে অনেকেই অনেক রকম ভাবতে শুরু করে দিল।

হ্যাঁ, ফজল আলি একটা মাছ ধরেছিল বটে। রশিদের নৌকা নিয়ে ঘুর-ঘুর করছিল যমুনা কিনারায়। কানের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো কাতলাটা। ফজল আলি কায়দা করে সমান স্রোতে নৌকোটা মাছটার পাশাপাশি ভাসিয়ে রেখে, শক্ত করে ধরে ফেলে ছিল কানশাখাটা। তারপর ঠেলে পারে ভিড়িয়েছিল নৌকা আর মাছ এক সাথে। ডাকাডাকি করে কাকেও পায়নি কাছে, নৌকায় তুলতে হয়েছিল সেই মাছ অনেক কষ্ট করে তবে। মাছটা কেমন নিথর হয়ে পড়েছিল হাঁফ ছেড়ে দিয়ে। নড়েওনি চড়েওনি। কানশাখাটা কাঁপিয়ে শ্বাস

টান ছিল শুধু। ডাকাডাকি করে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে হন্তদন্ত বৌকে বাইরে এনেছিলো ঘরের—দেহরে, কি আনছি, দেহ, দেহ। কোনঠাই গেলা? বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিয়ে হাঁক পেড়েছিল সে।

বৌ আর সে টানা-হেঁচড়া করে তবে মাছটা আঙিনায় ফেলতে পারে। অকস্মাৎ খুশীতে বুকটা আঁতকে উঠেছিল বৌর। ধকধক ধকধক করে কতক্ষণ, তারপর মুখটা কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। নীল হয়ে যায় হতাশায়। বলে মাছ তো আনলা, খাওয়া ত আর যায় না। চারদিকে মানুষ মাছ ছাড়ছে: কয়, কি বলে হইছে মাছ।

তর যে আর কথা। কিসের আবার কি হইছে খাওয়া যাবে না। যত না, হু।

না গো না, না খাইলা। কি জানি কি আবার হয়।

বাড়াবাড়িটা থামাত তুই। সবটাতেই বাড়াবাড়ি করিস না কইলাম মাইয়া মানুষ হইয়া। জনমেত আর কাতলা মাছ খাস নাই, জীবনেও জুটবে না। পুঁটি মাছই কপালে জুটে না, তা আবার কাতলা। খাইয়ানি খাইয়ানি, বুঝলি? বৌ চুপ করেছিল।

হ্যাঁ, ফজল আলির খাওয়ার সখ ছিল বটে। যে সন্ধ্যেটা ভাতে-মাছে গেছে ওর, ওকে মনে হতো অন্য মানুষ সেদিন। কিন্তু জুটবে কেমন করে?

গ্রামে জমি আছে অঢেল; তার জমি কোনটা? গ্রামে নালাজলা অঢেল, সে জাল ফেলবে কোথায়? নদী বড়ো নালা, বিল—জমিদারের দখলে। সেখানে মাছ ধরা নিষেধ। ছোট ছোট খাল জলা বাকী থাকে, সে-সবও বড়লোকের দাড়কি, ধুয়োর দিয়ে দখলী নেওয়া। সে জায়গা পাবে কেন?

নিজের এমন যন্ত্র সরঞ্জামও নেই যে অন্য কোথায়ও চেষ্টা করতে পারে।

জাল নেই যে ছাপ দেবে। পাঁচা নাই যে ঘাই মারবে।

খেওয়াল নেই যে টেনে তুলবে।

তবু হঠাৎ পাওয়া মাছে ভাতের সন্ধ্যেটা কি অপূর্ব গেছে ওর। মনের ভেতরে দাগ কেটে গেছে।

ফিকির ফন্দী করে আধসের তেল জুগিয়ে এনেছিলো। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এসবও জোগাড় করে ছিলো। কোঁছায় করে এনে ঢেলে দিয়েছিল বৌয়ের সামনে। বেঁকে যাওয়া মনটা আর স্থির রাখতে পারেনি বৌ। লোভটা আবার চকমক করে উঠছিল চোখে-মুখে ওরও। উৎসাহে চনমন করে উঠছিলো রক্ত। বটি নিয়ে বসে গিয়েছিল সে।

ভীড় করে আছে সব মরা মানুষের চারদিকে, আর বাড়ির চারিদিকে। মরার আগের দিন কি যেন বলতে চেয়েছিল ফজল আলি! বৌকে ডেকেছিল হয়তো। নতুন বিয়ে করা বৌ কেবল ঘর-সংসার পাত। ছেলেমেয়েও হয়নি। শেষ সময়ে

কিছুতেই ভুলে থাকতে পারে না। মুখ দিয়ে অস্ফুট অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে শুধু। কিছুক্ষণ ওর দিকে ঝুঁকে থাকে সবাই, তারপর একযোগে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বৌয়ের দিকে চায়। বৌ তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করছে, শেষ আশাটুকুও ছেড়ে দিয়ে ডুকরে কাঁদছে, তার মনের কথাগুলোই গানের কলির মতো সুর করে সে বলছিলো আর ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল অসহায়ভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েই যেন চারপাশের সবার কথা মুহূর্তে একদম ভুলে গিয়ে।

আমি ক্যান আগে খাই নাই গো।
আদর কইরা আগেভাগে খিলাইলাম গো।
আমিই আগে মরলাম হনি গো।
ও হো হো হো।

অরণ্যের গাছগুলোর মতো মানুষগুলো স্তব্ধ হয়েছিলো। একজন টেনে দূরে সরিয়ে এনেছিল বৌকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওপরটান উঠেছিল ফজল আলির। ততক্ষণ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো বৌ।

একজন খোলা চোখ বন্ধ করে দিলো ফজল আলির। বুজিয়ে দিল ফাঁক করা ঠোঁট। সটান করলো হাত-পা। মরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন করে না নিলে জমে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, লাশটাকে আর সহজই করা যায় না এরপরে।

স্বাভাবিক মরা এ নয়।

শুধু কলেরার মরার মতো সহজ নয় এ মৃত্যু। মানুষগুলো ছোটাছুটি করছে, কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ওদের ভেতরটা ঠেলেঠেলে উঠছে। ফজল আলি শুধু মাছ খেয়ে নিজের দোষে মরেছে বলে কেউ আর ভাবতে পারছে না। একি উপদ্রব এলো পৃথিবীতে? সারা ঠাঁই জুড়ে অভিশাপ। কেয়ামত নাকি অত্যন্ত কাছে এসেছে। আতঙ্কটা সবার। একজন বললো, লোকটা যুক্তিশীল। বলতে বলতে মাঝে মাঝে, নিজেই তার উত্তর দেয়। আত্মসমালোচনার ঝাঁঝ থাকে কথাতে। কি এক জ্বালা হইল কওত? আসামে হইছে ভুঁইকাপ, মানুষ মরছে সেনু—তাণ্ডব হইছে সেনু—তা এহেন যে মড়ক শুরু হইল এহানে। তাও দেহ আবার মরে কারা? ঐ নেংটিখোলা আর নেংটিআলা। জানোয়ার আর মানুষ। বড় মানুষ বেবাকার সবাই। ফজল আলি করল ক্যাঁ? না কি শালা হা-ভাইতা। পয়সা থাকলে কি, জনমে কোনদিন বড় মাছ খাইলে কি ও মরত? মরত ও? কও ত? গরীবের সুখ আর কহন? কওত কহন?

ঘরের কোণে কান্নারত বৌটির বিলাপের কথা এতক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে। আশেপাশের আলোচনায় কিছু কিছু শব্দ তার কানে এসে বাজতেই—সে

কথার খেই ধরে সে আবার কথা খুঁজে পায়। তার রেশ ধরে আবার গীত শুরু করে সেঃ

কত সুখ চাই ছিলরে—পায় নাই কোনদিন, কত আশা আছিলরে—পুরে নাই কোনদিন, ও-হো-হো-হো।

আর একজন বললো, কালো চিমসে মুখ, বিশ্বেস প্রবণ, প্রতি কথার পেছনে ঘটনার উদাহরণ টেনে নিজেকে সমর্থন করে, না! খোদার গজব পড়ছে। সেই গজব পড়ছে খোদার। গজবের মাল যারাই নিব তারই আর রাহা নাই। গতবারের নোয়াখালির বানের কথা কই। সেই যে মানুষ আর গরু সব ভাইসা গেল একেবারে। পানিও খাইলে মরণ। মরা মানুষ সব জাগা বেজাগায় পইড়া আছে। কারো গায়ে গয়না, কারো গলায় হার, টাকার খতি বাইন্দা রাইখছে কেউ কোমরে। যাই যাই সেগিলা নিল সব মরছে—এইডা হলো খোদার গজব—

গজবের কথাটা শুনে বৌয়ের কান্না আবার বেড়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ে আবার সে গীত করে কাঁদতে শুরু করলোঃ

গজবের মাল কতজন নিল গো—
তাগরে কিছু হয় নাই
কতজনের মাল কতজনে কাড়িলো গো—
তাগরে কিছু হয় নাই।
মিয়ারা কত গজবের কাঠ বান্ধিল গো
তাগরে কিছু হয় নাই
ও-হো-হো-হো।

ভূমিকম্প আর বন্যা যে কাঠ ভাসিয়ে এনেছে তাই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বেশী। অনেকে বেদম খুশিও হয়েছে। গ্রামের আলসে চর্বিস্ফীত লোকগুলোর তৎপরতা গেছে বেড়ে। খৈয়ের মত উত্তপ্ত ঠোঁটের উপরে ফুটছে, বিধ্বস্ত আসাম, আসামের মাছ, মানুষ আর কূপ ভাঙ্গা অজস্র কাঠের কথা। কাঠটাই সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয়।

আসাম কাঠ বন্ধ করেছিলো পাকিস্তানকে দেবে না বলে। সেই কাঠ বন্যায় ভেসে আসছে হু-হু করে পাকিস্তানের খালে বিলে। খোদা দিচ্ছে, কে বাধা দেয়! পাকিস্তানকে দিচ্ছে খোদা! উৎফুল্ল কন্ঠে মন্তব্য করেছিলো আড়মোড়া ভেঙ্গে বড়-মিয়া। তিনি নৌকা ভাড়া করে, মজুর রেখে অন্তত দশ বছরের খড়ি কাঠ আটকিয়েছেন খামারে। যারই নৌকা আছে, আছে টাকা, সেই বেঁধেছে কাঠ ইচ্ছে মতে। মৌলবী সাহেব ফতোয়া দিয়েছিলেন নিওনা চেলী। ফওতী মাল নেবে না কেন—প্রতিবাদ করেছিলো অনেকে। তখন মৌলবী সাহেব গল্প বলেছিলেন একটা, ইমাম হানিফার বুজরগীর। কেবলা

সাহেবের কলব আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতো হরওয়াখত। একদিন হয়েছে কি—দরিয়াতে ভেসে আসা একটা নাশপাতি খেয়ে ফেললেন পেরেশা হয়ে। ওমনি কি কুদরত খোদার—কলব জেফের বন্ধ করে দিয়ে নিথর, হিম, ঠাণ্ডা একেবারে। গমে আর আর পস্তানিতে দানাপানি ছাড়লেন হজরত। ভাবলেন, যার এই নাশপাতি মাগ ফেরাত নিতেই হবে তার কাছ থেকে। হেঁটে হেঁটে চললেন তিনি সাত রোজ। অনেক খোঁজাখুঁজির বাদ মোলাকাত হলো মালিকের সাথে অবশেষে। হজরত বললেন, মাফ করো! মালিক তো পাথর। কানেই তুললেন না কথা, আমার মাল আমি খাব, তুমি খেলে কেন? মাফ আমি করতে পারি না। হজরত কাঁদলেন, অনেক কোশেশ করলেন, বোঝালেন। এই জিন্দেগীর তামাম মেহনত তাঁর বরবাদ যাবে, গজব নাজেল হবে খোদার। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিপরীত ধর্মী মানুষের মুখোমুখি এমন অদ্ভুত মুহূর্তের উদ্ভব চিরকাল হয়ে আসছে, কিন্তু এর ফয়সালা আজতক হলো কই?

চিরদিন মানুষকে বঞ্চনা করে অভ্যস্ত যারা হয়ে উঠেছে, অথচ শাস্তি কোনদিন দেখেওনি, তাদের দুঃসাহসে বাধ মানলো না। আর একদল চিরদিন কিছুই না পেয়ে পেয়ে বঞ্চিত হয়ে, মানুষের চিরস্থায়ী স্বত্বকে কিছুতেই আর স্বীকার করে না। তাই মৃত্যুকে ভয় না করে গজবের ও অন্যের জল-মহলের ছাড়াপাওয়া মাছ, দূষিত পানিতে গলিত মাছও জনমশোধ খেয়ে নিল। আর বড় মানুষের অনেক টাকায় ডাকা কূপ ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ছিটিয়ে পড়েছে যে অজস্র কাঠ তাই দেখে খুশীও হলো। ভাবলো সেখানে-- আসামে নেংটিপড়া মানুষ আর লেজওয়ালা কুকুর এক হয়ে গেছে। দাঙ্গা ভুলে হিন্দু মুসলমান একপাত থেকে খাবার কামড়াকামড়ি করে খাচ্ছে। হতভাগ্য উদ্বাস্তু মানুষগুলো, যাদের ঠাঁই ছিল না কোথাও, তারা এবারে জায়গা পেয়েছে যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বুকে উত্তপ্ত জলের নিশ্চিত স্রোতের ভেতর। ভাসছে আর ভাসছে বিরাট বিরাট অভিজাত মাছ, কচুরী পানার মতো জাম বেঁধে কূপভাঙা ঝাঁকঝাঁক মাছ ভাসতে ভাসতে সেসব পাকিস্তানের চকমকে চোখের সামনে এসে গেছে। পাকিস্তানের শক্ত সমর্থ নিশ্চিত ডাঙ্গার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধ্বসে যাওয়া আসামের কাঠ পেয়ে ধনী হয়ে উঠবে পাকিস্তান।

একে একে মানুষগুলো সরে যেতে লাগলো মুর্দার কাছ থেকে কাফন দাফন করাতে হবে। স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে ঝড় উঠলে ঢেউগুলো যেমন আকুলিবিকুলি করে তেমনি মানুষগুলো তছনছ হয়ে গেলো ভাবনায়। আতঙ্কে, অস্বস্তিতে, গায়েবী জেল্লার শিহরণে। ফজল আলীর মৃতদেহটার অস্তিত্ব ঘিরে থমথম করতে লাগলো ওদের অনুভূতি। কোনো অবিমিশ্র করুণা কিংবা

সহানুভূতিতে নয় নিজেদের কথা ভেবেই ওদের বুকগুলো দুলে উঠলো, শিউরে শিউরে লাগল বারবার।

এতক্ষণে ঘরটা খালি হয়ে গেল একেবারে। মৃত স্বামীর সঙ্গে নির্জন একাকীত্বে বৌয়ের মনটা সহানুভূতিতে গলে গেলো এখন। অবধারিত প্রেমে ভরে গেলো। মোমের মতো নরম হয়ে গলতে লাগলো সে। তাই তার বিলাপের কথা গেলো কমে, কান্না উঠলো বেড়েঃ

মাছ খাবার চাইছিলরে—ওহো হো হো
মাছে জিও বান্ধা আছিলরে—ওহো হো হো
মড়ার মছ এহন কত হছেরে—ওহো হো হো।

# অভিশপ্ত

**বন্দে আলী মিয়া**

অবশেষে আলমকে চলে যেতে হলো ঢাকায়। তার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা কোথায় থাকে সে খবর তার জানা নাই। তবু এইস্থানে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। এই স্থান থেকে তাকে সংগ্রহ করতে হবে ক্ষুধার অন্ন। এই অন্ন শুধু তার একার জন্য নয়। তার মুখের দিকে চেয়ে আছে পুত্র-কন্যার দল—প্রতীক্ষা করে আছে স্ত্রী জোহরা।

এই বিশাল বিশ্বে সে কত অসহায়। অপরিসীম ধৈর্যে জীবনের পথে তাকে এগিয়ে চলতে হবে। এই পথের দু'পাশে ভয় আর সন্দেহ, অবিশ্বাস আর আঘাত প্রচ্ছন্ন। সেই আঘাতের দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে হয়তো তার ঈপ্সিত বস্তু মিলতে পারে।

আলম আশ্রয় পেল তার এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায়। এই স্থানে মাথা রাখবার স্থান পেয়ে সে হাঁফ ছাড়লে। সে তো ভেবে মরছিলো! খোদা সত্যিই তাকে অনুগ্রহ করেছেন।

আত্মীয়টির সঙ্গে তার চুক্তি হলো, বৈঠকখানা ঘরে সে থাকবে। কিন্তু সমগ্র বাড়ীটার অর্ধেক ভাড়া তাকে বহন করতে হবে। নাস্তা সে পাবে না। শুধু দু'বেলার আহার্য এবং ঘরভাড়া বাবদ মাসিক পঞ্চাশ টাকা তাকে দিতে হবে। ম্লান হেসে আলম সম্মতি জানালে। যার একটি পয়সা আয়ের ব্যবস্থা নাই সে কি করে এই টাকাটা সংগ্রহ করবে। আত্মীয়টি সুযোগ বুঝে তার কাঁধে ওর ভার চাপালো এটা সে বুঝতে পারলে। কিন্তু উপায় কি?

কাজের সন্ধানে বের হলো আলম। রাজধানীর পিচ্ ঢালা রাজপথ চলে গেছে দিকে দিগন্তরে। কোন্ পথ কোথা দিয়ে গেছে সে জানে না। তবু সেই পথ হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। সেই পথ অগণিত জনতার পদচিহ্ন বহন করে এঁকে-বেঁকে শুয়ে আছে। পথের দুপাশে সারি সারি বিপনী। আলম পথের ধারের পানের দোকান থেকে দু'পয়সার বিড়ি কিনে দড়ির আগুনে ধরিয়ে সম্মুখের পথ ধরলো। কোথা যাবে সে জানে না—কোন পথ কোন্‌খান দিয়ে কোথায় গেছে তা সে চেনে না। তবু সেই জনাকীর্ণ শহরের ধুলি-ধুসরিত বিস্তৃত রাজপথ ধরে এগিয়ে চল্‌লো। পথে চলেছে রিকসা, ঘোড়ার গাড়ী, বাস, সাইকেল। সকলেই কর্মব্যস্ত। কিন্তু আলম এদের থেকে স্বতন্ত্র। এদের কেহ সে নয়। কর্ম তার নাই, সুতরাং ব্যস্ততাও তার নাই। এই বিপুল বিশ্বে সে একেবারে একা—নিদারুণ অসহায়। পথে পথে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানোই যেন তার কাজ।

আলমের দিন কাটতে লাগলো নিতান্ত নিরুপদ্রবে নিতান্ত সহজভাবে। তার জীবনে বৈচিত্র্য নাই—চাঞ্চল্য নাই। বেকারের মুল্যহীন দিনের প্রহরগুলি অলস মন্থর। প্রাতঃকালে উঠে কাজের সন্ধানে বের হয়—সারা দিন পথে বিপথে ঘোরাঘুরি করে। পকেট কপর্দকশূন্য—কোথাও অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—কী করে যে তার দিন কাটবে সে ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ছেলেমেয়েদের কচি মুখগুলো। হতভাগ্য পিতা সে—এদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটাবার সামর্থ্য তার নাই।

পথ দিয়ে চলে আলম—ক্লান্ত অবশ পদ। চোখে দীপ্তি নাই মনে উৎসাহ নাই বুকে ভরসা নাই। যেখানেই কাজের আশায় গেছে সেখান থেকেই ম্লান মুখে ফিরেছে। হঠাৎ সেদিন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বন্ধুটি সোল্লাসে তার একখানি হাত চেপে ধরলো। বলল ঃ কতদিন পর দেখা, কেমন আছ আলম?

আলম প্রসন্ন কণ্ঠে জবাব দিলেঃ তোমার সঙ্গে যে এমন ক'রে দেখা হবে মতিন, কখনো ভাবতেই পারিনি। কি করছো এখানে?—

মতিন বললোঃ কি আর করতে পারি বলো! আগে যা করছিলুম এখনো তাই—সেই খবরের কাগজের চাকরি।

আলম বললোঃ ওঃ, তা মন্দ কি। যেখানেই হোক পেটটা চললেই হলো; তা ইয়ে পাচ্ছো কত?

মতিন জবাব দিলো ঃ সে আর বলো না ভাই—এসো চা খাওয়া যাক—বলে হাত ধরে পথের পাশের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলো।

আলম বাধা দিতে পারল না। ভয়ে তার বুকটা টিপ টিপ করতে লাগলো। বিলটা নাকি তাকেই শোধ করতে হয়। তাই মৃদুকণ্ঠে সে বলল ঃ দেখ

মতিন, আজ একটা সাংঘাতিক রকম ভুল হয়েছে আমার। বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি—তা'তে আসল বস্তুটাই ছেড়ে এসেছি। মণি ব্যাগটা যে বালিশের তলায় রয়েছে আদপে একটুও মনে ছিল না। পথে এসে যখন স্মরণ হলো তখন অনেকটা চলে এসেছি।

মতিন তার পিঠ চাপড়ে দিলে। বললে ঃ তাই নাকি! তা এমন ভুল হতে পারে বৈকি!

আলম জবাব দিলে ঃ কতদিন পরে আমাদের দেখা বলো দিকি। একটু চা দিয়ে যে তোমার সমাদর করবো তার উপায় আজ নেই! খালি পকেটে চল্‌ছি।

বন্ধুর নিকটে মিথ্যা বলে আলমের মনটা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে উঠলো। নিদারুণ সঙ্কোচে সে আড়ষ্টভাবে টেবিলের সম্মুখে ব'সে আঙ্গুল খুঁটতে লাগলো।

আলমের কথা শুনে মতিন হো হো করে হেসে উঠলো। বললে ঃ তুমি সেই কলেজ বয়টির মতন তেমনি আছো দেখছি। পথের খরচের জন্য পাঁচটা টাকা রাখো। ব'লে পকেট থেকে একখানা নোট বের করে আলমের বুক পকেটে গুঁজে দিলে।

আলম আমতা আমতা করে বল্‌লে ঃ না ভাই, টাকা—বেশ! এখন আর দরকার হবে না।

মতিন বললে ঃ রাখো না কাছে। এখনো তোমার ফিরতে হয়তো অনেকটা দেরী, পথে খরচ আছে বৈকি। তা' ইয়ে, এখানে করছো কি?

রেস্টুরেণ্টের ছোকরাটি এসে দু'কাপ চা আর কিছু খাবার রেখে গেল।

আলম জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলে ঃ এসেছি প্রায় হপ্তা দুই। ঢাকাতে এই আমার প্রথম আসা। কাকেই বা চিনি—কোথায় বা যাবো। একটা চাকরি বাকরি করবার ইচ্ছে আছে।

মতিন চায়ের বাটিতে চুমুক আরম্ভ করলে। আস্তে আস্তে জবাব দিলেঃ চাকরির বাজার বড় মন্দা ভাই। তুমি তো খবরের কাগজের কোন কাজ জানো না, কেমন?

আলম জবাব দিলে ঃ জানি না ঠিক—কিন্তু সুযোগ পেলে শিখে নিতে পারা যায়। কি বলো তুমি।

মতিন কথাটা গায়ে মাখলো না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে ঃ হ্যাঁ—এই বয়সে কাজ শিখে চাকরি করা। একটা স্কুল মাস্টারি বরঞ্চ জুটিয়ে নাও।

আলম তাকে সমর্থন করলে ঃ সেই বরঞ্চ ভালো। একটা পণ্ডিতি জুটিয়ে নেবো! বলে ম্লান কণ্ঠে খানিকটা হাসলে।

মতিন সহানুভূতি জানালে। বললে ঃ সে মন্দ নয়। আমাদের পাড়ায়

একটা হাই স্কুল হচ্ছে তার সেক্রেটারীকে বলবো। কাল যেও আমার বাসায়—সকালের দিকেই যেও। এই ঠিকানাটা রাখো—বলে এক টুকরো কাগজে নাম-ধাম লিখে তার হাতে দিলে।

চা-পান শেষ হয়ে এসেছিল—সুতরাং দু'জনে উঠে পড়লো। মতিন পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আলমকে দিলে, অপরটি নিজে ধরালে। বললে ঃ একটু তাড়া আছে ভাই চলি এবার। কাল সকালে আমার ওখানে গিয়ে চা খেও—কেমন? ব'লে বাম হাত তুলে একটা রিক্শাকে ডেকে তাতে চেপে বসলে।

মতিন চলে গেল। আলম তার অপসৃয়মান ত্রিচক্রযানের দিকে চেয়ে রইল। আচম্বিতে একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে এলো।

সারা সকাল থেকে দুপুর অবধি ঘুরে ঘুরে ফিরলো আলম। পথশ্রমে তার শরীর অবসন্ন, মন অবশ। রোদ লেগে মাথাটা ঝিমঝিম করছে—চোখ দুটো জ্বালা করছে। জামাকাপড় ছেড়ে সে সটান বিছানার উপর শুয়ে পড়লো। বালিশের পাশে দু'খানা চিঠি পড়ে আছে—ক্ষিপ্রহস্তে সে হাতে উঠিয়ে নিলে। আজকের ডাকেই চিঠিগুলো এসেছে। একখানা লিখেছে স্ত্রী জোহরা, অপরখানা একজন পরিচিত ব্যক্তি।

জোহরার চিঠিতে সংসারের নগ্ন ছবি প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অভাব আর দুঃখ, দৈন্য আর পীড়ন সর্বদা নাগপাশের মতো তার চারিদিকে নিগড় করে রেখেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। কী যে উপায় করবে আলম কিছুই ভেবে পায় না। অসহায় পুত্র-কন্যা নিরুপায় জোহরা চেয়ে আছে আলমের মুখের দিকে। আলমের দু'চোখে অশ্রুর পাথার বক্ষে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা—ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার ক্ষমাহীন অভিযোগ মদের বিষাক্ত ফেনার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই বিশাল বিশ্বে সকলের আশ্রয় আছে—শুধু সেই পথে পথে ক্ষুধিত ভিখারীর মত কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

আলম চিঠি দুখানি রেখে উঠে পড়লো। এখনো তার স্নান আহার হয়নি। পরের বাড়ীতে সে থাকে। ওদের বাড়ীতে বেলা এগারোটার মধ্যে রান্নাঘরের পাট শেষ হয়। কিন্তু আলম এর ব্যতিক্রম। আড়াইটা তিনটার কমে সে বাড়ী ফেরে না। খাবার তার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকে। কোনোদিন সে খায়—কোনোদিন তার ফিরবার আগেই খাদ্যবস্তু বিড়ালে খেয়ে যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে আলমের মনে পড়লো মতিনের কথা। কিন্তু সে যাবে কি? কাপড়চোপড় সবগুলোই মলিন হয়ে এসেছে। সংকোচ কিছু হচ্ছে তার। মতিন তো অপরিচিত নয়—তার পুরাতন বন্ধু। এক সংগে স্কুলে পড়েছে। কলেজ ছেড়ে দিয়ে মতিন চলে গেল—আলম তার পরে আরো কয়েক বছর পড়াশুনা ক'রে পাশ ক'রে কলেজ ছেড়েছে। তারপর ভাগ্যঅন্বেষণে

কে যে কোথায় ছিলো এতকাল তার হদিস ছিলো না। বহুকাল পরে কাল হঠাৎ দেখা।

মতিনের বাসায় গিয়ে আলম বুঝতে পারলো, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই সে আছে। বাড়ীটা বেশ বড়ো। ঝি, চাকর, কিছুর অভাব নাই।

আলম ভেবে দেখল, এতটা স্বচ্ছল সে আপনার জীবনে কোন দিনই ছিলো না। মতিনের প্রাচুর্য্য--মতিনের ঐশ্বর্য যেন কূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে।

আলমকে দেখে মতিনের আনন্দের সীমা রইল না। সে বন্ধুকে তার শোবার ঘরে নিয়ে বসাল। চারদিকে আলমারী বোঝাই বই—ড্রেসিং টেবিল, খাট, কৌচ, বিদেশী অয়েল পেইন্টিং ইত্যাদি দিয়ে তার ঘরখানি পরিপাটি করে সাজানো। মতিন ছেলে-মেয়েদের ডেকে আলমের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলে।

নাশ্‌তা আর চা এলো। দু'জনে মুখোমুখি বসে তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

আলম প্রশ্ন করলেঃ বাড়ীটা তো বেশ বড়ো। ভাড়া দিচ্ছো কত?

মতিন হাসলে। জবাব দিলে ঃ সে দায় থেকে বেঁচে গেছি।

আলম জিজ্ঞাস করলে ঃ কি রকম?

মতিন উত্তর দিলে ঃ কিনে নিয়েছি। আজাদীর পরে কিনেছিলুম—তা নইলে এখন কি হাত দেবার উপায় ছিলো নাকি?

আলম সায় দিলে ঃ বটেই তো। তা—এখন মাইনে পাচ্ছো কত?

মতিন বন্ধুর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে। বললে ঃ যা দায়িত্ব আমার ঘাড়ে, তার তুলনায় এমন বেশী আর কি, মাত্তর সাড়ে নয়শো।

আলম বিস্মিত হলো। কিন্তু সে ভাবটা বাইরে প্রকাশ হতে দিলে না। বললে ঃ সে ঠিক বটে, ইংরেজী কাগজ সম্পাদন করা চাট্টিখানি কথা নয়! তা' মাইনে ভালো দিচ্ছে বলতে হবে। ভাই মতিন, তোমাদের পাড়াটা বেশ সিম্‌সাম—পরিচ্ছন্ন।

মতিন জবাব দিলে ঃ হ্যাঁ, এখানে প্রায় বাসিন্দা আমার পুরনো বন্ধুর দল। ও বাড়ীটা আবুল খয়রের। আগে রাইটার্স ক্লার্ক ছিলো—এখানে কি একটা হয়েছে—এখন পাচ্ছে পাঁচশো। ওই বাড়ীটা কিনেছে দশ হাজার টাকায়।

আলম চেয়ে দেখলে বাড়ীটা দোতলা। পিছনে প্রায় এক বিঘা জমি। সেইখানে আম লিচুর বাগান। আপনার অজ্ঞাতে আলম আর একবার চম্‌কে উঠলে।

মতিন বলে চললোঃ ওই পাশের বাড়ীটা ফখরুদ্দিনের, আর্ট একাডেমিতে

কিছুকাল পড়েছিলো। যা ছবি আঁকতো, কেউ হয়তো বুঝতো—কেউ বা না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করতো—'এটা কি?'

আলম হাসলে। প্রশ্ন করলে ঃ এখন করছে কি?

মতিন বললে ঃ চেনো নাকি ওকে। আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে কমার্শিয়াল লাইনে কিছুদিন চেষ্টা করেছিলো—কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি। এখন আর্ট ইনিস্টিটিউটের একটা হোমড়া-চোমড়া পোস্টে আছে।

আলম আর একবার হাসলে। ফখরুদ্দিনকে সে ভালো ভাবেই চেনে। চুলগুলো আলুথালু। জামাকাপড় ঢিলাঢালা—কোনখানে বোতাম আছে, কোনখানে নাই। সে এমনভাবে নিজেকে সাজিয়ে রাখতো যেন লোকে তাকে একটা আর্টিস্ট বলে মনে করতে পারে! সেই ফখরুদ্দিন এখন অধ্যাপক—বোধহয় স্যুট পরে। জিজ্ঞাসা করলে ঃ বাড়ীটা কিনেছে নাকি?

মতিন বললে, হুঁ, কিনেছে কিছুদিন আগে, চলো ওর ছবি-টবি দেখে আসি।

দুজনে ওঠে দাঁড়ালো।

ফখরুদ্দিন ঘরেই ছিলো। খবর দিতেই বের হয়ে এসে দু'জনকে সম্বর্ধনা করলে। পুনরায় মামলেটসহ চা-পর্ব শুরু হলো। তিনজনের মধ্যে বর্তমান শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

ফখরুদ্দিন অবশেষে তার অংকিত কতকগুলি অতি আধুনিক চিত্রকলা দেখিয়ে এদের চমৎকৃত করবার আয়োজন করলে। ছবিগুলি একের পর একটি দেখিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলে। আলম ও মতিন বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলে। তারা বুঝতে পারলো না সেগুলি কতকগুলি তুলির টানের সমষ্টি অথবা অন্য কিছু। কালির কয়েকটি রেখাচিত্র। তার ব্যাখ্যা করা হলো—ক্ষুধাতুর ক্ষুব্ধ জনতার ফরিয়াদ। চমৎকার! মতিন ও আলম চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে চিত্রকলা সম্পর্কে অভিনব জ্ঞানলাভ করতে লাগলো।

অবশেষে বিদায় গ্রহণের পালা। আলম ও মতিন শিল্পীর নিকটে অপর একদিন আসবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

মতিন বললে ঃ তোমার চাকুরির জন্য চলো সেই সেক্রেটারীর বাড়ী।

আলম দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জবাব দিলে ঃ আজ থাক মতিন, আর একদিন আসবো। দুজনে বাক্যালাপ করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে চললো! একটা রিক্‌শা পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলোই মতিন বললেঃ এই রিক্‌শায় তবে উঠে পড়ো। এবারে আমার অফিসে যাবার আয়োজন করতে হবে।

আলম কুণ্ঠিত হয়ে বললে ঃ তোমাকে বড়ই কষ্ট দিলাম ভাই, কিছু মনে কোরো না। আচ্ছা চলি তবে। রিক্‌শায় চেপে বসলে।

মতিন হেসে বললে ঃ আমার সঙ্গে ভদ্রতা! আর একদিন এসো আলম। আলম মুখ ফিরিয়ে হাসলে। জবাব দিলে ঃ আচ্ছা।

গাড়ী চলতে শুরু করলে। এইবারে আলম সজ্ঞানে ফিরে এলো। রিক্‌শায় চড়বার মতো বিলাসিতা তার জন্য নয়।

মতিনের সম্মান রক্ষার জন্যই সে তার অনুরোধ পালন করছে। গতকাল মতিনের দেওয়া পাঁচটা টাকার কিছুটা খরচ হয়েছে, তা' থেকেই রিক্‌শা ভাড়াটা তাকে দিতে হবে। আলমের মনটা বিষণ্ন হয়ে এলো। পথের মোড়ে পেঁছিতেই সে গাড়ীটা থামালো। তারপর একটা সিকি রিক্‌শাওয়ালার হাতে দিয়ে ডান দিকে পথ ধরে সে চলা শুরু করলো।

আলমের মনে ঝঞ্ঝা। এইমাত্র সে কী দেখে এলো। যারা তারই মতন অতি সাধারণ শ্রেণীর ছিলো—এই কয় বছরের মধ্যে যেন অন্য জগতের জীব হয়ে গেছে। ভাগ্য যেন প্রসন্ন মনে তাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছে। শুধু সেই বঞ্চিত—সে-ই হতভাগ্য। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে তার সর্ব অঙ্গ জর্জরিত। পরনের বস্ত্র জীর্ণ মলিন—ভবিষ্যত আশ্বাস বিহীন। এক মুঠি অন্নের জন্য পথে পথে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরছে। এই দুর্ভোগ আর কতকাল তাকে সহ্য করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের ক্লিষ্ট মুখগুলো তার মানস সম্মুখে ভেসে উঠলো। বক্ষপঞ্জর ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে গেল। চোখ দুটি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এলো। অতি বেদনার সঙ্গে সে মনে মনে উচ্চারণ করলে ঃ প্রভু! সবারে দিয়েছো ঘর—আমারে দিয়েছো শুধু পথ।

আর কারো কাছে সে যাবে না। চাকুরির জন্য সে আর ছুটোছুটি করবে না। আপনার স্বাতন্ত্র্যে সে স্বকীয় আসন তৈরি করে নেবে। তার যা বিদ্যা এবং বুদ্ধির মূলধন আছে, তার উপরে নির্ভর করে সে অর্থোপার্জন করবার চেষ্টা করবে। এ পথ তার কাছে উন্মুক্ত। ঐ পথে সে বিশাল বিশ্বের মাঝখানে স্থান করে নেবে। খোদা তাকে সাহায্য করবেন।

# আপনদলের মানুষ

## নির্মলেন্দু গুণ

বি-এ পাশ করে এর চেয়ে ভালো কাজ পাওয়া যায় না তা নয়, সুকুমার যে ইচ্ছা করলে এর চেয়ে ভালো চাকরি পেতে পারতো না তাও সত্য নয়। এ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে সাব-এডিটরের চাকরিতে যোগ দিতে পারতো একটি বে-সরকারী পত্রিকায়, সাভারের কাছে একটি স্কুলে মাস্টারী নিতে পারতো। বি-এ পাশটাকে গোপন করে আই-এস-সি'র সার্টিফিকেটে সেনাবাহিনীতে যাওয়া যেত, কেননা সেনাবাহিনীতে ঢুকতে হলে বুকের মাপ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শারীরিক উচ্চতা যতটুকু দরকার সুকুমারের সেগুলো যথাক্রমে তিন ইঞ্চি, এক ডিভিশন ও ছয় ইঞ্চি বেশীই ছিল। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে লোভনীয় অন্য তিনটির একটিতেও যোগ না দিয়ে একটি সরকারী দৈনিকের প্রুফ-রিডিংয়ের কাজে যোগ দিলো সে। অন্য চাকরির মধ্যে সেনাবাহিনীর কথা একবার বেশী করেই ভেবেছিল কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তার কিছুই আনন্দ নেই যতটা আনন্দ নজরুলকে সৈনিকের বেশে দেখতে। দেশকে শত্রুর হাত বাঁচাতে বড়জোর হত্যাকারী হলে হতেও পারে কিন্তু নিহত হতে রাজী নয় কিছুতেই। মিলিটারীতে চাকরি করা তার সম্ভব নয়। আজিমপুরের কাছ দিয়ে হাঁটতে গেলেই মুখোমুখি আর্মি রিক্রুটিং সেন্টারের সামনেই যে ইডেন কলেজের ছাত্রী-বাস, সেই ছাত্রীবাসের সাথে পরস্পরের জন্মগত বিরোধ তাড়িত করত তাকে। রমণী-তাড়িত বাতাসে কানেকানে পরামর্শ দিতো সুকুমারকে সেনাবাহিনীতে যাবেন না, এই চাকরিতে ছুটি কম, আপনাকে হাফপ্যান্ট পড়তে হবে। সুকুমার যে কেবল এইসব কু-পরামর্শেই কাতর হতো তা নয় সেনাবাহিনীতে লোকে যে কোন সময়ে মরে যেতে পারে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয় প্রতি মুহূর্তেই, এই একমাত্র মৃত্যুর ভয়েই সেই ক্ষণিক বাসনার কাছে সমর্পিত হলো না কোন দিন। স্কুল মাস্টারের চাকরি নিলে ঢাকা ছাড়তে হতো, সাব-এডিটরের চাকরি নিতে হলে কয়েকজন অপ্রিয় লোকের মৌখিক প্রশংসা করতে হতো তাই অবশেষে আত্মনির্ভর এই কম্পোজ সংশোধনীর কাজ নিল সুকুমার।

চিঠি পেয়ে সুকুমারের বাবা রজনী সরকার বাজার থেকে আস্ত ইলিশ কিনে আনলেন, ছেলের সুমতি হয়েছে বলে নষ্টশনির পূজা দিলেন মা

শোভাময়ী। ছোট দুভাই কলেজ থেকে ফিরেই চাকরির সুসংবাদ পেয়ে শব্দ করে সিটি বাজালো। এবার আর মিস করছিনে তাহলে। ঢাকা গিয়ে ক্রিকেট খেলা না দেখলে শলার কোনই জুত নেই। রেডিওতে কিছুই বুঝা যায় না, শোনা গেল উইকেট পড়লো, কিন্তু কিভাবে পড়লো তা দেখা যায় না, পতনকে দেখতে চাই। ছেলে চাকরি পেয়েছে, তাও যে সে চাকরি নয় পত্রিকার সাব-এডিটর মানে সম্পাদকের নিচেই। বাবা রক ছেড়ে ব্রিস্টলের ধোঁয়ায় দৌড়ে গেলেন।

অথচ মিথ্যে না লিখেও উপায় ছিল না সুকুমারের। বাস্তবে ছোট হতে যাদের বাধে না কিন্তু কল্পনা নামক স্বপ্নকে অপমান করতে যারা ভয় পায়— সুকুমার সেই সব মিথ্যেবাদীদের দলের মানুষ। সুতরাং প্রুফরিডারকে সাব-এডিটর বলে চালানো গত দুবছরের অনুশীলনের কাছে এমন কিছু গর্হিত কাজ নয়। তাছাড়া পত্র-পত্রিকায় তার প্রচুর লেখা বেরোয় বলে সব প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার। সুকুমার মাঝে মাঝে এদের কাউকে কাউকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতো, সুকুমারের নির্দেশ-মতো ওরা রজনীবাবুর কাছে চাকরির সত্যতা গোপন করতো। দেশের বাড়ীর সবাই জানতো সুকুমার সাহিত্যিক এবং পত্রিকার লোক সম্মানী এবং প্রতিপত্তিশালী যুবক।

প্রথমটি অসত্য ত নয়। নিজের লেখার প্রতি যতই অবহেলা থাক, সুকুমারের লেখার ভিতরে এমন একটা স্বাভাবিক স্বকীয় সৌন্দর্য ছিল যা অনেক শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত লেখকের ছিল না, দ্বিতীয়টি অর্থগত দিক হইতে ভুল নয় কিন্তু তৃতীয়টি সুকুমারের কোন কালেই ছিল না। অথচ প্রতিপত্তিকে আয়ত্তে আনার জন্যে মিথ্যের অনুশীলন তার জীবনে প্রতিকৃতি এঁকেছে বার বার। নিজের দৈন্যতাকে উপলব্ধি করেছে বার বার, অভাব নিজের শরীর দিয়ে অনুভব করেছে, অক্ষমতাকে দেখেছে চোখে চোখে কিন্তু স্বীকার করেনি কোনদিন। পেটে ভাত নেই বলেই পিঠে কাপড় থাকবে না এরকম পরিণতিতে বিশ্বেস করেনি সে, পকেটে পয়সা নেই বলেই কম দামের সিগারেট ফুঁকবে, এরকম বেরসিক সুকুমার হতে পারলো না বলেই জীবনে অনেক মিথ্যের আশ্রয় নিতে হলো। অনেক আড়ম্বর দিয়ে জীবনের অনাড়ম্বর-শূন্যতাকে লেফাফাদুরস্ত বাবুর মতো একটি থ্রি ক্যাসেলের প্যাকেট থেকে দুমড়ানো ক্যাপস্টান এনে মুখে জ্বালাতে জ্বালাতে কোনো বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে যখন বলতো 'কেমন আছিস?' পরবর্তী প্রশ্নটিই 'কিছু টাকা প্রয়োজন ছিল' জেনেও তার বলিষ্ঠ মুখাবয়ব এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তির দিকে চেয়ে কোন বন্ধবই বলতে পারতো না ভাল নেই। ফলে যতদিন চাকরি পায়নি ততদিন চাকরির মতন হীনতাকে পথে ঘাটে আড্ডায় রেস্তরাঁয় ব্যঙ্গ করতে পেরেছে,

আঙুলে তুড়ি মেরে সিগরেট ফুঁকছে, চা খেয়েছে কাপের পর কাপ আর মেয়েদের মন এবং নগ্ন দেহ নিয়ে বিজ্ঞের মতো অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক রচনা শুনিয়েছে চতুর্দিকে। কিন্তু উপার্জন নেই বলেই অন্নহীন অন্য দশটি মানুষের মতো অবহেলিত হয়নি কোথাও, খাবার পয়সা নেই বলে কার কাছে বনেদী হাতকে লজ্জিত করতে পারেনি। 'চল আজকে দমস খাবো'। দমস মানেই মদ সুকুমার মদকে সকলের সামনে উচ্চারণের সুবিধের জন্যে আসলে শব্দটি উলটিয়ে, পালটিয়ে শব্দের শেষে একটি অনাবশ্যক 'স' লাগিয়ে এই নামটিকে বন্ধুদের মাঝে চালু করেছিল। এতে সুবিধে ছিলো দুরকম, প্রথমত একটি নতুন শব্দের আমেজ পাওয়া যেন, দ্বিতীয়ত মদের নামে আঁতকে উঠতো যারা তারাও অজ্ঞতাকে স্বীকার না করে বিজ্ঞের মতো সমর্থন করে ফেলতো সেই প্রস্তাব। অবিবাহিত তরুণী ও গুরুজনদের ফাঁকি দেওয়া যেত উপরন্তু। টাকা নেই বলে বন্ধুটি রাজী না হলেও ইচ্ছে করেছে অথচ মদ্যপান করতে পারেনি সুকুমারের এমন অর্থহীন রাত খুব কম কেটেছিল। টাকার অভাবে একটা মেয়ে হাতছাড়া হয়ে অন্যের হাতে ফিরে যাবে সুকুমার সেটা প্রায় হতে দেয়নি অথচ সেই অপরাজিত সুকুমার অবশেষে যখন পত্রিকায় প্রুফ রিডিংয়ের কাজ নিলো বন্ধুরা অবাক না হয়ে পরলো না। মাইনে কম অথচ নিম্নশ্রেণীর এ ধরনের দীর্ঘক্ষণিক কাজে নিযুক্তিপত্র নিয়ে সুকুমার যেদিন পত্রিকার অফিসে সত্যি সত্যিই যোগদান করলো অন্যান্য প্রুফরিডারেরা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি সুকুমার কালকেও আসবে।

কিন্তু সুকুমার টিঁকে গেলো। কালকে ও আসলো, কালকেও এবং অদ্যাবধি বাড়ি থেকে ঘন ঘন চিঠি আসছে সুকুমারের কাছে। বাবার চিঠিতে কেবল চাকরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াটাও চালিয়ে যাবার উপদেশ. মায়ের চিঠিতে আনন্দের ছোঁয়া —এ চাকরিটা কিছুতেই ছাড়িও না, তোমার বাবা দিন দিন বুড়ো হইয়া যাইতেছেন, সংসারের দায়িত্বটি তোমার কাঁধে আসিবে। সুকুমার চিঠি পেয়ে হাসতো, একটি সংসারের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ততা কি করে যে মিথ্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে সুকুমার সে ভেবে ভেবে হাসতো। তৃতীয় মাসের অর্ধেক একশ টাকার একটি নোট বাড়ীতে পাঠানোর পর লেখার বিল সহ আরও প্রায় শ' দেড়েক টাকা কচকচ করে কিছুদিন সুকুমারের হাতে দৌড়াদৌড়ি করেছিল। মহকুমা শহরে সুকুমারের চিঠি গেলো সঙ্গে সঙ্গে 'সাবএডিটরের চাকরিটা নিয়ে নিলুম'। চাকরিটা অবশ্য বাবাকে জানানোর দু' মাস আগে থেকেই শুরু আপাতত শ' চারেক দিচ্ছে পরে কিছুদিনের মধ্যেই বাড়বে। তাছাড়া প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা। বিদেশে যাবার সুযোগ সুবিধে আছে। একশ টাকা পাঠালুম, একটা বাসা নিয়েছি তার জন্যে একশ টাকা দিতে হচ্ছে খুব সুন্দর বাড়ীটা, স্টেট ব্যাঙ্কের পেছনেই

দুতালা ফ্লাট। নিচুতলায় একজন ইঞ্জিনীয়ার থাকেন, আমরা দুজনে থাকি। উপরে অন্যজন সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপক। এমন সুন্দর বাসা হয় না। পূর্বদিকে চাইলেই সবুজ ধান খেতে সূর্য ওঠার আকাশ, ঝিলের জল দেখা যায়, কিন্তু পশ্চিমদিকেই বিশাল শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য এলাকা মতিঝিল। এরকম বিপরীত সমাবেশে আমি টবে গোলাপ ও নাইন-ও'ক্লকের বাগান করেছি। তুমি কল্পনা করতেও পারবে না আমি এত সংসারী হলুম কি করে। একটি কাঁঠাল কাঠের খাট ও বই রাখার জন্যে এডভান্স নিয়ে একটা আলমিরা কিনে ফেললুম। আমি এসে তোমাদের নিয়ে আসবো একবার।...আরও কি কি সব কল্পনার রঙ লাগিয়ে হাজারটা মিথ্যে লিখেছিল সুকুমার, বাবা মাকে আনন্দ দেবার জন্যে। এই অনাবশ্যক মিথ্যাচার পরবর্তী-কালে একবার খারাপ লাগলেও অনায়াসে ভুলে যেতে তার বেগ পেতে হয়নি একটুও।

'তোর বাবার সাথে যোগাযোগ নেই'

'না'।

'কিন্তু যোগাযোগ থাকাটা উচিত ছিল।এভাবে কষ্ট করে কেবল সাহিত্য করে আমাদের দেশে কিছুতেই চলা সম্ভব নয়।' প্রতিবাদে কতগুলো মূর্খ বদমাশ সাহিত্য সম্পাদকের বিকৃত অশিক্ষিত মুখাবয়ব ভেসে উঠেছিল তার চোখে, তাদের উদ্দেশ্যে এক গাল থুথু ছিটিয়ে বললো সুকুমার। 'হুম, ইচ্ছে করলেই টাকা নিতে পারি, কিন্তু তুই তো জানিস আমার বাবার রক্তে এখনও সেই বুর্জোয়া জমিদারীর নেশা লেগে আছে আমি যাকে ঘৃণা করে প্রতিবাদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না।' অগত্যা জাহাঙ্গীর একটি মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত জমিদারপুত্রের প্রতিজ্ঞা পালনে সুকুমারের বাসস্থান হিসেবে তার বাড়ীর দোতলার চিলে কোঠাটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বন্ধুরা সবাই জেনেছে সুকুমারের বাবা এককালে বিশাল জমিদার, সুকুমার তার ত্যজ্যপুত্র কবিতা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে বিতাড়িত হয়ে শহরের সূর্যলগ্ন পথচারি। অনেকের বন্ধু, অনেকের শত্রু, অনেকের নামে চেনা অনেকের অজানা একজন মানুষ। উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত অর্থবান ব্যক্তি মাত্রই ভালো কবিতা লেখেন না অথচ কবি হবার লেলিহান বাসনায় দিনরাত তাড়িত হন। বিজ্ঞের ভান করে মূর্খের মতো ধারে না কাটলেও ভারে কাটাতে চান শিল্পকে। সেইসব লোকদের গাড়ী করে বেড়াতে বেরোয় বলে পরিচিত হোটেলের মালিক বাকিতে ভাত খাওয়াতে ভয় করে না তাকে। কবিতা পড়ে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে ধরা যায় না বলে অনেক উচ্চশ্রেণীর অনুষ্ঠানের দাওয়াতে আসে সুকুমারের নামে। ফলে সমাজের অনেক উঁচু থেকে অনেক নিচু খাদে তার

যাতায়াত চলে অনায়াসে। কবিদের কাছে সে কবি, মাহবুব হালি ইনস্টিটিউটে মাতাল মদখেয়ে জুয়োর আড্ডায় সে নিকৃষ্টতম জুয়ারী, বেশ্যাপাড়ায় সে নির্লজ্জ বেহায়া বাকীতে রাত্রি কাটাতে সমর্থক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে সে রাজনৈতিক কর্মী, উঠতি তরুণ কবি, বাবার কাছে, আত্মীয়, প্রকৃত পরিচয় যারা জানে তাদের কাছে অপদার্থ সন্তান, মায়ের কাছে কেন পেটে ধরেছিলুম ইত্যাদি আক্ষেপ, ভাইদের কাছে অন্যায়ের অজুহাত আর বোনেদের কাছে সে বিকৃত যৌনাচারী, পারভার্টেড।

ফলে কথা দিলেই কথা রাখতে হবে এই নীতিতে সুকুমার যেমন বিশ্বাসী নয় তেমনি কথা দিয়েছে বলেই তার কথায় নির্ভরশীল হয়ে থাকবার মতো মূর্খতা রজনীবাবু কিংবা তার মা শোভাময়ী কারোই ছিল না। তবুও সুকুমার যখন 'একশ' টাকাসহ চাকরির সংবাদ জানিয়ে বাবাকে চিঠি দিলো রজনী সরকার কেন জানি পুত্রের পত্র পাঠে একটি পরম নির্ভরতা খুঁজে পেলেন। বাজার থেকে আস্ত ইলিশ মাছ কিনে আনলেন, শোভাময়ী অলক্ষ্মী শনির পুজো দিলেন তুলসীতলায়—অথচ পরের মাসে পিয়োন এলো না রজনী সরকারের নামে। 'আমি জানতুম ও চাকরি ছেড়ে দেবে।' শোভাময়ীর চোখ ছলছল করে উঠলো। অগত্যা পাশের বাড়ীর রেডিওতেই ক্রিকেটের ধারা-বিবরণী শোনার বন্দোবস্ত করলো শ্যামল আর ঝন্টু। বইয়ের তাক থেকে বিশ্ববিখ্যাত আরটিসটের 'Nude' ছবির collectionটা টেনে এনে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলেই চীৎকার করে উঠলো শিবানী 'এইসব বই যার নিশ্চয় তার ওপর নির্ভর করা যায় না বাবা।' রজনী সরকার একথার কোন উত্তর না দিয়েই ঘর থেকে উঠে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসলেন, তার চোখে একটি অনিশ্চিত অনির্ভরতা পাখীর মতো ক্লান্ত ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চোখের কাছ দিয়ে নাকের ডগা বেয়ে টপটপ করে ঘুমের মালা গেঁথে যেতে থাকলো।

আয়ুব সরকারের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশব্যাপী তখন তুমুল করা হলো পথে পথে, কিন্তু বন্দুক যখন জনতার হাতে চলে এলো আগুন আন্দোলন। ঢাকা সেই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। প্রথমে ১৪৪ ধারা জারি করা হলো পথে পথে, কিন্তু বন্দুক যখন জনতার হাতে চলে এলো আগুন তখন তার উন্মত্ত রক্তকে ছড়িয়ে দিয়েছে শহরের প্রতিটি লাল ইঁটের অভ্যন্তরে। পুলিসের গুলিতে মানুষ মরছে, মানুষের চাপে মরছে পুলিস। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র মরলো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির 'Rest House'-এ আগুন জ্বললো। মন্ত্রীদের বাসায় দমকলের ভাঙা গাড়ি মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকলো বলদের মতো, গ্রামে গ্রামান্তরে প্রতিবাদী মানুষের হাতে বাধা পড়লো পূর্ববাংলার পলিমাটি।

অবশেষে আগুন জ্বললো কুচক্রীদের চিহ্নিত সবগুলো আড্ডায়। প্রেস

ট্রাস্টের বিল্ডিং থেকে অগ্নির লাল গালিচায় হেঁটে রাজপথে মানুষের ভিড়ে নেমে এলো সুকুমার। সান্ধ্য আইন জারি করা হলো, সেনাবাহিনী মোতায়েন হলো শহরের বিধ্বস্ত এলাকায়, সুকুমারদের পত্রিকার পোড়া অফিস তখন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। সুকুমারের চিঠি গেলো রজনী সরকারের কাছে।

টাকা পাঠানো আর কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি পত্রিকা পড়ে থাকে কিংবা কলকাতার রেডিও শুনে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই জেনেছো প্রেস ট্রাস্টের বিল্ডিংয়ে মানুষ অগণতান্ত্রিক সরকারী প্রচারের প্রতিবাদে আগুন জ্বালিয়েছে। কোনক্রমে আমরা যারা এর চাকুরে বেঁচে গেছি। সরকার সমর্থক বলে কেবল আগুনেই ক্ষান্ত হয়নি ছাপার মেশিনগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে উৎক্ষিপ্ত জনতা যাতে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো আবার গণস্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিতে না পারে। সবচেয়ে বনেদী এভিনিউ গর্বিত ভবনটির চারিদিকে এখন কেবল পোড়া কাগজের গন্ধ, সীসার আগুন। সেই আগুনের লেলিহান দৃশ্যটি তোমাকে বোঝানো যাবে না। ধরে নাও তুমি জীবনে যত বড়ো অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখেছো এ আগুন তার চেয়ে বড়ো না হয়ে যায় না। বার্মিংহামকে নাকি ধোঁয়ার শহর বলা হয় আমার ঢাকাকে এখন মনে হয় বার্মিংহাম, প্রতিক্রিয়াশীলদের বাড়িঘরগুলোই যে ধোঁয়ার উপাদান। বাবার দৃষ্টিকে অন্যদিকে পরিচালিত করার জন্যেই একটু অনাবশ্যক অগ্নিদৃশ্যের বর্ণনা দিলো সুকুমার।

'যাহোক' আমি ভালই আছি যদিও প্রতিদিনই মানুষ মরছে চারিদিকে তবুও আমি খুব সাবধানে থাকছি বলেই আমার খুব ক্ষতি হয়নি। আমি কোন প্রতিবাদের মিছিলে যাই না সুতরাং গুলিতে মরার ভয় নাই, আর অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে জানাশোনা থাকায় ট্রাস্টের পত্রিকার লোক ভাবে পুলিসের হাতে গ্রেফ্‌তারের সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।

পত্রিকা যদি আর না বেরোয় তাহলে অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করবো।

ইতি—প্রণতঃ সুকু।

চিঠি পেয়ে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়লেও এত মৃত্যুর দিনেও ছেলেটি বেঁচে আছে বলে সুকুমারের প্রশংসা না করে পারলেন না রজনী সরকার। শোভাময়ী তার কপালকে দোষ দিলেন। শ্যামল আর ঝণ্টু যারা স্থানীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য তারা তার সুযোগ্য ভাইয়ের এই প্রতিক্রিয়াশীল আত্মরক্ষার নীতিকে সমর্থন করতে পারলো না কিছুতেই। শিবানী চিরকাল যৌক্তিক তাই ভেবেচিন্তে শিবানী বললো, তাতে কি? প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা সরকারের ব্যাপার না বেরুলেও বেতন সে পাবেই। কিন্তু বেতন পেয়েও সুকুমার যখন বাড়ীর ঠিকানায় টাকা পাঠালো না রজনী সরকার তখন টাকার জন্যে নয়

ছেলের কুশল সংবাদ জানার জন্যেই অস্থির হয়ে মতিঝিলের ঠিকানায় চিঠি দিলেন।

বন্ধুর মাধ্যমে সেই চিঠে হাতে পেয়েও উত্তর দিলো না সুকুমার। যথারীতি টাকা পেয়েও অগ্নিকাণ্ডের সুযোগকে যুক্তি হিসাবে নিয়ে টাকা পাঠালো না বাড়ীতে। ভালো আছি লিখতে গেলে লিখতে হয় টাকা পাইনি, বেতন পেয়েছি বললে টাকাও পাঠাতে হয় তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতাকে কুশল জানানো হলো না তার। পত্রের কোনই উত্তর না পেয়ে দুর্ঘটনার অন্ধকার পিতামাতা ভাইবোনের সামান্য আয়ের সংসার দুর্ভাবনায় কেঁপে উঠলো। রজনী সরকার পুত্রের খোঁজ করার জন্যে যখন একা একা ঢাকা আসার কথা ভাবছেন ঠিক তখন ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হলো। রেসকোর্সের দশ লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে শেখ মুজিব প্রেস ট্রাস্টের বিলুপ্তির দাবী করলেন, অথচ সুকুমারের চিঠি এলো না।

প্রথম মাসের টাকার যে কাপড়ের প্যান্ট বানাল সুকুমার সেই একই কাপড়ের কোট বানিয়ে কমপ্লিট স্যুটিং করল পঞ্চম মাসে। বিপ্লব দিবসের সংখ্যায় কবিতা লিখে যে টাকা পেল তা দিয়ে টাই কিনলো নুমার্কেট থেকে। সুকুমার অবশ্য এত টাকায় টাই কিনতে রাজী হয়নি প্রথমে, একটি পাঁচ টাকার নোট মনিব্যাগ থেকে বের করে দিতে গিয়ে বাবার কথা একটি আলোর পোকার মত কপালের চামড়ায় ঝাপটা দিয়ে উড়ে গিয়েছিল চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু সেই ক্ষণিক দুর্বলতার হাত থেকে সুকুমারকে টেনে আনলো উত্তরা, 'কি হলো ?'

'কই কিছু না তো ?'

'কি যেন ভাবছিলে মনে হচ্ছে, জানো সেলসম্যানটা তোমার চোখের ভাব দেখে হাসলো।'

'হাসলো ?' পাশাপাশি অনর্থক হাঁটতে-হাঁটতে উত্তরাকে প্রশ্ন করলো সুকুমার, 'ও হাসলো কেন বলতে পারো ?'

'হয়ত ভেবেছে আমার পছন্দের দাম দিতে গিয়ে তুমি বিপর্যস্ত হয়েছো অথচ অক্ষমতাকে অন্যমনস্কতার আড়ালে গলার টাইয়ের মতো বাঁধতেই হলো তোমাকে।'

'জানো উত্তরা', সুকুমারের গলাটা অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উচ্চারিত হওয়াতে কয়েকটা ছোকরা বয়সী ছেলে পিছন ফিরে সুকুমার এবং পাশাপাশি উত্তরাকে মিলিয়ে দেখলো। দূরে থেকে একজন শুনিয়ে-শুনিয়ে উচ্চারণ করলো।

'উত্তরা, ভারী সুন্দর নাম তো।'

'দেখলে ?'

'কি?'

'ছেলেগুলো তোমার নামও জেনে গেলো।'

'জানলোই বা তাতে কি?' সুন্দর করে হাসলো উত্তরা, পেছনে ফিরে ছেলেগুলোকে দেখতে চাইলো অন্যমনস্কভাবে। ছেলেগুলো তখনও দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের—সুকুমারের নারীভাগ্য এবং উত্তরার আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে আলাদা করে মিলিয়ে দেখছিলো। গর্বিত হলো সুকুমার, মোড় ঘুরেই বইপত্রের দোকান। একটা বুকস্টলে পত্রিকার কভারে ছবি ছিলো সুকুমারের, পত্রিকাটি ক্লিপ দিয়ে লটকানো ছিলো দরোজার লোহায়। সেটার দিকে আঙ্গুল তুলে উত্তরা বললো, 'তোমার ছবি, ইস কেমন বিমর্ষ; যেন সব সময়েই টাই কিনছো।'

'টাই নয় ছাই।' হেসে উত্তর দিলো সুকুমার 'ছাই কিনেছি।'

'ঠিক আছে তাই।' টাইকে ছাইয়ের সাথে তুলনা করে উত্তরার পছন্দকেই ব্যঙ্গ করেছে ভেবে যদিও অভিমান করেই তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল উত্তরা, সুকুমার কিন্তু সেই আক্রান্ত অভিমানকে মুহূর্তেই অট্টহাসিতে উড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ করে মুখোমুখি দাঁড়ালো। চোখে চোখে, উত্তরার কাঁধে হাত রেখে বললো। 'দেখলে আমরা দুজনে একটি কবিতা লিখে ফেললুম।'

চেনা-অচেনা কেউ-ই এরকম রোমান্টিক দৃশ্যে তাদের দিকে না তাকিয়ে পারে না। উত্তরা যদিও হাসলো সুকুমারকে খুশী করার জন্যে কিন্তু সুকুমার দেখলো উত্তরার গায়ে লজ্জার লাল ঢেউ লেগে আছে, চোখের পাতা কেমন ঘুমের মতো নেমে আসছে নীচের দিকে। সন্ধ্যার বাতাসে কালো চুলের সঙ্গে উড়ছে অভিমান। ডান দিকে মোড় নিয়ে ভিতরে যেখানে পার্ক সেদিকেই তখন হেঁটে গেল দুজনে। 'কিন্তু কবিতাটি মোটেই ভালো হয় নি'—ক্ষীণ কণ্ঠে বললো উত্তরা 'টাটর-টুপুরে ছাপার মতো।' প্রেমের কবিতা এর চেয়ে কিই এমন ভালো হয় বলো।'

যেহেতু কাফে দ্য লিবার্টির বেয়ারাগুলো তাকে আদাব ঠুকতো সুকুমার তাই উত্তরাকে নিয়ে সেই রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। ভেজিটেবলের চপ খেয়ে চায়ের অর্ডার দিলো সুকুমার। পটের ঢাকনা খুলে চায়ের জলে এক চামচ চিনি ঢেলে দিয়ে নাড়া দিলো উত্তরা, হাত নাড়ার সময় ব্লাউজের উপর থেকে শাড়ির আঁচল সরে গিয়েছিল, সুকুমার সেই অরক্ষিত ব্লাউজের উপর থেকে শাড়ির আঁচলের প্রতিশ্রুতিশীল যৌবনকে নড়তে দেখলো। দুইটি যেখান থেকে শুরু সেই উৎসমুখের উদ্ভাসকে চেয়ে দেখতেই আঁচলটাকে ব্লাউজের উপর টেনে এনে হেসে ফেললা উত্তরা, 'আগে চিনি দিয়ে নাড়লেই পাতা থেকে সবটুকু রস বেরিয়ে যায়।' সুকুমার নিজেও সেটা এত বেশী ভাল করে জানতো যে, সে না হেসে পারলো না।

অপ্রস্তুত চোখ দুটোকে ফ্যানের পাখায় নিক্ষেপ করে বলল, জানি।

উত্তরা কোন কথা না বলে কাপে চামচ দিয়ে আবার চিনি দিলো, চায়ের লিকার ঢাললো, তারপর পট থেকে দুধ ঢেলে কাপের ভিতর চামচ দিয়ে নাড়লো আবার কাপের ভিতর খিলখিল করে সুস্থ শিশুর মতো ফুটে উঠলো। চায়ে চুমুক দিয়েই সুকুমার বললো 'জানো চায়ের উপর একটি কবিতা লিখেছিলুম। আমার এখন স্পষ্ট মনে নেই।' 'দু-একটা লাইন নিশ্চয়ই মনে আছে।' উত্তরার চোখে-মুখে হাসি।

কবিতার ব্যাপারে উত্তরার কাছে কোনই লজ্জা ছিল না সুকুমারের তাই যা মনে ছিলো তাই আবৃত্তি করলো সে।

গর্ভবতী নারীদের উদরে
শিশুর মতো টীব্যাগ
তোমার আঙ্গুলে নড়ে
কাপ ভর্তি জলের সংসার...

...কাপ ভর্তি জলের সংসার...তারপর আরও কি-কি যেন আছে, যা হোক—শেষ লাইনগুলো এরকম...প্লেটের উপরে কাপ এবং চামচ।

'সযত্নে সাজালে তুমি ঘন অন্ধকারে, চিনি দিলে দু চামচ হত্যাকারী ভালবাসা হানা দিন আমাদের বিনষ্ট সংসারে।'

সবটুকু চা খাবার আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল দুজনেরই কাপ। কবিতা শুনে উত্তরা বললো—'বিশ্বাস করি না, এখন আমাকে চা বানাতে দিয়ে কবিতা বানিয়েছ তুমি'। অগত্যা ঘটনাটা যে তাৎক্ষণিক নয় সেটা প্রমাণ করার জন্যেই পকেট থেকে নোট বই বের করতে হেলো সুকুমারকে। দেখলো অনেক আগের লেখা এ কবিতা, পড়লো উত্তরা। তারপর দুজনেই হাসলো জোরে জোরে।

'তুমি তো চিনি অনেক বেশী নিলে।'

'কবিতায় দু চামচ না হলে ছ চামচ কিম্বা ন চামচ নিতে হতো, তাহলে চা হয়ে যেত সরবত।'

'এঁরা কারা?'

'এই যা তোমাকে বলাই হয় নি এটা আমাদের, আমার শৈশবের তোলা ছবি।'

অনায়াসে অতর্কিতে সত্য কথাটা খুব সহজেই অন্যমনস্কতায় বেরিয়ে গেল সুকুমারের মুখ থেকে।

ছবিটাতে মোট তিনজন বিবাহিত পুরুষ, তিনজনের তিনজন বিবাহিতা স্ত্রী মোট তিনটি ছেলে ও দুইটি মেয়ের ছবি ছিল। পেছনের সারিতে তিনজন দাঁড়ানো, বামদিক থেকে যথাক্রমে সুকুমারের বাবা তার ছোটমামা ও বড়মামা। মাঝখানের সারিতে মা ছোটমামী ও বড়মামী চেয়ারে বসে। তার মায়ের কোলে

সবচেয়ে ছোট বোন শিবানী। নীচে মাটিতে বসে সর্ববামে চার বছরের সুকুমার নিজে, মাঝখানে ছোটমামীর পায়ের গোড়ায় তার বড় ভাই, সর্বডানে তার রোগা বড় বোন। ছোটমামীর কোনই ছেলে-মেয়ে ছিল না; বড়মামীর কোলে মাথা রেখে তার মামাতো ভাইঝি অভিমানী মুখে দাঁড়িয়েছিল। ছবিটা ১৯৫০-এর দিকে তোলা হলেও এ্যালবামে ছিল বলে এখনও বেশ পরিষ্কার রয়েছে। সুকুমার সেই ছবিটাকে কিছু টাকা হলেই রিপ্রিন্ট করে আরো এনলার্জ করবে বলে প্রায় মাস ছয়েক আগে বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিল—আর সে সুযোগ আসে নি। সুযোগ আসলেও ইচ্ছে হয় নি। বন্ধুদের কেউ-কেউ দেখে বলেছিল রেখে দে রেয়ার ফটোগ্রাফ, যতই দিন যাবে ততোই দাম বাড়বে। উত্তরার হাতে সেই ফটো, উনিশ বছর আগের একদিনের ছবি। যে ছবিতে তারা উনিশ বছর আগের একদিনের একটি মুহূর্তে বাঁধা পড়েছে। তার বাবা, তার জন্মদায়িনী মৃতা মা, ভাই-বোন আর মামা-মামীদের ছবি, তার উনিশ বছর আগের বাবা, তার উনিশ বছর আগের জীবিত মা, উনিশ বছর আগের জীবিত স্মৃতির দলিলপত্র—ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলো সুকুমার।

'তুমি কোনটা?'

'আমি?' আমি...সুকুমারের গলাটা একটু কাঁপল। নিজেকে গোপন করে তার বাবা-মাকে গোপন করে উত্তরার সামনে একদিনে যে সুন্দর একক মানুষের একটি বিরাট সংসারের ছবি এ'কে দিয়েছিল উত্তরার হাতে সেই ছবি আজ ধরা পড়ে যাবে? সুকুমারের গলাটা কাঁপলে একটু, 'তুমি বের করতো?'

দুজনেরই চোখ ছবিটির ওপর। তার অশিক্ষিত বাবার অমার্জিত অসুন্দর ছবির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সুকুমার ক্ষমা চাইল 'বাবা আমাকে ক্ষমা করো। ভালবাসার চেয়ে কোনো প্রয়োজনই বড়ো না। ভালবাসার প্রয়োজনে তোমাকে আজ অস্বীকার করবো।'

'এই' বলে উত্তরা সুকুমারের সবচেয়ে অসুন্দর শৈশবের উপর হাতের ব্যগ্র আঙ্গুল রাখলো। উনিশ বছরের ব্যবধানকে অতিক্রম করে উত্তরার সেই কোমল আঙ্গুলের স্পর্শ সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেলো আজকের সুকুমারের মধ্যে, এটা যদি সুকুমার হয়ে থাকে তাহলে তার ঠিক পেছনের রুগ্ন মহিলাটিই যে তার মা তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তার চোখ লাফিয়ে উঠলো সবের চোখে-মুখে, সেই মা আজ আর এখন বেঁচে নেই, সুতরাং কোন দিন জানবেন না আমি একজন প্রেমিকার কাছে তাঁকেও অস্বীকার করেছিলুম একদিন। পিতা-মাতার সম্মিলিত অসুন্দর মুখাবয়ব ও অসুস্থ দেহের উত্তরাধিকার প্রবাহিত হয়েছে বলে সুকুমার মুহূর্তেই পিতা-মাতাকে দণ্ডিত করলো তখন, 'তোমাদেরকে অস্বীকার করাই উচিত।' তোমরা আমাকে

সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও অলৌকিক মেধাবী করে বানাতে পারেনি, অন্য কারো গর্ভে জন্ম নিলে আমি অনেক সুন্দর হতে পারতুম। বরং পরবর্তী কাল তাদের সংসারে যিনি মা হয়ে এলেন সেই শোভাময়ী তিন-তিনটে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিয়েও যৌবনকে অটুট রেখেছেন অদ্যাবধি।

'আমি পারবো না, এটি ছাড়া অন্য কোনটির সঙ্গেই বেশী মিল নেই তোমার।'

হাসলো সুকুমার। শৈশবের সঙ্গে যেখানে অমিল সেইখানেই তো যৌবন। যৌবন তো শৈশবের সব কিছুকেই, সব সত্যকেই অস্বীকার করে উত্তরা। 'মিলিয়ে মিলিয়ে তো আর মানুষকে আবিষ্কার করা যায় না?'

'তাহলে কি করে আবিষ্কার করতে হয় মানুষকে?'

আবিষ্কারের সেই পদ্ধতিটি জানা নেই বলেই না আবিষ্কারের নেশায় মানুষ মানুষকে ভালবাসে, যুবক একটি যুবতীকে পেতে চায়, তোমাকে ভালবেসে তোমাকে আবিষ্কার করতে চাই, হয়ত মিলাতে চাই কারো সঙ্গে যার কিছুই জানি না। অতঃপর সিগারেটে পুনর্বার আগুন জ্বালিয়ে তার ছোট মামী যার চেহারার সঙ্গে উত্তরার অনেকটা অবয়বিক মিল ছিল সেই ছোট মামীর চশমা পরিহিত সুন্দর গোল মুখের ওপর আঙ্গুল রাখলো সুকুমার। চাইলো উত্তরার মুখের দিকে, সুকুমার দুটো মুখকে মিলাতে চাইছে বুঝতে পেরেও না জানার ভান করেই ছবিটার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো উত্তরা।

'আমার মা' সুকুমারের গলা কি আশ্চর্য, কাঁপলো না একটুও।

'তোমার মা এতো সুন্দর?'

সুকুমার কোনই জবাব না দিয়ে তখন তার মায়ের অসুন্দর ছবির দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'এতো সুন্দর নয় বলেই তো অস্বীকার করলুম তাকে।'

তার মায়ের কোলের ছোটবোন শিবানী অবাক বিস্ময়ে তাকালো সুকুমারের দিকে। সুকুমারের একবার মনে হয়েছিল, বিছানায় প্রস্রাব করে দিয়ে শিশুরা যেমন কেঁদে ফেলে শীতে, কিম্বা মুখ থেকে ফিডিং বোতল খুলে গেলে শিশুরা যেমন কাঁদে সুকুমারের বুকের ভিতরে তেমনি একটি শিশু কাঁদছে। সুকুমারের মনে হলো শিবানী কখনো তার দিকে, কখনো মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে দাদা কি পাগল, আমাকে চেনে না, বাবাকে চেনে না, মাকে চিনতে পারলো না, ছোট মামীমাকে মা বললো। সুকুমার অনায়াসে দ্রুততায় তখন পেছনের দিকে আঙ্গুল টেনে নিয়ে বড় মামার কর্মাপ্লটের উপর হাত বুললো, তারপর বড় মামার টাইয়ের কালো নটে আঙ্গুল রেখে বললো, 'আমার বাবা'। পরিবেশটা মিথ্যাচারে কেমন নিঃশব্দ ও নিঃসঙ্গতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কাছেই। সুকুমার সেই সকল সম্ভাবনা

ও দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে বড়মামার টাইয়ের ওপর হাত রাখলো আবার—'টাইটা কে কিনে দিয়েছিলো সেটা কোন দিন জিজ্ঞেস করিনি অবশ্য।' উত্তরা হাসলো, 'বুঝেছি তুমি তাহলে এই'। অভিমান করে ছোটমামীর কোলে মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিলো যে মামাতো ভাইটি মুহূর্তেই সুকুমার সেই ছেলেটির ভিতরে ঢুকে গেলো। দায় মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুকুমার, 'কেমন দেখলে?'

'ভালো, খুব ভালো লাগলো তোমার মা-বাবাকে। তাছাড়া তোমার ছেটেবেলার ছবি দেখলুম। আমি নিশ্চয়ই তখন না জানি কোথায় ছিলুম। তবে আমার কিন্তু মনে হলো তোমার আরও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।'

উত্তরার খিলখিল হাসি টেপের জলের মতো ঝরতে লাগলো কলতলায়। সুকুমার কিছুই উত্তর দিলো না, নীরবতা ছিন্ন হতে হতে গাঢ় সন্ধ্যা নেমে আসলো রেস্তোরাঁয়। অন্ধকারের মধ্যে সুকুমার মা-বাবার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, তখন কান্নায় বিজড়িত একটি দুঃখতম জীবনের গান যেন শুনতে থাকলো সুকুমার 'এর চেয়ে সুন্দর করে বানাতে পারলুম না বলেই তুই আজ অস্বীকার করলি আমাদের?' তোমার বড় মামা কিন্তু বেশ শরৎ-চন্দ্রের নায়কের মতো ধুতি-পাঞ্জাবি, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে গরম চাদর, বেশ আর্টিস্টিক। সুকুমার তার বাবার প্রশংসায় হাসলো, তারপর আক্ষেপ করে মুহূর্তেই মুখ থেকে হাসিকে উড়িয়ে দিয়ে উত্তরার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বললো 'বড়ো দুঃখ হয় উত্তরা, সারাজীবন কষ্ট করলেন বড়মামা, বাবাকে বড়মামা বলে সম্বোধন করতে গিয়ে একটু হোঁচট খেয়েছিল সুকুমার। কিন্তু খুব সহজেই সেটা অতিক্রম করে অনর্গল বড়মামার দুঃখের কাহিনী গড়গড় করে বলে যেতে থাকলো—কোন দিন আনন্দের মুখ দেখলেন না। বড়-ছেলে বাবাকে রেখেই ভারতবাসী হলো। বিয়ে করেছে ভালবেসে, কিন্তু মামাকে জানায়নি। ছোট ছেলেটা একটা বদমাশ, মিথ্যেবাদী ছাড়া কিছু নয়, বড়ো মেয়েটা আজীবন অসুস্থ বলে বিয়ে দিতে পারলেন না। ছোট মেয়েটা অগত্যা নার্সিং ট্রেনিং নিচ্ছে কলকাতায় ছোটমামার কাছ থেকে জীবনের একটা হিল্লে করতে হবে তো? জানো উত্তরা, আমার মাঝে মাঝে বড়মামার কথা ভেবে কান্না পায়, ইচ্ছে হয় বাবার বিশাল সম্পত্তির কিছু অংশ দিয়ে সাহায্য করি তাকে—কিন্তু বাবা কেবল আমার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার নামে সমস্ত সম্পদকে অটুট রাখতে চান। তার ইচ্ছে আমি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে আসি। ইদানিং বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে আর ভালো লাগে না। ভাবছি একটা চাকরি নিয়ে নেবো।

'এখন থেকে অভ্যেস গড়ে তুলতে না পারলে পরে স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে আমায়, কি বলো?

উত্তরা জানে সুকুমার চাকরি করেনি কোনদিন। যার জন্যে চাকরির প্রয়োজন সুকুমারের এককালীন জমিদার বাবা সেই অপর্যাপ্ত অর্থের মালিক বলে কোন-দিন চাকরি করবেও না। সুকুমারের যা কিছু অসচ্ছলতা তার সব কিছুই পিতা-পুত্রের অভিমানপ্রসূত সাময়িকী মাত্র তবুও সুকুমারের চাকরি করা উচিত। উত্তরা বললো 'তেমন ভাগ্য যদি হয় তাহলে না হয় দুজনেই মিলে কবিতা লিখে সারা জীবন উপোস দেবো কিন্তু আমার মনে হয় তোমার বড়মামাকে সাহায্য করার জন্যেই অন্তত পার্ট-টাইম কিছু কাজ করা উচিত।'

বড়মামার প্রতি উত্তরার এ ধরনের দুঃখবোধের কারণকে মিলাতে গিয়ে সুকুমারের মনে পড়লো একদিন মায়ের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে উত্তরাদের বাড়ীতে কেঁদে ফেলেছিলো সে, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উত্তরার চোখেও জল নেমে এসেছিল। 'আমাদের দুজনেরই মা নেই তাই বোধ করি আমারা পরস্পরকে এত ভালবাসতে পেরেছি।' সুকুমার বলেছিল 'আশ্চর্য! একজন পুরুষের কাছে মায়ের মতো ভালবাসা পাওয়া যেকি ভাগ্যের বড়মামা সেই সত্যের আশ্চর্য উদাহরণ হয়ে থাকবেন। মামীমার চেয়ে বড়মামা আমাকে মায়ের মত ভালবেসে বড় করে তুলেছিলেন। আমি মায়ের অভাব ভুলে গিয়েছিলুম। সেই থেকে সুকুমারকে ভালবেসে উত্তরা বড়মামার স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল। আজ তার প্রতিকৃতি তার কোমল অনুভবে আলোড়ন জাগিয়েছে। কিন্তু উত্তরা জানলো না আজ তার সেই স্মৃতি অবয়ব পেয়েছে একটি উজ্জ্বল ভ্রান্তিতে। আজ সেই স্মৃতি কি অপমানে তার জন্মদাতাকে অপমানিত করে গেল।

সুকুমার বলল, 'চল, তোমাকে বাসা অব্দি পেঁছে দিই।'

উঠল দুজনেই।

অনেক সান্ধ আইন শেষে আজকের শহরে সান্ধ্য আইন নেই। তবুও সবাই সকাল-সকাল ঘরে ফেরাব জন্যে ব্যস্ত, কখন কি হয় বলা যায় না। রোজকার মতোই উশৃংখল শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সেনাবাহিনীর সৈনিক।

রাজনৈতিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা সুযোগের সন্ধানে ঘুরছে এদিকসেদিক। সুযোগ পেলেই চিৎকার করে, পথচারীদের জড়ো করে বক্তৃতা দিচ্ছে কেউ-কেউ। জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো, 'আমাদের দেশ, তোমার দেশ বাংলা দেশ বাংলা দেশ' বিচিত্র সব শ্লোগানে কাঁপছে শীতের শহর। এই মুহূর্তে সুকুমারের খারাপ লাগলো উত্তরাকে নিয়ে পথ হাঁটতে, এই সংগ্রাম প্রস্তুতির জন্যে উৎসর্গীকৃত যে রাত, মৃত্যুর নামে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত ছিল যে যৌবনে সুকুমারের সেই যৌবন সীমাবদ্ধ হল একজন যুবতীর ভালবাসায়। এ যেন বিপরীত বসন্তের দিকে হাঁটা। এক-একটি চিৎকার এসে সুকুমারকে তখন হত্যা করতে থাকল।

'এরা কি চায় বল তো?'

'সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন' উত্তর দিল সুকুমার।

'তার মানে?' একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করল উত্তরা।

'মানে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন চায়, দেখছ না বক্তা কেবল কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার দাবির কথা বলছে' সুকুমার কথা শেষ করতে পারে নি, চারদিকে থেকে পুলিসের গাড়ীগুলো এসে ঘিরে ফেলল তাদের, কোনদিক দিয়েই দৌড়বার পথ নেই, পুলিস ভ্যানের হেড লাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় চৌমাথাটা অলিম্পিকের মাঠের মত পরিষ্কার হয়ে উঠল। কোনদিকেই পালানোর পথ না পেয়ে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকল জনতা; ই পি আর-এর গাড়ী থেকে টিয়ার গ্যাসের সেল এসে ফেটে পড়ল সুকুমারের পায়ের কাছে। তারপর এলোপাথারি কাঁদানে গ্যাসের ছড়াছড়ি চলল। পথের মানুষ এগিয়ে এল ইঁট-পাটকেল নিয়ে। রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ চলল পরস্পর। গাড়ীগুলো কাছাকাছি এগিয়ে এল আরও, শোনা গেল গুলির শব্দ, সুকুমার আর উত্তরার চোখের সামনেই ষোল-সতেরো বছরের একটি ছেলে ভাঙা দালানের মত লুটিয়ে পড়ল পথে। পালাতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ল সুকুমার। হোম ইকনমিকস কলেজের ভিতরে আত্মগোপন করল উত্তরা।

মিছিল নিয়ে শহরের প্রতিবাদী মানুষ এগিয়ে গেল নু্যমার্কেটের দিকে, জখম হল খাকি পোশাকের মানুষ, গুলির শব্দে শহর কাঁপতে থাকল থরথর করে। মৃত মানুষের কিছু লাশ থাকল জনতার হাতে, কিছু লাশ আহত ও বন্দী অবস্থায় ফিরে গেল কালো ভ্যানে। পুলিস, ই পি আর-এর গাড়ীগুলো চলে গেলে বিধ্বস্ত নগরের মত, একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মত খালি পড়ে থাকল চার পথের মোড়, কালো পিচে লাগা রক্তের ছিটে দাগ আর সুকুমারের নোট বই।

কলেজের ভিতর থেকে অনেকগুলো মেয়ের সঙ্গে তখন পথে বেরিয়ে এল উত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের নোট নিচ্ছিল একজন পত্রিকার রিপোর্টার। উত্তরা এগিয়ে এল তার দিকে। নিহত কমপক্ষে ছয়জন, আহত কমপক্ষে পঞ্চাশ, গ্রেপ্তার হয়েছে কম করেও একশজন, উত্তরা দেখল বিপোর্টারের হাতেই সুকুমারের নোটবই, রিপোর্টার রিপোর্ট নিচ্ছে। উত্তরাকে দেখেই রিপোর্টার তার দিকে এগিয়ে এল একটু 'আপনি কিছু বলবেন?'

উত্তরার শরীর কাঁপছিল ভয়ে, জীবনে এমন হত্যাযজ্ঞে পড়েনি কখনও। মুখ থেকে তার কোনই কথা বেরুচ্ছিল না। কে জানে সুকুমার যদি গুলি খেয়ে থাকে তাই জিজ্ঞেস করতে ভয় করছিল তার।

'আপনার কেউ, কোন ক্ষতি. ....'

'আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে ছিল কিন্তু কখন যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম...'

তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলতে লজ্জা লাগছিল উত্তরার।

'আপনার হাতে যে নোটবইটা দেখছি সেটা তারই।'

'আপনি সুকুমারের কথা বলছেন?'

বড়জোর গ্রেপ্তার হয়েছে এর বেশী কোন ক্ষতি হয়নি, এরকম রসিকতা ছিল রিপোর্টারের কথায়। উত্তরা তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, সুকুমার সরকার।

'বুঝেছি আপনার কোন চিন্তা নেই, গাড়ীগুলো যখন চলে যায় পেছন থেকে হঠাৎ আমি সুকুমারকে দেখে আঁতকে উঠেছিলুম। প্রথমে চিনতেই পারিনি কোট-প্যান্ট ও পরতো মাঝে-মাঝে, আজকে দেখলুম বাতাসে টাই উড়ছে, তাই চিনতে একটু দেরী হয়েছিল। আমার দিকে চেয়ে হাত উ'চিয়ে হাসল, সুকুমার, চিৎকার করে কি যেন বলেছিল শোনা যায়নি। সুকুমার আমার বন্ধু মানুষ, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি আলাদা রিপোর্ট করব।'

নোটবইটি ইচ্ছে থাকলেও সাহস করে নিয়ে আসার কথা বলতে পারেনি উত্তরা। বাসায় ফিরে যতবার সে তার বাবাকে সেই অকল্পনীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ শুনিয়েছে ততবারই তার মনে হয়েছে চিৎকার করে সুকুমার উত্তরার কথাই জানতে চেয়েছিল।

পরদিন সবকটি পত্রিকায় বড়-বড় টাইপে সাব টাইটেলে নাম ছাপা হল সুকুমারের। ন্যুমার্কেটের চৌমাথায় পুলিস ই পি আর মিলিটারী সম্মিলিত জোটের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ, ছয়জন নিহত, পঞ্চাশজন আহত, কবি সুকুমারসহ একশতাধিক গ্রেপ্তার। মাওলানা ভাসানীর প্রতিবাদের নীচে সরকারী প্রেসনোট। ডান দিকে এক স্থানে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, তার নীচেই সুকুমারের পরিচিতি। পড়ে রাগ হল উত্তরার, সুকুমার তার কাছে এত গোপন করে কেন? পয়সার অভাবে প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকায় প্রুফ-রিডিং করেছে অথচ কোনদিন বললে না তাকে, এবার জেল থেকে বেরিয়ে এলেই জিজ্ঞেস করবে এই গোপনীয়তার অর্থ কি? উত্তরা পত্রিকা পড়ে তবুও গর্বিত অনুভব করল নিজেকে। লক্ষ-লক্ষ জনতার মিছিলের ছবিগুলো দেখে কালকের কথা ভাবল আবার।

বগলদাবা করে পত্রিকা নিয়ে ঘরে ঢুকল শ্যামল। প্রতিবাদের মিছিল নিয়ে ঝুনু তখন শহীদ মিনারে সমবেত হয়েছে। মফস্বল শহরে, গ্রামে-গঞ্জে তখন প্রতিবাদ, মিছিল আর শ্লোগান ছড়িয়ে গেছে আগুনের মত 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'আয়ুবশাহী খতম কর।' খবর পড়ে রজনী সরকার তত বিচলিত হলেন না, যত কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৎমা শোভাময়ী। পুত্রের মধ্যে বেঁচে থাকার কৃতিত্বের কথা ভেবে রজনী সরকারের চোখে জল এল।

শ্যামল আর মন্টু দাদার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল।

শিবানী সুকুমারের এই চারিত্রিক বৈপরিত্যকে কিছুতেই আবিষ্কার করতে

না পেরে কাপড় ছাড়ার কোঠায় এক বছর আগে একদিন শিবানীর সম্পূর্ণ উলঙ্গতায় সুকুমারের অসহায়ের মত চেয়ে থাকতে দেখে যেমন কেঁদে ফেলেছিল তেমনি কেঁদে ফেলল। ঠিক হল রজনী সরকার জেলে পুত্রকে দেখার জন্যে আজকের রাতেই ঢাকা যাবেন। নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না যে ছেলের জেল তাকে ঠিকানা দিয়াছে।

পরদিন সকালে রজনী সরকার যখন ঢাকায় পেঁৗছলেন, সারা শহরে তখন হরতাল। যানবাহন নেই, সমস্ত শহরের পথঘাট ফাঁকা, দোকান-পাট বন্ধ। যেন বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে সবখানেই, রজনী সরকার হাসলেন মানুষের প্রতিবাদী চেহারার দিকে তাকিয়ে। যেন ভাবটা চিনলেন, আমার ছেলে সুকুমার, আমি সুকুমারের বাবা। জেলে যাচ্ছি ছেলেকে দেখতে। হেঁটে-হেঁটে জেলগেটে পেঁৗছতে দশটা বেজে গেল। জেল কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিতে এমতাবস্থায় সাহসী ছিলেন না বলেই খুব সহজেই রজনী সরকার ছেলেকে দেখার অনুমতি পেলেন। লোহার শিকের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল সুকুমার। যেমন পরীক্ষা ফেলের সংবাদ দিতে গিয়েও হাসত বাবার সামনে সেই হাসি অনেক দিন পরে সুকুমারও আবার হাসল। 'কি করে যে কি হয়ে গেল। তোমরা কেমন আছ?'

কোন কথা বলার আগেই রজনী সরকার কেঁদে ফেললেন। জীবনকে মিথ্যে স্বপ্নের মত নির্মম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল যে সুকুমার তার চোখেও জল।

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দুজনেই। 'তোর মিথ্যে বলার স্বভাব আর গেল না সুকু', রজনী সরকার আদর করে ছেলেকে সুকু ডাকতেন। সেই ডাক শুনে সুকুমার তার শৈশবের ছবিটাতে ফিরে গেল। যে ছবি গতকাল উত্তরার কাছে চিরদিনের জন্যে অপমানিত হয়েছে। যে সুকুমার গতকাল তার বাবাকে অসহায় দরিদ্র অপরের করুণানির্ভর একজন বড়মামার ভূমিকায় নামিয়েছিল আজকে বাবাকে চোখের সামনে দেখে মনে হল কথাটি এমন কিছু ভুল নয়, কেন না যে কোন ভূমিকায় যাঁকে বসান যায় তিনিই তো জন্মদাতা, জনক। অপরাধীর মত চুপ করে থাকতে দেখে রজনী সরকারের চোখে জলের বেগ বেড়ে গেল। আমাকে তুই এত ছোট ভাবিস, সুকু আমি তোর সুখ চাই, দুঃখ তো চাইতে পারিনে বাবা।' আলাপ শেষ করার জন্য তাড়া দিচ্ছিল জমাদার। বাবাকে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল সুকুমার। আজকেই রাত্রে বাড়ী ফিরে যাব; আমরা সব ভাল আছি। দেশের জন্যে তুই জেলে গেলে আমি কি মানুষের বিরুদ্ধে যেতে পারি কখনও। গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। রজনী সরকারের ছেলে জেলে গেছে সবাই বলাবলি করছে দেশের বাড়ীতে।

কিছু দূর গিয়েই আবার ফিরে এলেন রজনী সরকার। 'আমি আজকেই

চলে যাব, তবে হ্যাঁ তোকে জেল থেকে বেরিয়ে বিয়ে করতে হবে, আমি কিন্তু কথা দিয়ে এসেছি। তোরও পছন্দ হবে দেখিস। শিবানীদের সাথে কলেজে পড়ে তরু।'

সুকুমার কোনই কথা বলতে পারল না, উত্তরার কথা বার-বার মনে পড়ল। কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে কোন কিছুই বলার প্রশ্ন ওঠে না স্বপক্ষেও বলতে গিয়ে সুকুমার অনুভব করল তার কণ্ঠস্বরে একটা বিশাল বেদনার পাথর পথ গেড়ে বসে আছে যেন কোন দিনই উঠে আসবে না। রজনী সরকার চোখের সম্মুখ থেকে মানুষের ভিড়ে শহরের হরতালে পুনর্বার মিলিয়ে গেলেন।

বিকেলে আবার ডাক পড়ল সুকুমারের, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। উত্তরার কথা অনেক বার বিশেষ করে বাবার বিবাহ সংক্রান্ত নির্দেশের পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তেই ভেবেছিল, কিন্তু এই সন্ধ্যায় উত্তরাকে এত কাছে পাওয়া যাবে তেমন আশাও করতে পারেনি সে। অনেকক্ষণ কান্নার জন্যে সুকুমারের চোখ দুটো লাল চকচকে সূর্যালোকে ডিমের অন্তবর্তী কুসুমকে যেমন লাল দেখায় তেমনি লাল দেখাচ্ছিল। উত্তরার গায়ে কালো গরম শাল, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ্পা। খোঁপায় একটি রক্তিম গোলাপ। পায়ে পাতলা চামড়ার চপ্পল। গেরুয়া জামদানী শাড়িতে সাদা রঙের ফুল-আঁকা, গলায় বেলফুলেব মালা, বাম হাতে একটি মাত্র শঙ্খের চুড়ি আঁকা। ডান হাতে রিস্টওয়াচ। কি অপরূপ সাজেই না সেজেছে উত্তরা। ওয়েটিং রুমের লোহার শিকে গাল ঠেকিয়ে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল উত্তরা। শিকের অন্য পাশে কখন এসে সুকুমার দাঁড়িয়েছে সে লক্ষ্য করেনি, উত্তরার বাম হাতের উপব সুকুমারের ডান হাত গড়িয়ে পড়ল—'কেমন আছ?'

প্রথমে চমকে উঠেছিল, তারপর সুকুমারকে হো-হো করে হেসে ফেলতে দেখে হেসে ফেলল উত্তরাও। 'জেলে এসে বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কবি হয়ে গেলুম দেখলে তো।'

'ভালই তো, বিপ্লবী কবিরা জনপ্রিয় হয় বেশী।'

'কিন্তু মনপ্রিয় হয় না' প্রথমেই আলাপটা নজরুলের বিপ্লবী হওয়ার পেছনে কম্যুনিস্টদের ভূমিকা, সুকান্ত, কীটস, বুদ্ধদেব বসু হয়ে সুকুমার পর্যন্ত গড়িয়েছিল, ভিন্ন খাতে টেনে আনলে উত্তরা।

'আচ্ছা তুমি এত মিথ্যা কথা বল কেন?' অভিমানী কণ্ঠে যদিও তবুও উত্তরার প্রশ্ন শুনেই সুকুমারের মনে হল অভিযোগ একটিই, মিথ্যে বলার অভিযোগ।

সত্যটা না বলার মানেই তো আর মিথ্যে বলা নয় উত্তরা। উত্তর এলো না উত্তরার মুখে।

'আসলে সব কিছুই তো মিথ্যে, সত্য বড় দ্রুত পালায় বুঝলে, তাই

সত্যের চেয়ে মিথ্যেতে আমার লোভ বেশী।' মিথ্যের উপর নির্ভর করা যায়, সত্য বড় ধোঁকা দেয়।' মিথ্যে বলার পিছনে সুকুমারের এত যুক্তি ছিল উত্তরা সেটা ভাবতে পারেনি। তাই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে উত্তরা বলল, 'তোমার জন্যে দুটো জিনিস এনেছি। কথা দাও কোন মন্তব্য করতে পারবে না।'

মুদ্রাদোষের মতই মন্তব্যকে সব সময়েই ভয় করে উত্তরা।

'কথা দিলুম।' দরোজার শিকের ওপাশ থেকে যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে কথা দিল সুকুমার।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল উত্তরা কেউ তাকিয়ে নেই। তারপর ত্রস্ত হাতে খোঁপা থেকে গোলাপ আর গলা থেকে বেলীর মালা খুলল। ঠাকুরের দেয়া ফুল ও বেলপতা যেভাবে দু হাত নিয়ে সবস্বতীর দিকে ছুঁড়ে দিত ছেলেবেলায় ঠিক সে রকম শ্রদ্ধায় উত্তরার পবিত্রতম উপহারকে দুই হাতে গ্রহণ করল সুকুমার।

সুকুমারের মুখে অনেক কথা ভিড় করেছিল কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না সে। উত্তরার একটি পুষ্পিত হাতকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল সুকুমার—'আমার কি ইচ্ছে হয় জান?'

'কি?' গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল উত্তরা।

'ইচ্ছে করে তোমার একটি হাত কেটে রেখে দিই জেলখানার ভিতরে।' সুকুমার বলল 'কি সুন্দর তোমার হাত, বুদ্ধদেব বসুর সেই কবিতাটি মনে আছে। 'আমার প্রেম রেখে এলাম ঈশ্বরের হাতে।' উত্তরার যে প্রস্তাবটিকে এড়াতে চেয়েছিল সুকুমার সেই অন্তরঙ্গ প্রিয় প্রস্তাব উচ্চারিত হল সুকুমারের মুখ থেকেই, 'তুমি পারবে আমাকে বিয়ে করতে? 'উত্তরা কথা বলতে পারছিল না, জীবনের সব কিছু অর্পণ করার সন্ধ্যায় সুকুমারের হাতে হাত দিয়ে শীতের বিড়ালের মত কাঁপছিল কেবল। সুকুমার তখন অভিভূত ঠোঁটে উত্তরার হস্তরেখায় চুমু খেল এবং কপালে উত্তরার হাতের স্পর্শকে ধরে রাখল অনেকক্ষণ।

'ছাড়, পুলিশটা চেয়ে আছে, তোমার জেল আরও বাড়িয়ে দেবে।' অনেক কেঁপে-কেঁপে কষ্ট করে কথা বলল উত্তরা। শিবানীর বন্ধুটির কথা ভুলে গিয়ে প্রশস্তির হাসি হাসল সুকুমার। 'একটি ভালবাসার হাত আমার চাই উচ্চারিত হল তার মুখে।' প্রত্যেক দিন তুমি যদি আস, আজীবন জেলে থাকতে রাজী।' সুকুমার হাসছে।

'জান বাবা আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন। আমি বলেছি এম-এ পাশ না করে বিয়ে করছি নে—স্বামীকে পুশতে হবে তো। বাবা হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

'কি যে বলিস তুই।'

'তোমার বাবা জানেন না তুমি যাকে বিয়ে করবে তিনি স্ত্রী-নির্ভর হতে পারেন।'

'চল, জেল থেকে বেরিয়েই আমরা বিয়ে করব।' অনেক চেষ্টা করেও যে কথা সুকুমার কিম্বা উত্তরা কেউ-ই বলতে পারেনি কাউকে আজ কত সহজেই সুকুমার সেই চূড়ান্ত প্রস্তাবটিকে আউড়ে গেল।

উত্তরা কোন কথাই বলল না, শুধু দেখা গেল উত্তরার ছায়া যেখানে সেখানে ছায়াটার মাথা বুকের মধ্যে দিয়ে নুয়ে এসেছে একটু, চোখের পাতা ঢাকা পড়ে মনে হচ্ছে উত্তরা ভালবাসার নামে ঘুমিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।

হঠাৎ করে সুকুমারকে নিষ্পলক চোখে চোখ রেখে ঘাড় ফিরাল উত্তরা— 'জান কি অদ্ভুত।'

কি তাড়াতাড়ি বলার জন্যে তাড়া দিল সুকুমার।

আজকে রোকেয়া হলের সম্মুখ দিয়ে যখন হেঁটে-হেঁটে বাসায় যাচ্ছিলুম তখন বেলা বারোটার মত হবে। এক ভদ্রলোককে দেখলুম। কি অপূর্ব মিল, না দেখলে তোমাকে বিশ্বাস করান যাবে না মনে হল যেন ফটো থেকে উঠে এসেছেন ভদ্রলোক। সেই লম্বাটে শরীর, ধুতি-পাঞ্জাবি, আড়াআড়ি করে বুকের ওপর গরম চাদর, অবিকল তোমার বড়মামার মত দেখতে। আমি তো রীতিমত দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। পিছু-পিছু হেঁটেও গিয়েছিলুম কিন্তু ভদ্রলোক যা দ্রুত হাঁটেন কিছুতেই ধরতে পারিনে—পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে একটা বাসে উঠে গেলেন, আর দেখতে পেলুম না। কালকে তোমার বড়মামার যে ছবি দেখেছি তার সঙ্গে উনিশ বছর যোগ করে মনে-মনে একটি মানুষকে কিছুতেই মিলাতে পারিনে। আজ স্বচক্ষে তাঁকে দেখে এসেছি যেন। আমার খুব মায়া লেগেছিল, বয়স তাঁর গালের ভাঁজ টেনে দিয়েছে, কপালে সব সময় সন্ধ্যার মত ছায়া, অথচ চোখ আর নাক কি উদ্ধত......

আমার ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করি বড়মামা কেমন আছেন? কিন্তু... 'সুকুমারের মুখে কোন শব্দ না পেয়েও উত্তরা একে-একে সেই গল্প বলে যেতে থাকল। 'তোমার বড়মামা ছাড়া এ আর কেউ হতে পারে না। ভদ্রলোক যা দ্রুত হাঁটেন...আমার ইচ্ছে করছিল।'

এবার পরাজিত হল সুকুমার। তার চোখের জল অন্তঃসারশূন্য শুষ্ক জীবনের আর্দ্রতাকে অতিক্রম করে গাল বেয়ে নামতে থাকল, উত্তরা সুকুমারকে এভাবে দেখে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললে, 'তুমি বড় ছেলেমানুষ, হয়ত তিনি তোমার কেউ নন কিন্তু আমি বলছিলাম মানুষে-মানুষে কি মিল।'

তারপর অন্তর্দ্বন্দ্বের কয়েকটি মুহূর্তকে ফিরিয়ে দিয়েই আবার শীতের রোদ্রের মত জীবনের চার পাশে জমে-থাকা কুয়াসাকে উড়িয়ে দিয়ে হাসল,

'বড়মামার জন্যে বড়ো কষ্ট হয়, সারাটা জীবন কষ্ট করলেন, কোনদিন আনন্দের মুখ দেখলেন না।'

উত্তরা ফিরে গেল। সুকুমার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনুভব করল কল্পনার ছবি ছাড়া অন্ধকারেব কোন ছবিই তার চোখে ছায়া ফেলতে পাবে না এবং আত্মহত্যা যেহেতু মহাপাপ তাই হত্যাকারী হওয়াই ভাল। কিন্তু হত্যা কববে কাকে? অথচ একজনকে হত্যা করা চাই।

# রংপুরের অর্কিড

**বশীর আলহেলাল**

মা-বাপের ঘরে, এই জন্মভুমিতে আবার কবে আসবে কেউ বলতে পারে না। রংপুর ত্যাগ করার সময় মঞ্জুরার মনে হলো, সে তার হৃদয়টাকে রেখে যাচ্ছে। অথচ ঠোঁটের কোণায় একটুখানি করুণ হাসি সে স্মরণ করল, এই হৃদয় সে ইতিমধ্যেই একজনকে দিয়ে বসে আছে।

হৃদয়টাকে শুধু জন্মভূমিতে রেখে যাওয়া নয়, মনে হচ্ছে, হৃদয়টা যেন তার বিক্ষুব্ধই হয়েছে। মঞ্জুরার মনে হলো, পুষ্পিতা হওয়ার জন্য অপেক্ষমান একটি শ্যামল ঝাঁকড়া গাছকে প্রকৃতির লীলারণ্য থেকে উপড়ে দূরে বহু দূরে, অন্য ভূমিতে রোপণ করা হয়েছে। তার শিরায় শিরায় ধমনীতে নিষ্ঠুর মোচড়ের বেদনা। সেই অন্য ভুমিতে বড় মনোরম সাজানো বাগান। মঞ্জুরারূপ উপড়ানো বৃক্ষ সেই বাগানে বিপুল মহিমায়, সমাদরে উদ্যানসম্রাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত হলো, সে কথাও সত্য। কিন্তু ওই উদ্যানে এই কোমল কৃষ্ণ মাটির মায়া কি আছে? হায় নির্বাসিতা নারী, কবে তোমার প্রবাস হবে আপন গৃহ—কবে? বলো, কবে?

কিন্তু রংপুরের কাল কোমল মাটি থেকে যে লোকটা তাকে ঢাকায়-উপড়ে নিয়ে গেছে, এই কয়দিনে সেই লোকটাকে তার ভালো লেগে গেছে—এ এক বিষম বেদনা। বিবাহ মানে সুন্দরের অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করা। সেই রূপ নির্দয় বলিষ্ঠ রোমহর্ষক। পঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে যদি সমৃদ্ধ শতদলের রাজ্যে গিয়ে ওঠা যায় তবে তাই হলো বিবাহ। সুন্দরের এমন অপরূপ কঠোরতা মঞ্জুরার সইবে কি সইবে না তাই এখনো সে বুঝতে পারল না। বিবাহের রাতে আয়নায় দৃষ্টি বিনিময়ের কালে ওই লোকটার দুটি অস্বাভাবিক বড় কান তার সবার আগে চোখে পড়েছিল। তার ভিতরের রূপ সে কবে দেখবে সে জানে না। কিন্তু বাইরে থেকে সে ঠিক কেমন দেখতে তাও বুঝতে কেন তার সময় লাগল। বাসরে সে আরো ভাল করে তাকে দেখেছিল, কিন্তু তখনো ধরতে পারেনি, সে কেমন। সে কি দেখতে ভালো? ভদ্র? তার চেহারাটা কি সহনীয়? তার পুরুষের আদর্শ যা সে কল্পনায় গড়ে তুলেছিল তার ন্যূনতম দাবী তাতে মিটেছে কিনা বুঝতে পারছিল না। তবু অচিরে এমন সময় এল যখন সে দেখল, ওই লোকটাকে তার ভালো লেগে গেছে। তার জন্য তার মায়া

হচ্ছে, এমন কি তাঁকে বুকে নেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। তখন সে হেসেছে। এবং তখনই একটা আশ্চর্য বেদনায় আপ্লুত হয়ে বলেছে, তাহলে আমার নির্বাসন আমি সানন্দে বরণ করলাম। আমার মৃত্যু হলো, আমার মৃত্যু হলো। এবং আমি নতুন জীবন লাভ করলাম।

বিবাহের দিন অনেক ঘটনার আড়ম্বরের মধ্যে তার বিদায় হয়েছিল। তাই জন্মভূমি ও আত্মীয়পরিজনের বিচ্ছেদের স্বরূপ সেদিন তেমন করে ধরতে পারেনি। এবার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসে সপ্তাহান্তে চলে যাওয়ার সময় সে প্রকৃত বিমর্ষ হলো। তাই দেখে স্বামী বলল, তাহলে তুমি আব কিছুদিন থাক। আমি এসে পরে নিয়ে যাব, বা তোমার মন ভালো হলে কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেয়ো—কেমন?

তাই শুনে মঞ্জুরা নিজে কৃতজ্ঞ বোধ করল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে বলল, না, না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

স্বামী কথাটা মন থেকে বলেনি, নিছক ভদ্রতা করেছে, সেটা সে বুঝেছে, বুঝে আনন্দ পেয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, মঞ্জুরা নিজেকে আর বৃক্ষ নয়, একটি লতার সঙ্গে তুলনা করছে। এবং স্বামীই তখন বৃক্ষ-মহীরূহ। লতা তখন সর্বক্ষণ বৃক্ষের কণ্ঠলগ্ন থাকতে চাইছে। না হলে সে বাঁচবে না—না, বাঁচবে না। দারুণ নিদাঘে উন্মূলিত আলোকলতার মতো শুকিয়ে যাবে। এবং তখন সে অনুভব করল, নিজের দেহের ভাণ্ডার থেকে যতই সুধা সে বিতরণ করছে, সেই ভাণ্ডার শূন্য হচ্ছে না। সে বলল, সে একেলা বিজনে কি করে তার ভাণ্ডারের ভার বহন করবে?

এমনি আনন্দ-বেদনায় দুলতে দুলতে মঞ্জুবা পতি-গৃহে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। ব্যাগ-বাকসো গোছাতে লাগল। তার মন চাইল, এ গৃহে যা কিছু তার সত্তার আত্মীয় তাদের সে বহন করে নিয়ে যায়। শুধু নিজের নির্বাসনকে মুখর করে তোলার জন্য নয়, পতির গৃহকে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ কবে তোলার জন্যেও সে তাদের নিয়ে যেতে চায়। নিজের দেহ আর সত্তার সম্পদ নিয়ে যেমন সে স্বামীর জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, ওই সব বস্তু দিয়ে তেমনি সে স্বামীর গৃহকেও সমৃদ্ধ করতে চায়। সে বলল, এখন তার দেয়ার পালা। সকল শূন্য করে সে দিতে চায়। কারণ সে দেখেছে, সে যত দেয় ততই তাব বাড়ে। কি যে আশ্চর্য জীবন তার শুরু হয়েছে—আহা।

তার বাগানের যত ফুলের বীজ সে নিচ্ছে। গাছ ভর্তি জাম্বুরা কেউ খায় না। নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাই এক বস্তা পেড়ে রেখেছে। লাল টুকটুকে মেস্তার ফল পেড়েছে এক ঝুড়ি—সেখানে গিয়ে আচার বানাবে। টেবিল টেনিসের সেই জীবন তো আর থাকল না। কিন্তু সেই জীবনের স্মৃতি তার কলেজ চ্যাম্পিয়নশীপের ট্রফি, একটি খেলার নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। ক্রুশ-

কাঁটাগুলো নিয়ে যাচ্ছে। শীত আসছে—স্বামীর জন্যে সোয়েটার বুনতে হবে। মা বললেন, নে বাপু, নে তোর যা কিছু নেওয়ার আছে, নে।

মঞ্জুরা বলল কে জানে মা, আছে কি নেই। থাকলেও কনক চাঁপার অমন চারা কি আর তৈরি করতে পারব?

রওনা হওয়ার আগের দিন মঞ্জুরা আর একবার স্বামীকে শহর দেখাতে বেরোল। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর বাড়ী গেল। তারপর রিক্শায় করে বিরাট বিরাট গাছের ছায়া-ঢাকা পথে পথে ঘুরল। সে বলল, এই সব রাস্তার প্রত্যেকটা দোকান, প্রত্যেকটা মোড়, প্রত্যেকটা গাছ আমার চেনা। প্রথম যেদিন স্কুলে যাই সেই ছেলেবেলা থেকে যেদিন আমি কলেজ ছাড়ি সেদিন পর্যন্ত ওদের আমি দেখে আসছি।

স্বামী বলল, এই শহর তোমাকে বড় মানায়।

মঞ্জুরা বলল, তার মানে তোমাদের শহর আমাকে মানায় না—তাই না?

দেখো তাই বুঝি বলেছি আমি?

তুমি না বললে কি হবে, আমি তো একেবারেই মফঃস্বলের মেয়ে—রাজধানীতে আমাকে মানাবে কেন?

স্বামী বউকে খুশি করার জন্যে বলল, রাজধানীতে তোমাকে মানায় না—না তোমার পাশে রাজধানীকে মানায় না?

ওই একই কথা হলো।

স্বামী বলল, আমার তো তোমাদের শহরে ঘর বাঁধতে ইচ্ছা করে।

মঞ্জুরা বলল, কেন, তোমার ঘরনী তো তোমার ঘরে গিয়েই হাজির হবে হুজুর।

স্বামী বলল, হলে কি হবে, সে যদি তার গালের রঙ, চোখের আলো, হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে না যায়?

মঞ্জুরা বলল, নিয়ে যাবে না বলে কেন ভয় হচ্ছে তোমার?

স্বামী বলল, কি জানি।

সামনে দুই দিকে দুই পথ দেখা গেলে রিক্শাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোন্ দিকে যাব?

মঞ্জুরা বলল, ডাইনে।

ডাইনের ঘাসে ঢাকা রাস্তা গেছে কারমাইকেল কলেজে। মঞ্জুরার জীবনের বেশ কয়টি উত্তম বৎসর এখানে কেটেছিল। তার জীবনের বিপুল কোনো গৌরব যেন এখানকার কাঁকর-বিছানো পথ, ঘাসে-ঢাকা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং উঁচু ভবনগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। রিক্শা থেকে নেমে মঞ্জুরা স্বামীকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখাল। স্বামী চারিদিক তাকিয়ে বলল, দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের এই কলেজের বিপুল অনন্যতাকে কোনো অভিনব নতুন একটু

একটু করে গ্রাস করছে। এমনি অবধারিত আগ্রাসন চোখ মেলে দেখতে ভালো লাগে না।

আমলকী বনে পায়চারি করতে করতে মঞ্জুরা বলল, হ্যাঁ, যেমন তুমি আমাকে গ্রাস করেছ। আমার প্রাচীন সত্তা মহা আদরে আমি একটু একটু করে সাজিয়ে রেখেছিলাম। তুমি তাকে গ্রাস করেছ। সেই অবধারিত দৃশ্যও সবাই চোখ মেলে দেখতে পারেনি। বিয়ের দিন আমার বিদায়ের সময় সবাই কাঁদছিল। এবারও ওরা কাঁদবে।

স্বামী বলল, যে গ্রাস করে সেও বুঝি দুঃখ-পায়।

তুমি দুঃখ পাচ্ছ?

হ্যাঁ আমার মনে হয়, আমি বড় নির্দয়ের মতো কাজ করেছি। আমার বিশ্বাস হয় না, তুমি তোমাদের এই সুন্দর শহরের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, এই সব গাছপালা, ঘাস এই কলেজের বাড়ী এই প্রাঙ্গণ, তোমার এই বিপুল স্মৃতির সাম্রাজ্যের চেয়ে কখনো আমায় বেশী ভালোবাসতে পারবে। সে দাবীই বুঝি করা চলে নাকো। বলো, করা চলে?

মঞ্জুরা স্বামীর একটি হাত ধরে বলল, না, অমন করে বোলো না। আমি সব সময় দেখি, তোমার তুলনাগুলো কি যে উদ্ভট।

কটা মরণাপন্ন ঝাউগাছের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জুরার ইচ্ছা হলো, ফুলদানি সাজাবার জন্যে কটা ঝাউপাতা নেবে। হাত বাড়িয়ে একটা গাছের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে দেখল, সবুজ বর্ণের ছুঁচলো পাতার কিছু অরকিড্ গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ঝুলছে। সে বলল, তোমাদের ঢাকার আমি এই অরকিড নিয়ে যাব। টবে লাগাব।

স্বামী বলল, গাছের অরকিড কি টবে বাঁচবে?

বাঁচবে। কেন বাঁচবে না? বাঁচবে। তারপর ফুল ফুটবে। ছোটো ছোটো নীল নীল ফুল।

অনেক যত্নে, যাতে শিকড় ছিঁড়ে না যায়, অনেকক্ষণ ধরে সে কটি অরকিড পট্ পট্ করে উপড়ে নিল। কোনোটির শিকড় ছিঁড়ল, কোনোটির শিকড় যেমনটি ছিল তেমনি রইল। মঞ্জুরা বলল, এখন গিয়ে বয়েমে পানিতে ডুবিয়ে রাখব। সেই অরকিড মঞ্জুরা ঢাকায় গিয়ে যত্ন করে টবে লাগিয়েছিল। টবের মাটিতে ভালো করে সার দিয়েছিল। প্রতিদিন সকালসন্ধ্যায় পরিমাণ মত পানি দিচ্ছিল। সকালের মিষ্টি রোদে টব ব্যালকনির রেলিঙে তুলে দিয়ে রোদ চড়লে নামিয়ে ছায়ায় রাখছিল।

তার নিজের জীবনেও আলোছায়ার খেলা চলছিল। স্বামী তাকে কখনো আলোয় কখনো ছায়ায় রাখছিল। সে তাকে অদম্য আবেগে ভালোবাসছিল।

এমন ভালোবাসা মঞ্জুরা ভয়ে মরে যাচ্ছিল। এত ভালোবাসা কি তার সইবে। কপালে কেন তার এত সুখ ছিল। এত সুখ তো সে কখনো চায়নি।

যাই হোক হঠাৎ একটা অসুখ বাধিয়ে সে সে যাত্রা বেঁচে গেল। অসুখটা এক অদ্ভুত ধরনের ভাইরাস-ঘটিত জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জাও নয় আবার টাইফয়েডও নয়।

তখন একদিন ঝাপসা চোখে স্বামী দেখেছিল, টবের অরকিডগুলিও শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, ওকি মরে যাচ্ছে? ডাক্তার বলেছিল, না-না, মরবেন কেন, এটা মরণের অসুখই নয়।

মা শুনে হেসে হেসে বলেছিলেন, খোকা, ওকে বলে বিয়ের জ্বর, বুঝলি? কারো বিয়ের দিনে হয়, কারো দু-দশ দিন পরে হয়। ওতে আবার কেউ মরে নাকি খোকা?

মঞ্জুরার জ্বর ছাড়ল। সে উঠে বসল। অনেকদিন পরে মেঘের চাদর সরিয়ে সূর্য মুখ বের করলে তাকে যেমন অন্যান্য দিনের চেয়ে সুন্দর দেখায়, ঈষৎ-কৃশ মঞ্জুরাকে তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল। স্বামী তার পাশে বসে বলল, আমি ভেবেছিলুম, তুমি মরে যাচ্ছ?

মঞ্জুরা বলল, কেন ভাবছিলে? আবার একটা বিয়ে করবে বলে।

স্বামী বলল, না। তুমি মরলে আমিও মরে যেতাম।

মঞ্জুরা হেসে বলল, ওপারে গিয়ে আবার আমাকে পাকড়াও করবে বলে?

স্বামী বলল, আমি তোমাকে পাকড়াও করেছি নাকি? আমি তোমাকে লাভ করেছি।

মঞ্জুরা বলল, ওই একই কথা হলো।

সে সেদিন সকাল সকাল পুরানো চালের ভাত খেল কই মাছের ঝোল দিয়ে। দুপুরে ভাল করে ঘুমাল। বিকালে উঠে অরকিডের টবের কাছে গিয়ে দেখল, সব অরকিড মরে শুকিয়ে পড়ে রয়েছে। হায়, কেউ একদিন ভুলেও টবে পানি দেয়নি। কিন্তু একটি অরকিড বেঁচে রয়েছে। সে বেশ পুষ্ট হয়েছে। সে বলল, তাহলে ঢাকার নির্বাসনে তুই নিজেকে মানিয়ে নিলি অরকিড?

তার পর স্বামীকে ডেকে সে বলল, আমাদের এখানে একদম শীত নেই। রংপুরে এখন কত শীত, কত শীত। আমার ভালো লাগে না।

স্বামী বলল তাই বলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।

মঞ্জুরা বলল শীত না পড়লে আমার ভালো লাগবে না, আর ওই অরকিডও বাড়বে না, দেখে নিও।

স্বামী বলল, সব সয়ে যাবে।

এই হলো রংপুরের অরকিডের গল্প।

# দু'জন মানুষ ও তিনটি গরু

**আবু জাফর শামসুদ্দিন**

চাঁদে কলঙ্ক আছে, শুক্লপক্ষ আছে, কৃষ্ণপক্ষ আছে, অমাবস্যা আছে এবং গ্রহণ আছে।

সেতারা নিষ্কলঙ্ক। সেতারা বারো মাস উজ্জ্বল। সেতারা চির যৌবনা ঊর্বশী। সেতারা কাব্যের ধনী।

সেতারার সঙ্গেই শায়ের করছিলাম। আকাশের সেতারা নয়—একজন মানবী, কিন্তু সেতারাব মতোই কালিমাহীন, কলঙ্কহীন—আপনরূপে আপনি উজ্জ্বল।

আয়না নয়—আপনি জ্যোতিষ্মান। অনেকদিন ধরে তার সঙ্গে শায়ের করছি। সে আমার নিত্য সহচরী; কিন্তু কোনদিন কিছু বলা হয় নি। লোভ হয়েছে, সংবরণ করেছি।

সেদিন ছিল শরৎ পূর্ণিমার রাত। আকাশ পবিষ্কার। চিমনির ধোঁয়াও নেই, ইলেকট্রিকের আলোও নেই। অনুকূল—সব কিছুই অনুকূল!

কণ্ঠে রাজ্যের কোমলতা মিশিয়ে ডাকলামঃ সেতারা!

উত্তরে সেতারা বললোঃ কি আসাদ! তার কণ্ঠ থেকে যেন অমৃত ঝড়ে পড়ছিল।

—তোমাকে ভালবাসি সেতারা। কোনক্রমে বলি।

—ভালোবাসো? বেশ! তার প্রমাণ? চোখের পাতা টানটান করে সে আমার দিকে তাকায়। পাতার ভ্রূগুলোতে অশ্রু নয় শিশিরবিন্দু ছিল। চাঁদেব আলো তার মধ্যে পারদের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল।

—কি প্রমাণ চাও? আমি আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি! তোমাকে অদেয় কিছুই নেই সেতারা—কানে কানে বলি।

—কি দিতে পারো? সেতারা পালটা প্রশ্ন করে।

বুঝলাম সে আমার কাছ থেকেই শুনতে চায়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই কি এই? বিদ্যুৎ চমকের মতো এ প্রশ্নটাও সহসা মনে জাগে।

—কি না দিতে পারি! জেওর, কাপড়...শেষ করতে দেয় না সেতারা আমাকে। বলেঃ ও তো সকলেই দেয়।

—সিল্কের শাড়ী, হীরের আংটি...

—মামুলী জিনিস। সেতারা আবার বাধা দেয়।

—গাড়ী, বাড়ী...

—দুত্তর যত সব। এবার সে ছোট করে ধমক দেয়।

—রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন...

—ওগুলো যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকে।

পাশাপাশি চলছিলাম, হঠাৎ করে সামনে এসে পথ আগলে বসে সেতারা। আর কি প্রস্তাব করতে পারি। মাথা চুলকাই। হঠাৎ মনে পড়ে আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি। বুকে সিংহের সাহস নিয়ে বলিঃ দেনমোহর—আরো দেব দেনমোহর।

—কত টাকার? এবার বাধা দেয় না সে। বরং সম্মুখ থেকে আবার পাশে আসে এবং আমার হাতের তালুতে তার হাতের তালু লাগায়।

আমরা আবার চলতে থাকি। আশা হয় তার আসল দাবী বুঝি বা বুঝেছি। বলিঃ এক লাখ, দু' লাখ—যত চাও, তোমার জন্য কোন অঙ্কেই আমি অরাজি নই।

—ধেৎ, তুমিও দেখছি সব পুরুষেরই মতোই বোকা। তুমি বীর, তুমি সংগ্রামী, তুমি বিপ্লবী, তুমি মোজাহেদ। তোমার মুখে এসব মামুলী প্রস্তাব শুনবো কে ভেবেছিল! দেনমোহর তো সকলেই দেয়। যাও—

সেতারা হাত ছাড়িয়ে নেয়। হতাশ হয়ে পড়ি। দুরু দুরু বুকে বলিঃ তবে তুমিই বলো কি চাও! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। বল সেতারা, বলো কি চাও তুমি?

—শোন তবে। তোমার কাছ থেকে এমন জিনিস চাই কেয়ামত পর্যন্ত যার ধ্বংস নেই, পুরুষ পরম্পরায় যার ক্ষয় নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন অধিকার যার মধ্যে কোন শরিক নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন অবস্থা যার মধ্যে কোন গোঁজামিল নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন প্রশান্তি যার মধ্যে কোন রব নেই।

—সে কি সেতারা?

—এমন আধিপত্য যার মধ্যে অন্য কারো দাবী নেই, কোন কলরব নেই। দেবে এসব?

—সে কি সেতারা?

দেবো, যা চাও তাই দেবো, কিন্তু সে কি জিনিস যার এতো গুণ?

—ডানে-বাঁয়ে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ না মাঠে কত আগাছা, আস্তাকুঁড়, কত কোলাহল, কত কলরব?

—হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি সেতারা।

—এগুলো সাফ করো, তবেই আমাকে পাবে।

—কেমন করে সাফ করবো? ভড়কে গিয়ে বলি।

—কেন, সড়ক বানাও—খুব লম্বা—আর চওড়া সড়ক।

—সড়ক?

—হ্যাঁ, সড়ক, আর কিছু নয়।

—সড়ক দিয়ে আমরা কি করবো সেতারা? সড়ক ত অস্থাবর মাল নয়, কি কাজে লাগবে তা আমাদের? আমি প্রশ্ন করি।

—অস্থাবর নয় বলেই ত সড়ক চাইছি।

—কিন্তু সড়ক দিয়ে কি করবো আমরা তা'ত বল্‌লে না। আমার কন্ঠের স্বমিয়ত দেখে আমিই বিস্মিত হই।

—তুমি একটা আস্ত গাধা আসাদ। দিনের আলোয় এবং রাত্রির গভীরে তুমি আমি—শুধু তুমি আর আমি বেড়াবো।

—কিন্তু...। আমি তবু ইতস্ততঃ করি।

—কিন্তু? ফের কিন্তু কেন? সেতারা গরম হয়ে ওঠে।

—অত লম্বা-চওড়া সড়ক তৈরি করলে বহু জঞ্জালের সাথে যে বহু কুঁড়েও সাফ হয়ে যাবে।

—তাতে হয়েছে কি। রানীর এক মুহূর্তের আনন্দের জন্যে কত কুঁড়ে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। জানো না কি?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছিলাম। বললামঃ জানি, কিন্তু কুঁড়ের বাসিন্দারা কোথায় যাবে?

—কোথায় কে যাবে সে-ভাবনায় তোমার কি কাজ? এ-ভাবনা যিনি ওদের তৈরি করেছেন তাঁর। চিরকাল তারা স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরবুকের সাম্পানের মতো। বিতাড়িত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু নতুন স্থান খুঁজে বসতি বানিয়েছে। আসলে তুমি ভয় পাও। তাই না?

সেতারা আচমকা একটা ঘুরপাক খেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় এবং খিল খিল করে হেসে ওঠে। তার কটি ঘূর্ণনের ক্ষিপ্রতা, বুকের দোলা এবং দাঁতের ঔজ্জ্বল্য আমাকে পাগল করে তোলে ভীরুতার অপবাদ শুনে পৌরুষেও আঘাত লাগে।

কণ্ঠ চড়িয়ে বলিঃ তুমি আমাকে ভীরু বলে সন্দেহ করো সেতারা? তার চাইতে যে আমার মরণ ভালো।

—মরে কাজ নেই, তার চাইতে বরং সড়ক কেটে প্রমাণ করো তুমি ভীরু নও। সেতারা হাসতে হাসতে বলে।

—তুমি আমার হবে তো সেতারা? নিঃসন্দেহ হবার জন্যে প্রশ্ন করি।

—সড়ক কেটে এসো পরে দেখা যাবে। তথাস্তু বলে বিদায় হই।

হাজার হাজার লোকলস্কর লাগাই। বন কেটে, পাহাড় ভেঙে, কুঁড়ে আর আস্তাকুঁড় সাফ করে, নদী নালা বন্ধ করে অথবা পুল দিয়ে সড়ক তৈরি করি।

সড়ক তৈরি হয়ে যায়।

সেতারা আবার আমার সঙ্গিনী হয়। বলিঃ দেখো! দেখো! তোমার মনের মতো সড়ক বানিয়েছি। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে ঠিক তেমনি লম্বা এবং চওড়া—কোথাও একটি ফাঁক নেই। খুসী হয়েছ?

—খুসী! হাঁ খুসী হয়েছি। কিন্তু...সেতারার নাক মুখ কুচকে ওঠে। আমার মুখের হাসির উপর রাহুর পাখনা পড়ে। একসংগে হাজার জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে মনে। আবার কি শর্ত আরোপ করতে চায় সেতারা?

ভাবনার সূত্র কেটে যায়। সেতারার কথা শুনিঃ কিন্তু এ সড়কে যে বড় ভিড় আসাদ। সড়ক বানালে যে শহরও গড়ে উঠবে তা 'ত ভাবিনি।

—ভালোই তো হয়েছে শহর গড়ে উঠেছে। সাহস করে তার কথায় বাধা দেই।

—এবং শহর গড়ে উঠলে সড়কে ভিড় হবে তাও ত ভাবিনি এবং...সেতারা আমার কথাগত্তর করে না, বলতেই থাকে।

—সড়কে ভিড় হয়েছে, ভালোই ত' হয়েছে, সংগী-স্বজন মিলবে, একা একা লাগবে না। আমি আবার সাহস করে বলি।

এবারও সেতারা যেন আমার কথা শোনেই না, তার মতো সে বলতেই থাকে। ...এবং ভিড়ে ভিড় জমাবে হাজার হাজার যুবক যুবতী—ঠাট্টা করবে, ডাট করবে, বই নেবে, সই খুঁজবে; ঝোলা ঝুলাবে, পোলা ভুলাবে; সোনালী রূপালী শাড়ী লটকাবে, রঙ-বেরঙের হাওয়াই আর ট্রাউজার পরবে; খুট্-খুট্ খট্-খট্ করে নিতম্ব নাচিয়ে চলবে—না এমন সড়কে আমার কাজ নেই।

সেতারা শেষ করে। চেয়ে দেখি তার মুখে হাসি নেই, চোখে জ্যোতি নেই।

আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন একটা তালগাছের ওপরের অর্ধেক বিনা ঝড়ে ভেঙে পড়ে। তার পত্রাঙ্কে তৈরী বাসায় শকুনীরা তা দেয়। ডিমগুলো আমার মাথার ওপরেই খান খান হয়ে যায়।

সব কিছু এলোমেলো। শকুন-ছানাগুলো কিলবিল করছে। এতো করার পরেও আরো কি চায় আমার জানের জান, প্রাণের প্রাণ, চোখের মণি, হৃদয়ের ধন সেতারা?

আরো কি চাও সেতারা? আশাহত স্বরে তার বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করি।

—বলেছি ত। বুঝলে না? উদাসভাবে উত্তর দেয় সেতারা।

বুঝার চেষ্টা করছি। তুমি বরং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও। আমি উত্তর দেই।

—হ্যাঁ সড়ক, তো করে দিয়েছি।

—হ্যাঁ করেছ, সে জন্যে ধন্যবাদ। এখন এ-সড়ক সাফ করো!

—সাফ! সাফ তো আছেই।

কোলটারের সাফ নয়, ভিড় সাফ করো। সব জঞ্জাল দূর করো।

—কেমন করে?

—যেমন করে সড়ক তৈরি করেছিলে।

—কিন্তু কেন? আমি হেঁটে যাই আর বলি।

—আমি পরদা পুশিদায় চলতে ভালোবাসি আসাদ। ওদের আমি ডরাই।

—ডর! কিসের ডর সেতারা?

—হ্যাঁ ওদের আমি ডরাই। বড় গোলমেলে লোক ওরা। যখন-তখন রাস্তায় নৃত্য শুরু করে দেয়, কখন কার পরদা তুলে নেয় ঠিক-ঠিকানা নেই। না, কোন কথাই নয় আসাদ, ওদের অমি সত্যি বড় ডরাই।

—কিন্তু...

—আবার কিন্তু। তুমিও ভয় পাও? তোমার গণ্ডারের মতো চামড়া আছে, হাতীর মতো দেহ আছে, সিংহের মতো থাবা আছে, এবং—

—সেতারা মুচকি হেসে বলে—নামও তোমার সিংহ ত। তবু ডরাও?

—আমি আর যাই হই, ভীরু নই, আমাকে বিশ্বাস করো সেতারা।

—বিশ্বাস! ফলেন পরিচিয়তে, সেতারা হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হাসিতে আমাকে চমকে দেয়।

—তাই করবো, কিন্তু আমার হবে ত তুমি?

—হবো।

—খাঁটি?

—খাঁটি।

সড়ক সাফ করি। হাতীর বল এবং সিংহের থাবা ব্যবহার করি। চামড়াকে ঢাল করে মশা-মাছির আঘাত প্রতিরোধ করি।

সড়ক নিঝুম নিস্তব্ধ হয়।

বসন্তে সকাল আসে। সেতারা আর আমি বেড়াতে বের হই। সেতারা এখন সম্পূর্ণ আমার আমিও সেতারার। অবিভাজ্য আমরা। এক আত্মা, এক দেহ, এক অন্তর, এক মস্তিষ্ক। সড়ক নির্জন। কোন শব্দ নেই, কোন গোল

নেই। নির্ঝঞ্ঝাট চলছি। এমন সময় লক্ষ্য করি চৌমাথার মাঝখানে তিনটি নাদুসনুদুস গরু শুয়ে আছে।

—সেতারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলিঃ এত করলাম, তবু কেমন করে যেন গরু তিনটে রয়েই গেলো। তাঁড়িয়ে দেই, কি বলো সেতারা?

—না, ওরা বোবা জাত। ওরা থাক। জাবর কাটুক।

# বিষাদিনী কামিনী

**মাজহারুল ইসলাম**

কোথায় যাওয়া যায়!

পা দুটো টেবিলের কোণায় ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে বসে আছে শহীদ। ওকে দেখলে মনে হয় কি যেন ভাবছে, অতি গভীর অতি জটিল একটা কিছু। কিন্তু সে এখন তেমন কিছুই ভাবছে না। চোখ দেখলে মনে হবে ওপরের ভেন্টিলেটরে ওর চোখ, আসলে চোখ তার সেখানে নেই। মনে যতটুকু সজীবতা থাকলে কিছু একটা ভাবনার অবয়ব মনে খেলতে পারে, তার চেয়ে কিছুটা যেন কম। যতটা সতর্ক হলে চোখে অন্তত কিছু স্পষ্ট ছবি আসে, তার চেয়ে অসতর্ক ওর চোখ। শুধু একটা নির্বোধ অচঞ্চল নিরুৎসুক প্রশ্ন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যার উত্তর শুনতেও তার অলসতা—কোথায় যাওয়া যায়!

অফিস তখন প্রায় জনশূন্য। ও দিকের টেবিল থেকে ফাইলপত্র ওঠাচ্ছে একজন পিয়ন, দরজায় একজন দারোয়ান, আর কাচেঘেরা ছোট ঘরটায় বসে এই কর্মালয়ের কর্মাধ্যক্ষ তার মহিলা টাইপিস্টকে কিছু ডিক্টেশান দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর মহিলা তার কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার হাই হিল জুতোর খটখট শব্দে শহীদ কিছুটা ধাতস্থ হলো। জুতোর শব্দ তরঙ্গে ওর মনে কিছুটা গতি ফিরে এলো, তার সাথে চোখে এলো দৃষ্টি। তার চোখ তখন সামনের কাচের জানালায়। চোখে পড়লো, বিকেলের হলদে আলো গাছের পাতায় পাতায় মাথা নাড়তে নাড়তে মহিলা টাইপিস্টের চুলে এসে লেজ দোলালো—যেন কিছু ছায়ামিশ্রিত হলদে পাখার পাখি। অনুগামী চোখ পিছু পিছু আসতে আসতে একটু নিচে নেমে গিয়ে মহিলার মুখের ওপর স্থির হলো। আর ফিরলো না। অর্থাৎ, চোখ ফেরানো উচিত এমন কিছু অনুভবে এলো না। ধীরে ধীরে আবার নিবে গেল শহীদ।

শহীদের মনে হলো, তার চোখের সামনে একটা কিছু ঘটছে। একটু মনোযোগী হতেই সে লজ্জিত হলো। মহিলা তখন তার দিকে চেয়ে হাসছিল। শহীদ ভাবলো, কি জানি কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম। বোকার মতো চোখ ফিরিয়ে আনলো টেবিলে। একটা লজ্জিত অনুশোচনা ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠেছে তার মনে, যেন তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবার জন্যই কাগজের ওপর এলো-মেলো খোঁচা দিল কলমের সূঁচলো নিবে। একটা চোখ আঁকলো। ঠিক

চোখ নয়, চোখের মতো। একটা নাক আঁকলো তার পাশে, তারপর আবার এলোমেলো দাগ দিলো। তার নাম লিখলো, কাটলো। ঝট করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো শহীদ। মহিলার চোখে চোখ পড়লো। মহিলা হাসি আর চেহারার ভাষায় দূর থেকে বললো, তা হলে যাচ্ছেন?

যাচ্ছি, বলে পকেটে কলম রাখতে রাখতে শহীদ বেরিয়ে এলো।

কোথায় যাওয়া যায়! শহীদ মনোযোগী হলো উত্তরের জন্য। একটা রিক্‌শা ডেকে তাতে চড়ে বসলো, যাও পার্কে যাও। কথাটা এমনভাবে বললো যেন তার সঙ্গে অন্য কেউ আছে, এবং সেই অন্যজন যদি অন্য কোথাও যাওয়ার কথা বলে ফেলে, যেন সেই ভয়েই সে আগে থেকে বলে ফেললো যাও, পার্কে যাও। অথচ তার সাথে কেউ নেই। সে তখন নিঃসঙ্গ, একাকী।

শহীদ ভাবলো, পার্কে যাচ্ছি কেন? মনের ভেতর ভেসে গেল, কিছু ঘাস, ছায়া, গাছ। ঝির ঝির বাতাসে কাঁপানো পাতা, শাপলা, মেয়েমানুষ—কিন্তু কি আসে যায় তাতে। ভাবলো রিক্‌শা ফিরিয়ে নেবে কিনা। আবার ভাবলো, ফিরেই-বা কোথায় যাওয়া যায়—সেই ঘরে ফেরা ছাড়া। প্রেস ক্লাব ছাড়িয়ে রিক্‌শা পার্কের দিকে মোড় নিল। রাস্তার পাশে কিছু কৃষ্ণচূড়ার ফুল বিয়ারের ফেনার মতো উপ্‌চে পড়ছে ডাল বেয়ে। বুকের ভিতরটা হঠাৎ এমন হুহু করে উঠলো কেন শহীদ বুঝতে পারলো না। শূন্যতায় যেন বাতাস বইলো এলোপাথারি, বুকের বাঁধন খুলে সব কিছু যেন ছড়িয়ে পড়তে চায় চারদিকে। তখন রিক্‌শা থামলো পার্কের গেটে।

পার্কে ঢুকতে ঢুকতে শহীদের চোখে পড়লো পূর্বদিকে আর্ট গ্যালারির গেটে আনুষ্ঠানিক আলো জ্বলছে। তখন তার মনে পড়লো, দেশের নানা চিত্রশিল্পীর সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিবস আজ। সে ফিরে এসে আর্ট গ্যালারির দিকে পা বাড়ালো। ধীরে ধীরে এলো আর্ট গ্যালারি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো শহীদ। তার চোখে তখন নানা রঙ, নানা ছবি।

একটা ছবি তার চোখ টানলো। ছবির বিষয় হলো, উপবিষ্ট একটি মুটে-মজুর। ক্লান্ত মুখের ওপর ভেসে উঠছে ফোলা ফোলা রগ, তেল চিকচিকে গা। হাতে আধ-পোড়া একটা বিড়ি। তার পেছনে একটা গাছের কাণ্ড। ওপর থেকে ঝুলে পড়েছে কিছু পাতা। তারো পিছনে কিছু ইঁট-বসানো রাস্তা, আর পেছনে কিছু দোকানপাট। ঘুরে ঘুরে দ্বিতীয় একটা ছবিতে ওর চোখ ঠেকলো। গভীর বন, এলোমেলো গাছ, লতা, পাতা। সবুজ কালোয় মেশানো তার রঙ। বনের ওপার থেকে ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে সূর্যাস্তের বেগুনি লাল আলো। বনের এলোমেলো ঘোরানো-প্যাঁচানো গাছপালাগুলোকে জীবনের জটিলতার মতো মনে হলো, তার ফাঁকে ফাঁকে চিন্ময় আকাঙ্ক্ষার মতো উঁকি দিচ্ছে বেগুনী-রক্তিম আলো।

তখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলো আহ্লাদী প্রজাপতির মতো থলথলে দেহের কিছু সু-বুকবাহী মহিলা ও মেয়ের দল। পত্রিকার আলোকচিত্র শিল্পীরা (শিল্পী?) চঞ্চল হলো। তারা বিশেষ কোনো ক্যামেরা ধরে অপেক্ষা করলো প্রজাপতির পাখা সঞ্চালনের জন্য। মহিলাগণ এবং মেয়েরাও ছবির পাশে চেহারা ধরলো ক্যামেরায়, যেন চিত্রায়িত হওয়ার ভঙ্গিতেই। দর্শকদের চোখ হলো, বুক আর নিতম্বে দোদুলে পেন্ডুলাম্।

অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার একটি ছবির কাছে এলো শহীদ। কিঞ্চিৎ ঘুরপাক খাওয়া একটি পথ। পাথুরে অট্টালিকায় তিন দিক থেকে বন্দী করা হয়েছে তাকে। প্রাসাদের কার্ণিশ শানিত বেয়োনেটের ফলার মতো উঁচিয়ে আছে পথের মুখোমুখি। ফিরে যাবার জন্য যখন সে সিঁড়ি ধরলো, তখন হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে গেল শহীদ।

একটি মেয়ে আসছিল একটি ছেলের পাশাপাশি। চিকন পাতলা গড়ন, যেন কারো চোখে পড়তে চায় না সহজে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে যেন রেখায়িত হতে চায় সমকালের কালিমা। সমকালের সংকট যেন ঘোলাটে হয়ে আছে দুই চোখে। শহীদের মনে মনে বলতে ইচ্ছে করলো, আমি তোমাকে চিনি।

সে এমন একটি মুখ মনে করতে চাইছে যে-দেখতে ঠিক এই মেয়েরই মতো। বেশী খুঁজতে হলো না তাকে। নিজের বাড়ীর চেহারাগুলো খেলে গিয়ে প্রথমে যে চেহারা তার মুখোমুখি হলো, সেই এ। শহীদ আঁতকে উঠলো, কতদিন যাইনি ওদেব বাড়ীতে। রেবাকে অনেকদিন দেখেনি শহীদ। ভাবলো, ওকে না দেখেই বুঝি এই শূন্যতা, সারাদিনের এই অবসতা।

ততক্ষণে সে পার্কের বেঞ্চে এসে বসে পড়েছে। কেমন কুয়াশায় ঘেরা মনে হলো শহীদের। বৈদ্যুতিক বাতিগুলো সব কুয়াশায় আবৃত গ্যাস লাইটের মতো বিধুর। কি জানি, বিদ্যুৎ সংরক্ষণে হয়তো ঘাটতি পড়েছে। রেবাকে ভুলতে চাইলো শহীদ, কিন্তু পারলো না। কতদিন আর অপেক্ষা করানো যায়। রেবা অপেক্ষা করেছে, শহীদ পড়াশোনা করেছে। শহীদ পাশ করেছে, রেবা আশা করেছে। শহীদ চাকরির জন্য ঘুরেছে এখানে সেখানে, রেবা কান পেতেছে খবরের জন্য। শহীদ চাকরি পেলো, বিবাহের দারুচিনি দ্বীপ তবুও দুরাশার দূরদেশ। শহীদ লক্ষ্য করেছে, রেবার অপেক্ষমান চোখ, লক্ষ্য করেছে ক্লান্তির আবরণ, অথচ কিছুতেই কিছু করা যায় না। শহীদ পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেল, কিন্তু পরিবারের সচ্ছলতা তো এলো না। ছোট ভাইবোনদের এখনো স্কুলের বেতন দেওয়া হয় না রীতিমতো, শীতের কাপড় কিনতে এখনো গ্রীষ্ম চলে আসে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ছিদ্র বিদ্যমান। যতই ঢালা যায়, সেই ছিদ্র দিয়ে যেন সব বেরিয়ে যায়। শহীদ জানে, তার বিয়ের জন্য তার মা বাবার কম দুশ্চিন্তা নয়, এবং জানে বলেই

পারে না তার সব দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে কিছু একটা করতে। সেদিন যখন তার জ্বর সারলো, তার মা তার বিছানায় বসে বলছিল, রেবার বয়স বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, ওদের আর কত অপেক্ষা করানো যায়। মন্টুর চাকরিটাও হয় না, কি যে করি। আমার আর কিছু ভালো লাগে না। মায়ের আক্ষেপ ওর খারাপ লাগে—দুঃখ হয়।

কোথায় যাচ্ছি আমি?

শহীদ চমকালো। পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে, অনেক আলো ঝলমল পথ পেরিয়ে, অনেক ডাইনে-বাঁয়ে মোড় ঘুরে সে এখন রেবাদের বাড়ীর গলিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হলো। কখন সে পার্কের বেঞ্চ থেকে উঠলো, বায়তুল মুকাররম পার হলো, জিন্নাহ এভিনিউ পেরিয়ে এলো, অথচ কিছুই তার চোখে পড়লো না। য়্যাকসিডেন্ট হতে পারতো। ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হলো শহীদ। রেবাদের বাড়ীতে যাবে এমন তো কিছু ঠিক করেনি সে। কেন এমন হলো, সে বুঝতে পারলো না। এমন কেন হয়!

রেবাদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালো। ঢুকবে কি ঢুকবে না—একবার ভাবলো, তারপর ঢুকে পড়লো। বাইরের ঘরে তখন আলো জ্বলছিলো। রেবা আর তার বান্ধবী হেসে হেসে কি কথা বলছে। এই বান্ধবীকে শহীদ চেনে। এ পাড়াতেই ওর বাপের বাড়ী। মেয়েটি আলাপী, সুভাষিণী এবং প্রাণবন্ত। ওর নাম শিউলি। নামটা ভারী মিষ্টি লাগে শহীদের। গত বছর ওর বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর আর দেখেনি ওকে।

মেয়েটি ভরা হাসিতে বললো, এই যে আসুন, কি আশ্চর্য...অনেকদিন পরে দেখা, কেমন আছেন? আপনার কথা জিজ্ঞেস করলাম ওকে, একটু শুকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে, ভালো আছেন তো?

হ্যাঁ, ভালো। আপনি কেমন?

ভালো।

কোথায় আছেন?

চিটাগাং-এ।

সমুদ্রের পারে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি, অবশ্য পাহারওয়ালা আকাশ দেখেছি।

শিউলি হাসলো। বললো, সমুদ্রের পাড়ে গেলাম তো কয়েকবারই, কিন্তু সূর্যাস্ত দেখতে পারিনি একবারও। বিকেলবেলা আকাশটা কেমন আবছা ঘোলাটে দেখা যায়। সূর্যই দেখা যায় না, আবার সূর্যাস্ত। এতো রাগ লাগে, তখন আর কি বলবো। বেশী বাতাস না থাকলে সমুদ্রের চাপা আওয়াজ আমার দারুণ ভালো লাগে। কেমন গম্ভীর। একদিন অনেক ঝিনুক কুড়িয়েছিলাম। ছোট ছোট ঝিনুক দেখতে খুব সুন্দর হয়, তাই না রেবা?

তাই। রেবার মুখ ফোটে।

এতো বেশী একটানা কথা শহীদের ভালো লাগে না। অথচ আজ ভালোই লাগছে। মেয়েটা একটু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলে। ভেজা ঠোঁটের ফাঁকে মাঝে মাঝে দাঁত বেরিয়ে আবার লুকোয়, আংগুল দিয়ে কপালের উড়ো চুল সরিয়ে নেয় বারে বারে। ধীরে ধীরে একটা সজীবতা শহীদের মনে সংক্রমিত হতে থাকে।

শহীদ লক্ষ্য করলো, সে ঘরে ঢোকার পর পরই রেবা কেমন বিধুর হয়ে গেল। যেন ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢাকলো একটা গ্যাস লাইট। রেবার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করলো সে। রেবা একটু বিচলিত হলো। চা আনার জন্য অন্য ঘরে চলে গেল। একটা চাপা নিঃশ্বাস শহীদের বুক কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে থেমে গেল।

চা নিয়ে ফিরে এল রেবা। চা খাওয়া শেষ হলে শিউলি বিদায় নিলো। এবং তার সাথে সাথে এই ঘরের আপাত-মুখরতাও চলে গেল। ধীরে ধীরে মেঘলা বিষণ্ণতা ঢেকে ফেললো ওদেরকে। রেবা কোনো কথা বলছে না, শহীদও খুঁজে পায় না কি বলবে। তারপর বললো, কেমন আছো? যেন কিছু বলতে হয় বলেই বললো।

ভালোই। রেবা চেয়ার ছেড়ে জানলার শিক ধরে দাঁড়ালো।

তারপর আবার একটা একঘেয়ে বিরতি। কিছুক্ষণ পর চোখটা বাইবের দিকে রেখেই প্রশ্ন করলো, মণ্টুর চাকরি হয়েছে?

হঠাৎ উত্তর থেমে গেল শহীদের মুখে। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললো, না, এখনো......

আবার নৈঃশব্দ। এই একটানা নৈঃশব্দ কিছু অস্বস্তির বীজ ছড়ালো এবং তা ডালপালা গজিয়ে ছেয়ে ফেললো শহীদকে। শহীদ অস্থির হলো। কিছুতেই আর বসে থাকতে পারছে না। দাঁড়িয়ে পড়লো সে। আমি যাই রেবা—বলে দরজার কাছে চলে এলো। রেবা একটু মুখ ঘুরিয়ে যেন শহীদের ছায়াকে বললো, মায়ের সাথে দেখা করবে না? শহীদ বললো, বড্ড খারাপ লাগছে আমার। আজকে থাক। তুমি বলে দিও আমি চলে গেছি। আমি যাই। রেবা মুখ ফেরালে অন্ধকারে।

শহীদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। বাইরে তখন আঁধার। রাস্তায় অনেক দূরে একটা বাতি জ্বলছে, তার কিছু আলো এসে পড়েছে বন্ধ্যা কামিনী গাছটার পাতায় পাতায়। চিকচিক করছে পাতা। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে হলো শহীদের। রেবা বলেছিল, দেখো, আমাদের এই বন্ধ্যা কামিনীর ডালে একদিন ঠিক ফুল ফুটবে। শাদা শাদা গুচ্ছ গুচ্ছ গন্ধমাতাল ফুল।

# পরাজিত খেলোয়াড়

**আহমদ বুলবুল ইসলাম**

অনেক দিন পর আলতাফ এসেছিলো আমার অফিসে।

আমার বন্ধু, স্কুলজীবনের বন্ধু। অবৈধ প্রেমের মতো যে বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনিবার্য।

অনেক আনন্দ আর বেদনার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আলতাফ। যদিও আমি আমার অন্যসব বন্ধুদের সংগে তাল রেখে উঠতে পারিনি, তবুও অন্তত আলতাফের সংগ আমার কাম্য। এখনো আমার উন্নতি হবে বা হতে পারে এ রকম আশা সে পোষণ করে।

অথচ সেই আলতাফের সামনেও আমি আমাকে সবটুকু প্রকাশ করতে পারি না। ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমান বলেই জাহির করতে চাই। বাস্তব জীবনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে ওর চোখে নিজেকে এক সুউজ্জ্বল জগতের নায়করূপে প্রতিভাত করতে চাই।

তুমি পরীক্ষা দাওনি কেন?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম। বুদ্ধিমানের মতো হাসলাম। কিন্তু সে হাসি ওকে কি বোধ দিয়েছিলো জানি না।

সময় পাইনি এই আর কি। আর তাছাড়া পড়াশোনাও করা হয়নি। কী করে আর দেবো।

পর পর তিনটি বাক্যে আমার সবটুকু ওকে জানিয়ে দিলাম। অথচ অনেকেই তো চাকরি করেও বেশ পাস করে যাচ্ছে।

আলতাফ আমাকে আশান্বিত করতে চাইলো।

হাঁ, তা যাচ্ছে বৈকি। শুধু আমিই পারলাম না বন্ধু। যাক্ ওসব কথা। তার চেয়ে বল কি খাবে? সেভেন আপ, কোকা অথবা ফানটা?

একটা হলেই হলো।

অতএব, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কোকা কোলার তরল ঠান্ডা পান করলাম। যাবার সময় হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললোঃ তুমি যাবে কিন্তু।

চেষ্টা করবো, বললাম আমি।

চেষ্টা নয়, যেতেই হবে।

বুঝলাম অনেকদিন আগের মতো প্রাণের উচ্ছলতায় ও আমাকে অন্তরঙ্গ করতে চাইলো।

এবার মনে পড়লো অনেকদিন হলো ওদের ওখানে যাইনি। আগে কতো যেতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পে, তর্কে আর হুল্লোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তাম।

কই, আগের মতো আর বেহিসেবী হতে পারছি কই। সবকিছু ভেবে চিন্তে এবং বিচার করে করতে হচ্ছে। ওর অনুরোধের আন্তরিকতায় আমার মনে একটা হারানো আনন্দের আঁচল দুলে উঠলো।

আমি বললাম, হ্যাঁ যাবো।

পরদিন রোববার। অতএব অফিস বন্ধ। একটু দেরি করেই বিছানা ছাড়লাম। রেডিও থেকে গান ভেসে আসছিলো। ছুটির গান। আমরা সবাই কী ভয়ংকর ভাবে ছুটি চাই। কিন্তু ছুটি আমাদের মেলে না কখনো। তবুও আমরা আজীবন তেমনি একটি ছুটির অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করব।

সকাল এগারোটার মধ্যেই কাপড় চোপড় পরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। রবিবার বলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বস পেয়ে গেলাম—ডবল ডেকার।

ফার্মগেটে নেমে পড়ে ওদের বাসার দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেকেন্ড ক্যাপিটালের পার্কের পাশ ঘেঁষে। সবুজের বিনম্র আমন্ত্রণ সমস্ত পার্ক জুড়ে। লিচু গাছগুলির নীচে অনেকে বসে, আবার কেউ শুয়ে আছে। আর আমি সারি সারি কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির নীচ দিয়ে ছায়াকে ভালবেসে হেঁটে যাচ্ছিলাম। শীতল বাতাস আমাকে ভালবাসলো। কেননা বাসের ভেতর অনেক লোকের ভীড়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

স্কুলজীবনে এসব পথে কত হেঁটেছি। আর আমি এখন এই বিধ্বস্ত নগরের নষ্ট ভ্রূণে আমার আজন্ম ভালবাসাকে খুঁজে মরছি।

সেই তখন এতো রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তাঘাট আর সেকেন্ড ক্যাপিটালের বিচিত্র ভাস্কর্যের কল্পনায় নূতন রাজধানী গড়ে ওঠেনি।

যে জায়গায় এখন এতো দালান কোঠা তখন সেখানে ভুট্টা আর জোয়ারের ক্ষেতগুলো সবুজ টিয়াপাখির কলকাকলিতে মুখর ছিল। কতো লুকোচুরি খেলেছি ভুট্টার ক্ষেতে!

হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। ওই তো এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে। একটা জেটপ্লেন গর্জন করে উড়ে গেলো আমার মাথার ওপর দিয়ে।

রাস্তায় আলতাফের বড় মতি ভাই-এর সঙ্গে দেখা। কি হে, কামাল নাকি?

জি, আমি।

আমি বাড়ীর সদর দরজা ফেলে ঘুরপথে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মতি ভাই বললেন, এদিকে এসো।

অতএব, ছন্দপতনের মতো বন্ধুত্বের দাবিতে সদর দরজা দিয়ে আলতাফের ঘরের দিকে হেঁটে যেতে যেতে শুনলাম, নাজমা বলছে, বৈঠকখানায় বসুন, এখুনি আসছে ভাইয়া।

পেছন ফিরে তাকালাম।

সেই ছোট্ট নাজমা এক বৎসরে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। রীতিমতো ক্ষুদে মহিলা। লুইজা মে অলকট্-এর 'লিট্ল্ ওমেন'-এর ক্ষুদে মহিলার মতো। শালোয়ার কামিজ ছেড়ে শাড়ী ধরেছে নাজমা! আমার যেন কেমন সংকোচ বোধ হতে লাগলো।

আলতাফ আমাকে দেখে খুব খুশী হলো। ও তখন গোসল করতে যাচ্ছিল।

আমি বললাম—আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি বল?

কেন একথা বলছো কেন? আলতাফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

এই তো দুপুর বারোটা বাজলো। এটা কী আর বেড়াবার সময়। আমি সবসময় অসময়ে এসে পড়ি, কী বলো?

আলতাফ শুধু হাসলো।

ও এতো সুন্দর হাসতে পারে। এতো আন্তরিকতার হাসি। অথচ আমি পারি না।

ও বললো, তুমি একটু বোস, চট করে গোসলটা সেরে আসি আমি।

তাই যাও বন্ধু। তোমার দরকারী কাজগুলো সেরে নাও, আর আমি এই দুঃসময়ের ঘরে বসে একজন বন্ধুর প্রতীক্ষা করতে থাকি; একজন মানসীর প্রতীক্ষা করতে থাকি। মনে মনে ভাবলাম আমি।

আলতাফ চলে গেলো। আমি অগত্যা ওর পড়ার বইগুলি অনিচ্ছায় হাতড়াতে লাগলাম। অক্ষরগুলো আমার কাছে অজানা অজ্ঞাত। অক্ষরের গোলকধাঁধায় আমি প্রবেশ করতে পারলাম না। কিন্তু তবু পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

জানালার বাইরে তখন বর্ষার রোদ।

বাতাবিলেবু, আতা আর আম গাছের পত্রে তার ঝাঁঝালো সদম্ভ প্রকাশ। সবুজ কচু গাছের ডগায় তার আন্তরিক আলিঙ্গন।

আমার সামনে বসে মতিভাই পত্রিকা পড়ছিলেন। চুপচাপ অনেকক্ষণ সময় চলে গেলো। আকারহীন নৈঃশব্দের ক্যানভাসটাকে হঠাৎ কথার ধ্বনিতে রঙিন করতে চাইলেন তিনি।

তারপর, তোমার খবরাখবর কী?

আমার? আমার তো কোন খবর নেই!

আমার এ ধরনের কাব্যিক ও দার্শনিক টাইপের উত্তরগুলোকে আমি ভালবাসি! কেননা ওদের আঘাতে কেউ আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। আমার দৈন্যতাকে ঢাকার এর চেয়ে বড় কৌশল আর কী আছে।

আলতাফ এলো। বললো, চল্ ক্যারাম খেলি।

হ্যাঁ চল। আমি উৎসাহিত হলাম।

অতএব, খেলা চললো।

কিন্তু খেলা জমলো না। কেননা, আমি শুধু হেরে যাচ্ছিলাম। আগে হেরে গেলে এমন জিদ হতো, ওকে মনে হতো শত্রুর মতো। অন্যায়ভাবে জিততে গিয়ে গুটি ছড়িয়ে রাগে শুধু জ্বলতাম। কিন্তু আগে আমি জিততামও। বেশীর ভাগই আমি জিততাম। নাজমা, জ্যোৎস্না'পা মতিভাই ওরা সবাই প্রশংসা করতো আমাকে। অথচ আজকে আমি হেরে যাচ্ছি।

কিন্তু হেরে যাবার দুঃখ বা জিতে যাবাব দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আজ আর কোনোটাই অনুভব করতে পারলাম না।

মতিভাই বললেন, আমি ওর সাথে একটু খেলি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু পবাজিত হতে এবং পড়ে পড়ে মার খেতে দেখে তাব পৌরুষ বোধ হয জেগে উঠেছিলো।

মতিভাই-এর সংগে আলতাফ ভালো পারছিলো না। তখন নাজমা এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

জ্যোৎস্না'পাও এলো।

আমি কম চেনার মতো হেসে বললাম, কেমন আছেন?

চাকরি করে কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, বাব্বা!

কই না তো। সহজ হতে চাইলাম আমি।

পরীক্ষা দাও নি কেন?

পরীক্ষা? মানুষের জীবনটাই তো একটা চরম পরীক্ষা! আবার তেমনি করে হাসলাম।

জ্যোৎস্না'পা কি ভেবেছিলেন জানি না।

নাজমা খেলা দেখতে বসলো, এখন তোমাকে একটা নীল গেম দেয়া যেতো ভাইয়া!

এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললোঃ আপনি খুব ভালো পারেন, না?

আমি? এককালে পারতাম।

আমি চেয়ারে বসে বসে ওদের খেলা দেখছিলাম। আব হাবিয়ে যাওয়া ক্যারামের গুটিগুলি চেয়ারের তলা, চৌকির কোণা, আলমারীর পেছন থেকে সংগ্রহ করে দিচ্ছিলাম শুধু।

আর তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম, কবে এই দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ কমে গিয়ে অপরাহ্ন আসবে—সেই বিকেল বিকেল প্রদোষ লগ্ন! নারকেল গাছের চিরল পাতার চিকণ বিলম্বিত ছায়া কবে রান্নাঘরের টিনের চালে আলিঙ্গন দেবে?

আমার কানে শুধু ক্যারামের খট্ খট্ শব্দ, মারভেলাস, এক্সেলেণ্ট, ফার্স্টক্লাস, শট্ শট্, এই আর একটু হলেই বাজী মেরে দিয়েছিলাম—ইত্যাকার শব্দগুলো যেন এক দেয়ালের ওপার থেকে গুঞ্জন ধ্বনির মতো ক্ষীণ হতে হতে কানে এসে আঘাত করছিলো। সবাই বাজী মেরে দিচ্ছে।

চমৎকার!

আমিই শুধু হেরে গেলাম।

# বিনিদ্র রাত্রি, সোনালি পিপাসা ও একটি নারীমুখ

**মুহম্মদ সিরাজ**

ইদানীং আমি খুব স্মৃতিবিলাস হয়ে উঠেছি; নানান রকম সুখ-সমৃদ্ধির কল্পনা করতে ভালো লাগে; এভাবে আমার সময় বেশ কেটে যায়। এখন রাত্রি, ঘড়িতে আটটা বাইশ, আমি নিজের ঘরে, বিছানায় শুয়ে আছি। আজকাল মাঝে মাঝে আমি অফিস থেকে ফিরেই বিছানায় শুয়ে পড়ি, ক্রমে এটা আমার মজ্জাগত অভ্যেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে; কেন না অফিস থেকে ফিরে বেশীক্ষণ মেরুদন্ড সোজা করে বসে থাকতে পারি না, শরীরে ক্লান্তি আসে, আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অনেক দেখা-অদেখা মুখ প্রত্যক্ষ করি, এসময় এলোমেলো সুখ কল্পনা আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে।

এখন আমার মনে পড়ছে জিনাত আরাকে। জিনাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে আজিমপুরায় এক বন্ধুর বাড়ীতে। কী যেন কাজে ও ঢাকায় ছিলো। সেই পনেরো দিনের পরিচয়ে আমাদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো। জিনাত তখন কুমিল্লায় থাকতো। ওখানে ফিরে যাওয়ার পর সে হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলো। কোনো মেয়ের কাছ থেকে চিঠি পাওয়া জীবনে প্রথম। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো, জিনাতকে একটা দীর্ঘ চিঠি দিই। কয়েক দিন আচ্ছন্নের মত কাটিয়েছিলাম। কিন্তু জিনাতকে আজও কোনো চিঠি লেখা হয়নি। আমার মনে হয়েছিলো, ও হয়তো উত্তর না পেয়ে একটা রিমাইন্ডার দেবে। রোজ পোস্টম্যানের অপেক্ষায় থাকতাম। কিন্তু আজো জিনাতের বা অন্য মেয়ের চিঠি আমার কাছে আসেনি। এখন আমার মনে জিনাতের সেই প্রথম ও শেষ চিঠির অনেক শব্দ জেগে উঠছে। আমার ভালো লাগছে ওর নধর শব্দগুলি, যা পৌনে তিন বছর আগে লেখা হয়েছিলো, নিয়ে খেলা করতে। আমার ভালো লাগছে ওর স্নিগ্ধ শ্যামল মুখ স্মরণ করতে। আমি অনুমান করছি, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, যুবতী এখন সহজ সুখ ও শান্তির খোঁজ পেয়ে গেছে। জিনাত, আজো তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। তুমি কি এ ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়েছিলে? কিন্তু আমি কেমন করে জানাই, এই পৌনে তিন বছরে মনে মনে কতোবার তোমাকে চিঠি লেখা হয়েছে! আমি কেমন করে জানাই এই

মুহূর্তে দীর্ঘ স্মরণ-বিস্মরণের পর আবার তুমি স্মৃতিময় জেগে উঠেছো! তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তুমি কি এখন স্বামীর সংসারে? কোন্ শহরে আছো তুমি? এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?

অফিস থেকে ফিরে দু'টুকরো বাটার টোস্ট খেয়েছি, এখনো চা খাওয়া হয়নি; এতক্ষণ চা না খাওয়ার জন্যে এখন কপালে মৃদু যন্ত্রণা বোধ করছি। নীচে গিয়ে চা খেতে হবে, কিন্তু শরীরে বড়ই আলস্য, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। কয়েকদিন আগে রাহাতের কাছ থেকে খান-চারেক বই এনেছি, মুসা ভাইয়ের অনেক পত্র-পত্রিকা টেবিলে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে, এখনো একটিও পড়া হয়নি। বই-পত্রগুলো যথাযথ ফেরত দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সে ব্যাপারেই এত আলস্য! কেন দিন দিন এত অলস হয়ে উঠেছি! এই মুহূর্তে এইসব প্রশ্ন আমাকে বিপন্ন করে তুলছে। এখন টেবিলের দিকে চেয়ে থাকার মাঝেই আমার তৎপরতা খোঁজা হচ্ছে, আমি কী এখন 'করুণার আমি' পড়তে পারি!

এখন আর কবিতা ভালো লাগবে না। কিন্তু রবিবারের সকালে মাশুকুর রহমান চৌধুরী আসবেন, ওঁর প্রথম কবিতার বই 'করুণার আমি' সম্পর্কে ঐদিন নিজস্ব মতামত জানানো উচিত। আজ শুক্রবার, মাঝে একটা দিন। কী করা যায়! বইটা পড়বো? কিন্তু আমার যে কিছুই পড়তে ভালো লাগছে না। আজকাল গল্প উপন্যাস সব সাজানো কাহিনী মনে হয়, কবিতাও যেন অর্থহীন প্রলাপ! এককালে এইসব গল্প উপন্যাস কবিতা আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অন্তর্গত ছিলো। ক্রমে যেনো সব কিছু থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সব ব্যাপারেই এক রহস্যময় নিষ্ক্রিয়তা আমাকে গ্রাস করেছে! এই স্থবিরতা অসহ্য হয়ে উঠছে। কতোদিন আমি খোলা গলায় গান গাইনি! কতোদিন আমি খোলা গলায় গাইনি! কতোদিন আমি বর্ষার নদীতে সাঁতার কাটিনি। সব কিছুই যেন গতজন্মের। অথচ সবই একদিন রক্তের অন্তর্গত ছিলো। কেন আমার পুরনো স্বভাব আর ফিরে আসে না! কেন ওই গান গাওয়া নদীতে সাঁতার কাটা বুকের আড়াল ঝরে; হায়, নিঃশেষে হারায়!

ভাবতে ভাবতে বিরক্ত নিজের উপর, অ্যাসট্রেতে আধ খাওয়া সিগারেট গুঁজে দিলাম। এসময় নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হচ্ছিলো; ইচ্ছে করছিলো, নির্মম আঘাতে নিজেকে জর্জরিত করি; ইচ্ছে করছিলো, তেতলার ছাদ থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দেই; ইচ্ছে করছিলো, গোটা গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন জেবলে দেই...।

কিন্তু কিছুই না করে পাশ ফিরে শুয়ে ক্লান্ত চোখ বুঁজলাম।

আমি একটা আধা সরকারী অফিসে-চাকরি করি। সামান্য মাইনে তবু রোজ দশটায় অফিসে যাওয়া আর পাঁচটায় ফিরে আসা—আর ভালো লাগে না।

আমি এক নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতায় ক্রমেই জড়িত হয়ে যাচ্ছি। আমি যেদিকে তাকাই শুধু অচেনা মানুষ; সকলেই যেন ঠিকঠাক বেঁচে বর্তে আছে শুধু আমিই যেন নিজের শবদেহ কাঁধে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো হাঁটছি; কেন আমাকে এভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে! আমি কী নিজের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি?

আমাকে যেন আরো দূরে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? কোথায়? তুই কোথায় যাবিরে ভাই? কোথাও তুই স্বীয় সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রাভিলাষে যথাযথ পেঁছে যেতে পারিস না, তুই মহাকাল নিয়ন্ত্রিত, তুই অসহায় সমর্পিত আপন ভবিতব্যে—যেখানে গূঢ়তম অন্ধকার গহনে আপনাপন ভবিষ্যত রচিত হয়, তুই সেই অসীম শক্তির অধীনে—যে চিরদিন প্রতিটি মানুষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে, এবং অদৃশ্য শক্তি তোকে এক রহস্যময় অজানায় নিয়ে যাচ্ছে, এবং একদিন তুই অন্তিমে পেঁছে যাবি। সেই মহাশূন্যে অনন্ত অন্ধকার, অন্ধকারে তোকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না, সেখান থেকে আর তোর ফিরে আসা হবে না, অনন্ত অন্ধকারে তুই অণুতম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি

তবে তো দু'দিনের জন্যে এই পৃথিবীতে আসা। অনন্ত মহাকালের বুকে কতো সামান্য সময় আমরা এই পৃথিবীতে আছি! একদিন চলে যেতে হবে; চলে যেতে হবে বলে কেন সব কিছু নিরর্থক হয়ে যায়! কেন সহজ আনন্দে জেগে উঠতে পারি না! কেন সব কিছু নিরর্থক, কেন সব কিছু উদ্দেশ্যহীন—কেন সব কিছু আমাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে! কোন কিছুই আমি সঠিক ভেবে উঠতে পারি না, শুধু মনে হয়, একদিন চলে যেতে হবে...

আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে সেই প্রথম অস্ফুট যৌনচেতনা বালক বয়সে—তিতাসের জলে সাঁতার কাটছি—সেই আমার প্রথম—সেই প্রথম—আমি বোধহীন অসীম রহস্যে—আমি তিতাসের জলে সন্তরণ কালে সহসা জীবনের চরমতম পুলকে—তারপর থেকেই আমার সর্বনাশ—ক্রমাগত যৌন প্রহার আমাকে তিলে তিলে অসুখী করতে থাকে—আমি জানি, তুই-ই আমার সর্বনাশের মূল, তুই ক্রমশ আত্মার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিস, আমি তোর কাছ থেকে—শরীরের অধিকার থেকে ঊর্ধ্বে চলে যেতে চাই; কিন্তু ক্রমাগত যৌনপ্রহার—এবং এখন আমি নদীর জলে—সন্তরণকালে প্রথম অস্ফুট যৌনচেতনা—তখন আর বালক বয়সে—অসহ্য পুলকে আমি তখন সমগ্র শরীরে—বিবশ হতচেতন—আজ আমার মনে পড়ে, নদীর জলে সন্তরণ কালে—আজ সকালে আমি কিঞ্চিৎ মুড়ে ছিলাম, মোরাভিয়ার একটা গল্প গতরাত্রে শুরু করেছিলাম, সকালে, ঘড়িতে সাড়ে সাত আট হবে, শেষ করেছি; একটি কিশোর, সমুদ্রের ধারে বিধবা মার কাছে থাকে সেই বালক, তার প্রথম যৌন-চেতনা, মায়ের সঙ্গে অন্য এক পুরুষের রহস্যময় আচরণ, একটি যুবক ও

ধীবর বালকদের সঙ্গে ওই কিশোরের আলাপ ও মেলামেশা, জীবনের এক গূঢ় রহস্য ক্রমে স্বচ্ছ হচ্ছে, ব্রথেল—মা, আমি তো আর সেই ছোট্ট শিশুটি নেই, আমি যে বড় হয়েছি; তুমি কেন তা মানতে চাও না। তুমি কেন আজো—আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে—তখন আমার বালকবয়সে—তীব্রতম পুলক—মনে পড়ছে—সন্তরণকালে—মনে পড়ছে—হায়, তারপর থেকেই আমার সর্বনাশ, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে অসুখী, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে গহন নিঃসঙ্গতায়—অথচ আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

আসলে অনেক কিছুই এখনো আমার করণীয় আছে, অনেক কিছুই বাকী থেকে গেছে, কোনো অসম্পূর্ণতা আমার আর সহ্য হবে না, এবার আমাকে প্রতিটি কাজ নিপুণ ভাবে সমাধা করতে হবে, আমার হৃদয়ে কুয়াশা ও তুষার ও মৃত্যু ও অন্ধকার জমে আছে, রৌদ্রে সব কিছুই সম্পূর্ণ ঝরে যায়, মুছে যায়, প্রচুর সূর্য চাই—সূর্য চাই...

একদিন কুমিল্লায় যাবো। সেখানে জিনাতের খোঁজ করতে হবে। ও এখন কেমন আছে, বিয়ে হয়েছে কিনা, না কী কুমারী জীবনে এখনো লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে,কতোদূর পড়াশোনা হলো, বি· এ· পাশ করেছে কিনা—সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিতে হবে। দেখা হলে ওকে বলতে হবে, একদিন রাস্তার ভিড়ের মধ্যে তোমার মতন একটি আশ্চর্য সুন্দর মেয়েকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, আমি ডাক দিতে উদ্যত, সহসা দেখলাম, অন্য মেয়ে; তখন তোমাকে খুব বেশী করে মনে পড়ে গিয়েছিলো, তখন আমি শুধু তোমার কথা ভাবছিলাম।

কিন্তু কোনোদিন জিনাতকে এসব কথা বলা হবে কি! আমি তো কত জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবি, শেষ পর্যন্ত প্রায় কোথাও যাওয়া হয় না। হয়তো কুমিল্লায়ও যাওয়া হবে না, হয়তো আর কোনোদিন জিনাতের সঙ্গে দেখা হবে না। যা কিছু এতোক্ষণ ভাবলাম—সবই অলস ভাবনার জন্য, একদিন সব স্মৃতিহীনতায় চলে যাবে, এই সব শব্দ কোনোদিন স্নিগ্ধ উচ্চারিত হবে না, শুধু জনতায়, মানুষের ভিড়ে মাঝে মাঝে ভিন্ন নারীর মুখে জিনাতের ইম্প্রেসন দেখে চমকে উঠবো, আমি ডাক দিতে উদ্যত হবো, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখবো, অন্য মুখ উদাসীন সুদূরতায় ভেসে যাচ্ছে। অথচ পর-মুহূর্তে আমি সেই নারীর শরীর দেখে উত্তেজিত হবো, শুধু শরীর—শুধু যুবতী শরীর তখন আমাকে সমগ্র অধিকার করবে, নিমেষের মধ্যে জিনাত ও যাবতীয় স্নিগ্ধ অনুভব বিস্মৃত হয়ে আমি তখন শরীরময় সেই যুবতী শরীরে; অসহায় মনে হবে, ওই যুবতীর কাছে সুখ ও শান্তির খোঁজ পাওয়া যাবে, আমি সুখী হবো; কিন্তু হায়, স্থির জানি, দেহের প্রতি উপর্যুপরি আঘাত ও অগ্নিদহনে রক্তাক্ত প্রতিদিন ঝরে যাওয়া ছাড়া কোনো ভবিতব্য নেই, শরীরের হাত থেকে আমার আর কোনো উদ্ধার নেই; অথচ উদ্ধার চাই,

শান্তি চাই, অথচ প্রতিদিন সমগ্র শরীরে নিঃশেষে ঝরে যাই, কোনো উদ্ধার নাই...এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগের স্মৃতি মনে আসছে,—বিকেল বেলা আমি রাস্তায়, এলোমেলো এমন হচ্ছে, চারপাশে অনেক লোকের যাওয়া আসা, আমি সকলের মুখভাব লক্ষ্য করছিলাম। এ সময় লক্ষ্য করলাম, একটি যুবতী, তন্বী শরীর, আমি ওকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, প্যাসোনেটলি হেঁটে যাচ্ছে। ওর ওই গমনভঙ্গি ভীষণ উত্তেজক, আমি মোহাবিষ্ট, তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। অতঃপর আমি অসহায় অনুসরণে, কোনোমতেই বিপরীতে চলে যেতে পারছিলাম না। বিকেলে আমি সাধারণত ছুটির দিনে, বাসার আশপাশেই ঘোরাফেরা করি, প্রয়োজন না থাকলে দূরে যাই না। কিন্তু সেদিন মেয়েটিকে অনুসরণ করে অনেক দূরে চলে এসেছি, এতো দূরে—বাড়িঘরগুলো, এই রাস্তা—সব আমাকে ভিন্ন অনুভবে—এক অপরিচয়ের মুখোমুখি টেনে আনছিলো। তখন বিকেলের শেষ আলোটুকুও নিভে আসছে, আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করে একটা নির্জন গলিপথে এলাম। তারপর সেই গলি পার হয়ে আরেক গলিতে, তারপর আবার ভিন্ন গলিতে বাঁক; তখন সেখানে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে, অথচ রাস্তায় আলো জ্বলছে না, শুধু নক্ষত্রের রহস্যময় মৃদু আলোয় আমার দু'চোখ ওই অস্পষ্ট নারীদেহে সমর্পিত অনুসরণ করছিলো। গলিতে কোনো আলো জ্বলছে না! কেন আশপাশের বাড়িগুলো এত অন্ধকার! আমি অবাক ভাবছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিলো, মেয়েটিকে ডেকে বলি, তোমাকে এখন আমার ভীষণ প্রয়োজন; আমি সহজ আনন্দে যেতে চাই, তুমি আমাকে সুখ ও শান্তির পথ নির্দেশ করে দাও। কিন্তু কিছু না বলে আমি, অন্ধকারে ওর শরীর ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চলার গতি দ্রুত করলাম। তখন আমার একমাত্র বাসনা, যুবতীর খুব কাছে যেতে হবে; যেন কাছে গেলে ওর আত্মার সৌরভ পাওয়া যাবে, যেন কাছে গেলে ওর শরীরের অনেক খবর পাওয়া যাবে; অসহায় আমি দ্রুত হাঁটছিলাম। ক্রমে ব্যবধান কমে এলো, তখন আমি এতো কাছে—হাত বাড়ালে ওর শরীর স্পর্শ করা যায়। আমার ইচ্ছে করছিলো, প্রচণ্ড আলোয় ওর সম্পূর্ণ অবয়ব দেখি। কিন্তু গলিপথে অন্ধকার, নক্ষত্রের মৃদু আলো ছাড়া আর কোনো স্পষ্টতা নেই। এ সময় খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিলো, ওই রহস্যময় অন্ধকার পার হয়ে যুবতীর মুখ কোনোদিন স্পষ্ট দেখা যাবে না। দারুণ ক্ষোভ হচ্ছিলো। কী করা যায়! কী করা যায়! যুবতী এখনি হয়তো আরো গহন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে; হায়, কী করা যায়! এ সময় আমি প্রায় আত্মবিস্মৃত, সহসা টের পেলাম, বাসা থেকে বেরোনোর সময় হাতে একটা টর্চ নিয়ে এসেছি। বস্তুত সত্যিই তখন আমার হাতে টর্চ, বোতাম টিপতেই নিমেষ মধ্যে প্রবল আলো, সেই আলোয় যুবতী মুখ ফেরাতেই

দেখলাম, বীভৎস এক মুখ—যেন পৃথিবীর যাবতীয় রোগ ওই মুখে বাসা বেঁধেছে, অমন ভয়ঙ্কর মুখ আমি আগে আর কখনো দেখিনি; হাত থেকে টর্চ পড়ে গেছে, আমি নিদারুণ আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢেকেছিলাম।

। ঘরে আমি একা। এলোমেলো স্মৃতিতাড়িত; সেই ভয়ঙ্কর মুখ এখন আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তবু সেই অন্ধকার গলি পথের স্মৃতি থেকে সরে আসার মানসে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলের কাছে আসতেই নজরে পড়লো, ঘড়িতে দশটা সাতাশ। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন আমাকে স্টোভ জ্বালিয়ে রাতের খাবার তৈরি করে নিতে হবে। একথা মনে পড়তেই আমি ভীষণ বিরক্ত বোধ করলাম। ঘরের বাইরে এসে টের পেলাম, বায়ু চড়ে গেছে, আজ আর আমার চোখে একটুকুও ঘুম আসবে না। সারারাত জেগে কাটাতে হবে, সারারাত অমি সেই ভয়ঙ্কর নারীমুখ, জিনাত—বালক বয়সে তিতাসে সন্তরণ, যৌনপ্রহার, মোরাভিয়ার সেই বালক, সহস্র সুন্দরতম মুখ ইত্যাদি সমর্পিত ক্রমেই অপ্রকৃতি উন্মাদ হয়ে উঠতে থাকবো। কেন না কিছুক্ষণ আগে আমি আবিষ্কার করেছি, গতকাল আমার স্লিপিং ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেছে।

# বৃষ্টি

**আলাউদ্দিন আল আজাদ**

বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল ধরা শুকনো মাঠ আর পাতা-ঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতিদূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এর পর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আসমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্র ধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালাপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাট খেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু তাতে আসবে না একটুকু ক্লান্তি। কেননা, নতুন ফসলেব খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।

কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে দু'একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি, কিন্তু এর বেশি কিছুই নয়।

এর পর এলো বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খাঁ-খাঁ শূন্য, নীচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নক্‌শার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। দুপুর বেলা খেতের আলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হাঁ করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশু-শস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেরাদরানে-ইস্‌লাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কি বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। কিতাবে আছে খোদার গজব নামে তখনি, যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়।

আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরি-ডাকাতি বদমায়েশিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ্ নেই, জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি। মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রহমানুর রহিম, ইচ্ছা করলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর ধ্বনি-তরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ্। থুতনিতে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালের মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সাহেব যা বলবেন, তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সকলের মনে রাখতে হবে, কু-কর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা আস্তাকফেরোল্লা। এই অঞ্চলে, আশে পাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের দুর্‌রা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলি দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ, তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্যিকারের অপরাধকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন 'মেঘের নামাজ' হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুফী মৌলানা মহিউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পরে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লা, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে উঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোক পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর দেখলেন অগণিত টুপির শোভা, হোক না সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লা দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান সুরুজের মালিক, তোর অঙ্গুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর

একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে, তুই!'

'আল্লাহুম্মা আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন!' সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লার সাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জার-জার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মাইয়াসসেফুন, আস্‌সালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুন কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাঙ আর বিষ-কাঁটালির গাছ রেখে রাতের পরে রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলা পাতায় ফকির-ফাকরাকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাক-চক্ষু নীল, এক খণ্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈ-কি! সুতোর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়। অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই হয়েছে চরম বোকামি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত; কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম খরচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরো হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাওয়া-গাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎ-এর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে দান-খয়রাত করলেই হল।

জালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচিরমিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে ধাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—'মিয়া সা'ব এখানে? মসজিদে যান নি?'

'না শরীরটা খুব ভালো নয়।' হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'তা' ছাড়া তোর গিন্নি মা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।'

দিন পনরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বৌকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস, সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তার মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা' একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়সে যাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

'হাসালেন হাজি সাহেব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?' মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—'আপনি ক'ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।'

হাজি কলিমুল্লার চোখের তারা দুটো খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তার হৃৎপিন্ডটা ধুকধুক করছিল; কিন্তু বাইরে আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এতো শীগগীর ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন,—'দেখুন তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর—আর আমার ফাই-ফরমাশটা করতে পারলেই হল।'

'তাতো বুঝলাম।' মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,—'ভাঙা-নাওয়েও কাজ

চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে। কিন্তু কোন্‌টা আমরা চাই। কোন্‌টা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?'

এরপর সাতকানি জমি সাফ-কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়েস একুশ-বাইশ বছর হবে। এ-দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, সে-হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বে-মানান হয়নি!

রান্না ঘরের হাঁড়ি পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে বসলো। হাজি সাহেবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে জিগগেস করলে,—'কিরে কিছু খবর আছে?'

জৈগুন বলল,—'আছে।'

'কি শুনি!' তসবিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লার, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

'আমি আজ গিয়াছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শবিলের দিকে।' দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,—'ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।'

হাজি চিন্তিতভাবে জিগগেস করলেন,—'ওর জামাই না কবে মারা গেছে?'

'তা সাত-আট মাস তো হবেই!' জৈগুন বিশেষ করে বলল, 'কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের।'

'তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক?' হাজি কলিমুল্লা যেন সত্যদর্শন করেছেন, তার চোখে আশার আলো ফুটে উঠল। নিচু গলায় জিগগেস করলেন,—'আচ্ছা বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে তাকে দেখলি?'

'হাঁ', দেখলাম। অসুখ এখনো সারে নি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।'

'তা' হোক, তা' হোক।' হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,—'শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস।'

'হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনে নি।

রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না-হলে মেয়ে-মানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায়?'

'যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ-কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন?' হাজি আবার তস্‌বিহ্ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,—'তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।'

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা। তার কপালের বলি-রেখা আরো কুঁচকে গেলো। তসবিহর গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ-কাজ আর কারো নয়। অল্প বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা স্বামীর সঙ্গ একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা। তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী। যেমন তেমন দু' একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিন মজুরি করত, কালা জ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিড়ে ভিজে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা' সম্ভব? থানা আর পুলিস রয়েছে যে। তা'হলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরা-গাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমা-চাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তা' বাঁশ ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝলমল করছে। চারদিক নিঝঝুম, গাছ-পালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গর্জিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধান-পাতার জড়াজড়ি।

নীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অসুবিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,—'সাজুকে আমার কাছে দিন।'

ওরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম 'আপনি' বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে-ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়োছেলের মুখের দিকে চাইল. জোহরা, টানা ভুরুর নীচে ওর সুন্দর চোখ দু'টো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকার শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিগগেস করল,—'তোমার কষ্ট হবে না তো?'

খালেদ হাসলো। বলল,—'না এ আবার কষ্ট কি?'

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না পাওয়ায় ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অন্য কাঁধের ওপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে সম্মুখে হাঁটিতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রুপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডান হাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল,—'খালেদ!'

'কি!'—কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

'আমাকে ফেলেই যাচ্ছ!'—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—'আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ। পানিটা কি সুন্দর!'

খালেদ ফিরে এল। বলল,—'আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!' পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা। ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—'দেখছ, কি সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।'

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নীচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে ডেকে যাচ্ছে—'বৌ কথা কও।'

নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্ পানি থেকে পা দুটো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো-জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁৎকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল,—'একটু দাঁড়াও!'

'আবার কি হল আপনার!'

'কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন?' জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দু'টো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—'কি হল আপনার?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু বুঝ না!' কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,—'সাজুকে দাও আমার কাছে। চল শীগগীর। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।'

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক খণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়ম পায়ে উঠানে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লা, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তা'হলে তার আন্দাজই ঠিক?

'জৈগুন! ও জৈগুন!' তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—'দেখে যা, আমরা যা ভাবচি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।'

জৈগুন চৌকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—'তবু তো আপনি বলছেন, আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনে সুবা-সন্দে নাই। বাতাসী যা ছিনাল।'

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লা, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বার বার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পুব পাড়ার আম বাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নীচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্য লোক, সাত-জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপন আড় চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পব জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজেব সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়িব চেহারা বোধ হয় অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোন পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার গিন্নিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্ আলাপ যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওব মনে হয়, এঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতেব কাজ করল।

'কিন্তু আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন কাঁদিসনে দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।' জোহরা আপন মনে আওড়াল,—'ছাই সম্পত্তি।'

দগদগে ঘা'র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, তার বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে, এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বলজ্বল কবতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা।

মগজটা গিস্‌গিস্ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওব দৃষ্টি পড়ল কুয়ার ধারে মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটতে পারে নি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শির্ শির্ করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বটিটা এনে একেক কোপে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

'আহা হা, করেন কি গিন্নিমা' জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,—'গাছটা অনেক দিনের, মানুষের কত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

'তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন, না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা আমি কাটবোই।'

'আমি কাম করে খাই, আমার কি? আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'আশ্চর্য!' জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,—'আমার ভালো মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে? দুনিয়াতে আর লোক নেই?'

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখে ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের এর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করছে।'

'কেমন করে জানলেন?'—জোহরা শুধাল।

'এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত ঘা দিলাম আর তা' বেজে উঠল। ব্যস, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।' হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,—'আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।'

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত, তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চির দিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু কবলেন হাজি কলিমুল্লা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে কোমল হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছতলায় এল।

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?' খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—'না খেয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে, না?'

কথা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ থ' হয়ে রইল। হঠাৎ ডান হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে ক্ষিপ্তের মতো জোহরা বলল,—'আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!'

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এ'টে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে পানি পড়ছে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ভোড় বেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে মিছিমিছি সে হে'টে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই সেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে ব্যাপারটা সারাগ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মণ্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘে'টে একটা ফতোয়া তৈরি করেছিলেন হাজি কলিমুল্লা। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তিনি তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে গুনগুন করছিল, এবারে ডুকরে কে'দে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, 'ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!'

'এই বেটি, কান্না থামা! হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন,—'সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?'

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তিনি শান্ত গলায় জিগগেস করলেন,—'কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?'

'কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা

তো মানুষই নই, কুকুর বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কি! বাতাসী চোখ মুছে বলল,—'না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!'

'কিন্তু এসব কথা তো আর আসমান থেকে পড়ে না!' হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'অন্য কারো নামে তো ওঠেনি?'

'সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবার বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি—এসব জিনিস কারো চোখে পড়ল না!'

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলো-ছায়ার লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা-অরণ্যের ভিতর কোনো প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধ-নিশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায়, আর সে যেন শিউরে উঠে গভীর আতংকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে গর্জনে চারিদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায় তা' সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্ত পদে এসে উঠল বারান্দায়। এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে নীচে কেবল শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেবারে মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শরীরে রোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিন্‌চিন্‌ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ দু'টো ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে। একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব

হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত সংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি, একটি গভীর শান্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খসখস। ঘ্রাণ আসছে একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না এখানে নয়। এতো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল, একটা সুপুষ্ট নগ্ন হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্রগর্জনে একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙখল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্চকিত শব্দের ভয়ংকর-সুন্দর রাগিনী।

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, কখন অযুৎ মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘর-বাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর ঝর ঝাপটা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এর পর শুধু ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পরে উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্য দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাঁটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নীচু করে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়িতে ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লা। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—'অত দেরি যে! আর এদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।'

'কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম!' ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,—'সে একটা পাঁড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? দুটোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল!'

'হ্যাঁ তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!' কথাটা শেষ করে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—'আরে আরে, করছি কি? তুমি পাগল হলে না-কি? এত রাত্রে ভিজছ, সর্দি করবে যে।'

'না' সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।' জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো-ঠোঁটে বললো,—'আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বৃষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল হবে।'

# পুঁইশাক

## আতোয়ার রহমান

ইস্কুল নিয়ে এতো কাণ্ড। অথচ সবাই নির্বিকার।

বাঘবন্দী খেলাটা জমে উঠেছে টুনু আর সানির মধ্যে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে আর আর ছেলেমেয়েরা। সানি হারছিলো বাঘ নিয়ে। দুখো খাচ্ছে এখন, ছোঃ, ও আবার একটা বাঘ নাকি? মরা কেঁদো। ছাগলের গুঁতোতেই ত্রিভুবন পার।

এরই মধ্যে একবার পেছনের দিকে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ রাণু বলে উঠলো, ত্রিভুবন পার করাচ্ছে, দাঁড়াও! ছাগল-খোকো শাক আসছে!

চক্ষের নিমেষে ভেল্‌কি খেলে গেল। বাঘ-ছাগল এক সাথে ছিট্‌কে দলের সবচেয়ে হ্যাংলা ছেলে রাশু ছেঁড়া 'বর্ণ পরিচয়', প্রথম ভাগ খুলে সুর ধরে দিলো, হ্রস্ব-ই ট ই-ট, হ্রস্ব-উ ট উ-ট।

ফ্রকের কোণটা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিটমিটিয়ে রাণু বললো, দিই বলে? পুঁইশাক আজ চিবিয়ে খাক তোদেরই।

সবকটি চোখ একবার ওঠা-নামা করলো। না, পুঁচকে ছুঁড়িটাকে আর জব্দ করবার সময় নেই। পুঁইশাক এখন আঙিনার মধ্যে।

পুঁইশাক অর্থাৎ জমীর পণ্ডিত এসে পড়লেন। মাঝারি গোছের আধ-মোটা, গৌরবর্ণ মানুষটি। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুকতারার মতো দপ্‌দপ করে। সাধারণত সবাই তাকে পণ্ডিত সাহেব বলে। চাষী ঘরের ছেলেমেয়েরা সংক্ষেপে বলে, 'পন সাব'। এর থেকে কবে যেন ঠিক মনে পড়ে না এখন আর, কোন্ দুষ্টু ছেলে শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপনামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো, পন সাব না, পুঁইশাক।

জমীর পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো সবাই। চোখ তুলে চাইলো একবার। ভাঁজ ভাঙা পুরনো কোট, ক্ষারে-কাচা সাদা লুঙ্গি। কাঁচা চামড়ার পানাইয়ের বদলে পায়ে আজ মোটর-টায়ারের স্যাণ্ডাল। চোখ আর নামতে চায় না কারো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিটপিট করে দেখছিস কি, উদ্‌বেড়ালের দল? দরজা খোল্। সেকেণ্ড পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাশু সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি নিতে গিয়ে একেবারে আঁতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, এ্যাঁ, করেছিস কি, গাধার দল? সাকুল্যে মোটে তেরোজন? বলি, আমি কি শেয়ালপণ্ডিত যে, ইন্‌স্‌পেক্টর-কুমীরকে তিরাশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখান থেকে।

বেরুলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্পের প্রসঙ্গে হাসি আসছিল ওদের। ধমক শুনে সেটাও চেপে যেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও ম'লো, আমাকেও মারলো। ঘৃণ লাগুক এমন ইস্কুলে।

রাশুই উঠে দাঁড়ালো সাহস করে, প'ন সা'ব, যাই না বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে আনিগে। টুনুও যাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাশুকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন মাথাটা, আহা-হা বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার চুল-দাড়ির মতো পরমায়ু দিক তোকে আল্লা। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শীগগীর যা। আঁটকুড়ের বেটা খাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেণ্ড পণ্ডিতের কি হল?

রাশু-টুনু বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, রাণু শীগগীর বাক্‌স খোল্‌। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাণুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর তর সইছে না। না সইবারই কথা। চল্লিশ বছরের ইস্কুল। এর প্রতিটি দিনের স্মৃতিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। মা যেমন শিশুকে মানুষ করে তোলে, তিনিও তেমনি তৈরি করে তুলেছেন এই ইস্কুলকে। একে কি ছাড়া যায়, না, ভোলা যায়? অথচ ষড়যন্ত্র চলেছে তারই।

আইন হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত শুনতে পান,—সক্রোধে বিদ্রূপ করে বলেন, আইন নয়, পাগলা বাইন মাছ ছাড়া পেয়েছে, আঁচড়ে বেড়াচ্ছে,—ঘন ঘন পাঠশালা রাখা চলবে না, কোনো এলাকায়, যদি না ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা দুঃসাধ্য, ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রণীয়। সুতরাং দু'টো চারটে এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার ছোঁড়াগুলো, যারা হুজুগ করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যতো রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পয়সার মাস্টার বানিয়েছে,—হ্যাঁ, বাজারে গুজব, জমীর পণ্ডিতের ইস্কুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পণ্ডিতের মতো ইস্কুলও এখন

জীর্ণ। চৈত্রের পদ্মায় পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ে, গাঙশালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্ত ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপমাটাই লোকে ইস্কুলের উপর প্রয়োগ করে। দেয়ালের বালি ঝরছে তো ঝরছেই হাওয়ায়, হয়তো বা পণ্ডিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়ছে একে একে। পণ্ডিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ প'ন সা'ব,—এবার আপনিও সরে পড়ুন, আড়াল-আবডাল থেকে দুষ্টুলোকের কথা শোনা যায়, বাতের ব্যথাটা আর বাড়াবেন না এই বয়সে ইস্কুলে বসে থেকে। এদের নাকি ষড়যন্ত্র,—ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে-মাছ-ঢাকা কাণ্ড করা। কিন্তু দেখে নেবেন জমীর পণ্ডিতও, কার পেটে কটা 'ক'। অমন অনেক ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘুঘু দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি?

চিন্তায় থমথম করে পণ্ডিতের মুখখানা। রাশু-টুনুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু জমীর পণ্ডিত সামান্য ধমকটিও দেন না।

ইস্কুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চষা-মাটির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো মাঝারি ঢেলা। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বেলে পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে বুঝিবা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ। দূরে, বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধু-ধু চর। আশে-পাশের গাঁয়ের মানুষের আশাপীঠ ওই মাঠ আর চর। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে, কে জানে।

ইস্কুল ঘরের দিকে তাকিয়ে জমীর পণ্ডিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাষ করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন মানুষের 'ফলন' আনবেন। মাঠ একদিন ফসল দিয়েছে, ইস্কুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইস্কুল সম্বন্ধে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছে বিশেষ করে ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে।

ঃ পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

চিন্তায় বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছনে ফিরে দেখলেন, জানলার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নম্বর পাণ্ডা। প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গরু চরাচ্ছি। ইস্কুলে আর কি করে লোকে?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল; কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তেই, তওবা,

তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছিনে কিনা। তাই, ভাবছিলাম,—

একটু থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বুঝি কেউ আসে না? সেকেন্ড পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছিনে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা নেই, বেশি করে খেটে ইস্কুলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেন্ড পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরি করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সেরে তবে আসে। ধমক দিয়ে লাভ হয় না, দেওয়া উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অনটন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্কুলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্কুল চালাচ্ছো হৈ রৈ করে, আর এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মুখ-চোখ করুণ করে বললে সহানুভূতিতে, পণ্ডিত সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায়? আপনার চেয়ে বেশি বুঝি, এমন কথা বলে বেয়াদবি করতে চাইনে। এই ইস্কুলটা উঠে যাক, আমরা কামনা করতে পারি? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্কুল তো! ইস্কুল যতো বেশি হবে, লেখাপড়াও ততো বেশি শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করলেন, ইন্‌স্‌পেক্টর তোমাদের ওখানে গিয়েছিলো, না?

ঃ হ্যাঁ, আপনার এখানে কি বলে গেলো?

ঃ বলবে আর কি? একি আর কানে কানে বলবার কথা? যা বলবে, সবাই জানতে পারবে।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মন্দ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এড়িয়ে যাওয়াও হল। ইন্‌স্‌পেক্টর যে কি বলবে, তা এখনো জানা যায়নি। ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন। তার কারণ, ইন্‌স্‌পেক্টরটিকে অত্যন্ত ভদ্র বলে মনে হয়েছে তার। কাজও জানে। যতোক্ষণ ইস্কুলে ছিলো, রীতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। পাকিস্তানী আমলের হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া ইন্‌স্‌পেক্টরদের মধ্যে এতোগুণ তিনি এর আগে আর দেখেন নি।

অবিশ্যি, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে। ইন্‌স্‌পেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে এখন। সে জন্যে এবার আগে থাকতেই চা আনিয়ে

রেখেছিলেন রাণুদের বাড়ি থেকে। ইন্‌স্‌পেক্টর খাতাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইঙ্গিত মতো রাণু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফলমূল আর ফ্লাস্কের চা। কাপে মুখ লাগিয়ে অন্যমনস্কভাবে ইন্‌স্‌পেক্টর বলেছিলো, বেলের সরবৎ গরম কেন?

রাণু মেয়েটি মুখরা। স্মিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না সার, একো গুড়ে পানা।

এক মুহূর্ত রাণুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বলেছিলো, তা'হলে তো ছোবড়া বেছে খেতে হবে। আখ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না। তুমি দেখোতো এবার, একটা ছাঁকনি পাও কিনা।

বলেই সে কাজে মন দিয়েছিলো।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো। রাণু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাবধানে, সন্তর্পণে।

শুধু এই ঘটনাটির জন্যেই ইন্‌স্‌পেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিন্ত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত।

হাশিম আবার সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙিতে বললো, ওপরে একটু খোঁজ-খবর নিলে হত না?

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। রাশু এবং আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে। এই ওদের স্বভাব,—নানান দলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ডাকাডাকি করে দল বানিয়ে তবে আসে।

দেরি করে আসায় লজ্জিত বা অপ্রতিভ হল না। ছেলেমেয়েরা চুপচাপ বসে গেল নিজের জায়গায়। শ্লেট বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এখন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

জওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, ঘুরে দেখলেন যদিও। অপসৃয়মাণ মানুষটির পিঠ থেকে তুলে নিঃসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেলা-ভরা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ওপর।

ভেতরে বাইরে মাঠ। এবার কি ফসল ফলবে, কে জানে।

গুজব রটেছে গাঁয়ে, পুরনো ইস্কুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমীর পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে, এর একটা বিহিত করতে হবে। এতোদিনের পুরনো ইস্কুল। গাঁয়ের যতো শিক্ষিত ছেলে সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়াদের জ্বালায় এখন উঠে যাবে নাকি আপনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে। গাঁয়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইস্কুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইস্কুলের পাল্লায় পড়ে এখন তাঁর ইস্কুলে ভাঙন ধরেছে। তারই সুযোগ নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মানুষ। চাপা রাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাঁচড়াদের ধরে 'চৌদ্দো-পো' করে দাঁড় করিয়ে রাখুন সত্তর দিন, ইস্কুল বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না ওখানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট—

ঃ রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো, কবে বেরুবে খোদাই জানে। আপনি টাউনে খোঁজ নিন। দরকার হ'লে আমি গাঁয়ের লোককে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গাঁয়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইস্কুল দু'টিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো দুটি দল গড়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে তাদের ঝগড়া শুনতে পান তিনি অহরহ। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পবিত্র কাজ। তার জন্যে ঝগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আর ঝগড়া করবার আছেই বা কি? তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্কুল উঠে যাক। ইস্কুল যত বাড়ে, ততোই ভালো। নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোঝে না? বোঝে, তবু আলগা ফুটোনি করে তাঁকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে না? সাহায্য দিতে পারবে না অতো? বয়ে গেছে তাতে। এতো দিনই বা সরকার কি করেছিলো, সাতটাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া? ছয় মাস, এক বছর পর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্কুল চলতে পারে, তাহলে এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি ওপরওয়ালারা দিতে পারে ভালোই। তিনি সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্কুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে যাবেন ইস্কুল, যতদিন বাঁচেন। আল্লার ইচ্ছে থাকলে খরচের জন্যে কাজ আটকে থাকবে না। ইস্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এসব কি বোঝে না হাশিম? বোঝে, গাঁয়ের লোকেও বোঝে। তবু ঝগড়া করে।

এসব ঝগড়া খারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামত স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই ঝগড়া। জানিয়ে দিচ্ছে, তাঁর মতামতটা একেবারে খেলো নয়। ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই তাঁর এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে রাতারাতি কুঁচিয়ে

ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়ে বেশি আসতে পারে না, সেও তাঁর দোষ নয়। ওটা একেবারে আলাদা জিনিস। ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জনের বাকি রয়েছে? ছাত্রের অভাব ঘটেছে বলে যারা ইস্কুল তুলে দিতে চায়, তারাই-বা কয়জন খোঁজ রাখে এসবের? আশ্চর্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশ্চর্য এই মানুষগুলো!

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাধ্যে যতদূর কুলোয়, তার ত্রুটি হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত সাহেব। চা খাবেন একটু? দাঁড়ান। রাণু, চা নিয়ে আয়তো মা, কাপ দুয়েক।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বাড়ির পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চেঁচামেচি করছে। কান পেতে শুনতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছড়া,—

পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—
পুঁই-মাচানে আটচালা!
বেঞ্চিগুলো সরু সরু,
ছাত্রগুলো আদত গরু!

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারীসহ আরেক দলের উত্তর এল,—

নতুন পাড়ার পাঠশালা,—
চালে খালি বারজালা,
মাস্টারগুলো বকের ঠ্যাং
ছাত্র ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং!

খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি! এতো দূর আস্পর্ধা! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব! এক্ষুনি দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে।

চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন হরেশ চৌধুরীও। তাঁর মোটা কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শীগগীর ছেড়ে দিন। এ নোংরামির শাস্তি দিতেই হবে।

বুড়ো মানুষের গায়ে অসীম শক্তি। দোর্দণ্ড প্রতাপ চেহারা—দেখেই বাড়ির লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে, যা ফেটে আবার আকস্মিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে স্নেহের ধারা,—অতএব যে চেহারা ভয়ংকর ভাবে রহস্যময় সেই চেহারা থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ যেন সেই আগুনের শিখা। ভয় পেয়ে গেলেন হারেশ চৌধুরী নিজেও। এ-মানুষকে ছেড়ে দেওয়া চলে না কক্ষনো। প্রাণপণে কোমর টেনে ধরে বললেন, জোড় হাত করছি, পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

রাণু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। বাপের দেখাদেখি শুধু চেঁচাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব। নতুন পাড়ার ওদের ছড়া শুনেই তো এরা ছড়া বেঁধেছে। যাবেন না আপনি—

দোহাই শুনে থেমে গেলেন জমীর পণ্ডিত। বেগতিক বুঝে পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত ছেলেও ততক্ষণে সরে পড়েছে। চৌধুরীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি জঘন্য বেয়াদব! আমি ওদের মুরুব্বী নই? ওদের বাপ চাচাকে পড়াইনি?

ঃ কাজটা ওদের নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সব। অতো জ্ঞানই যদি থাকবে, তা'হলে আর লেখাপড়ার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন। কিংবা বাপ-মাকে—

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করবো। বাপ-মাকে শুদ্ধ আমি আবার টেনে আনব ইস্কুলে। দেখে নেবেন আপনি।

পেছন ফিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাণু। তখনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী মেয়ে? যা পড়গে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলেন বাড়িতে। পুত্রবধূ উঠোনে ধানে পা দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। নেহাৎই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে শ্বশুরবাড়ি। তাকেও ধমকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিল অসংযত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন, জমীর পণ্ডিত। সেকেণ্ড পণ্ডিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এসে বসেছে। শুনছিল উৎসাহ ভরে। কিন্তু গল্প শেষ করবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাণু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—তখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম অভ্যেস হয় পড়াশোনার শেষে গল্প বলা, সহজ কথার ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তার স্বপ্নে বিভোর, আদর্শের উন্মাদনায় মাতাল। কান পেতে শুনতো সবাই, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। ইস্কুলের প্রতি, পণ্ডিতের প্রতি তাতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশিদিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর সুনাম। তাঁরই মেহনতের গুণে। সুতরাং কারো কিছুই হল না, হল গল্প বন্ধ।

আজ আর এক কারণে ধমক দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না জমীর পণ্ডিতের। সবাই শত্রুতা করেছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে অধৈর্য হলে তো চলবে না। রাণুকে ইঙ্গিত করলেন শুধু।

রাণু চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাংগুলি খেলার জন্য।

সত্যিই নিরেট মাথা রাণুর। বিদ্রূপটা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন জমীর পণ্ডিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারাদিনের জমানো নালিশ শুনতে চাইলেন এবার, থাক ও সব, কার কি নালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এল রাশুই প্রথম, প'ন সা'ব, কাল হাটে ফরিদ আমার আধসের সিম ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিলো।

নৈতিক দায়িত্বে ঘরে বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর পণ্ডিত। কিন্তু নালিশের ধারা দেখে শিউরে উঠলেন। ইস্কুল উঠে গেলে এদের কি হবে? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন, কার সিম রে ফরিদ?

উত্তর দিল রাশুই; আমার সিম, প'ন সা'ব। বেচতে গিয়েছিলাম।

বাজার-দর যাচাই করে পণ্ডিত জরিমানা করলেন ফরিদকে, দুটো পয়সা এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার ওপাশে। মিটিমিটি হাসছেও বুঝিবা। গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো প'ন সা'ব। ফরিদের—

ঃ কি হয়েছে ফরিদের?

ঃ জী, গেরস্থ ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে এখন—

একমুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের কাছে। তিক্তকণ্ঠে বললেন, এ-গাঁয়ের আর কোনো গেরস্থর ছেলে লেখাপড়া শেখেনি?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পণ্ডিত পাল্টা আক্রমণ চালালেন। হারেশ চৌধুরী তদবির করছে শহরে। গ্রাম থেকে একলাখ দরখাস্তও লেখা হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই দেওয়া হয়েছিলো সই নেবার জন্যে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সই নেওয়া শেষ হয়েছে?

ফরিদের বাপ ভয়ে ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

ঃ দিতে চায় না! কি বলে?

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জমীর পণ্ডিত। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ফরিদের বাপ, ইতস্তত করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগলো, বলে যে, উনি আর পড়াবেন কি করে? বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক নেই। তার উপর বাতের রোগী। নামাজ পড়ার সময় সেজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সারাজীবন ছাত্রদের 'নিল ডাউন' করিয়ে এসে এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন—

ঃ কি—কি বললে?

ধমক দিলেন বটে জমীর পণ্ডিত। কিন্তু পরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

ফরিদের বাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, থাক, থাক, আর বলতে হবে না। ভুল আমারই হয়েছে। হবে না? খন্তার কাজ নরুন দিয়ে হয় কখনো? কোথায় সে দরখাস্ত? বার করো, বার করো শীগগীর।

ফরিদের বাপ হাতের মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বার করে দিলো। হঠাৎ ইস্কুলের ছুটি দিয়ে জমীর পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন।

ইস্কুলের সিমেণ্ট ওঠা বারান্দায় পায়চারি করছেন জমীর পণ্ডিত। পায়চারি করছেন বেলা নয়টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল, তবু ছেলেমেয়েরা আসছে না কেন? সময়-জ্ঞান আর এদের কোনো-দিন হবে না দেখছি। না কি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে আনতে হবে সকলকে?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গাঁয়ে খবর রটে গেছে, এ ইস্কুল সত্যি সত্যিই উঠে যাবে। ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস থেকে খোলাখুলি কোন চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হারেশ চৌধুরী চিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। তিনিও পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাও ভরসাজনক নয়। এদিকে নতুন পাড়ার ইস্কুলে নাকি খবর এসে গেছে, তাদের ইস্কুল থাকবে। তার মানেই হল—

গাঁয়ের পথে বেরুনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। নতুন পাড়ার দল তো আছেই। তারপর, যারা এতোদিন ছিলো তাঁর পক্ষে, বোধ হয় বিফল হওয়ায় তারাও সরে পড়েছে। চক্ষুলজ্জায় সই দিয়েছিলো বোধ হয় তখন। কেউ কেউ আবার নানান ছলে নতুন পাড়ার ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুরু করেছে। যেমন ফরিদের বাপ। কেউ কেউ বা মুখের উপরই পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে, তখনই তো বলেছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দরখাস্ত করে।

কিন্তু লাভ যে হবে না তাই বা কে জানে! সত্যি খবর তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট দশদিন ধরে কেন কতকগুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিচ্ছে তাঁর ইস্কুলে? ইচ্ছে করে তো কেউ নিজের ছেলেমেয়ের মাথা খেতে চায় না।

তাহলে? তাহলে খবরটা সত্যি নয়। সিদ্ধান্তটায় পৌঁছতেই নতুন শক্তি পেলেন জমীর পন্ডিত। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মনটা। ঠিক হয়েছে, ইস্কুল তাকে চালাতেই হবে। যারা তুলে দিতে চায় ইস্কুল তাদের দেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলেই এ ইস্কুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমুর্খ সব! স্বাধীন হলে কি হবে? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রসুলুল্লাহকে একবার কে যেন জিজ্ঞেস করছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর বয়স থেকে? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পঁচিশ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমুর্খরা কি আর কখনো এ হাদীসের মর্ম বুঝছে? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জাগলো পন্ডিতের মনে। আনন্দে বুকখানা ভরে উঠলো। ভাবলেন. না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে? এমন দেরি তো ওরা বরাবরই করে। এই তো বছর খানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমানুষ সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পারে ওরা। আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আসুক না আজ। আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর, মৃদু হাসি ফুটে ওঠে পন্ডিতের মুখে,—গোটা কতো ইটের কুচিও কুড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাঘবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্রয়ের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্নেহভাজন শিশুর দুষ্টুমি দেখছেন যেন, এমনি ভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি কুড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি কুড়ানো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, প'ন সা'ব।

পেছন ফিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন জমীর পন্ডিত, রাশু? এসেছিস? এতো দেরি কেন রে?

রাশু বিষণ্ন মুখে জওয়াব দিলো, আমার আসাতো নয় প'ন সা'ব। তাই, সময় করতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমার লেখাপড়া। খোদা মাথায় কিছু দেয়নি। নিজের পড়াশোনা বন্ধ হলে দুঃখ নেই। কিন্তু বাপজান বলছিলো—

মড়ার মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের মুখ। ধরা গলায় বললেন, কি বলছিল রে?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলো রাশু, ওদের ইস্কুলে খবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ দলের কয়েক জনও গিয়ে জুটেছে দেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পণ্ডিত শুধু বললেন, এ্যাঁ! কিন্তু রাণু, বিশু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পণ্ডিত। রাশুও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রাণু, বিশুরা কি আর পড়বে না।

ঃ রাণু নাকি টাউনের ইস্কুলে পড়তে যাবে।

ঃ কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্কুলটা—

রাশু একবার ইতস্তত করে বললো, রাণুকে ডেকে নিয়ে আসবো, প'ন সা'ব?

জমীর পণ্ডিত নীরবে ঘাড় নামিয়ে সম্মতি জানালেন।

বাড়ি কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে রাণু এসে পড়লো। মুখখানা করুণ। বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পণ্ডিত সাহেব। আম্মা বলেছে, খালামাদের বাড়িতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পণ্ডিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এক দুনিয়ায়। ইস্কুলটা একবারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেন। তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাষীঘরের তাজা তাজা, ধুলোবালি মাখা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরা যেন—এদের যেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে, আর,—আর, ইস্কুলের আঙিনাও যেন একটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশি? হয়তো। উহুঁ, ঠিকই। সারা গাঁয়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা, পণ্ডিত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় মিলিয়ে গেল। জমীর পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ভাঁজ-পড়া মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো দুই একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্কুল ঘরটার দিকে তাকালেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছবিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো তারপর। আর ফিরে এলো—স্পষ্ট হয়ে আর একটি জিনিস, যেটা এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। নিজেকে সংযত করে এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা কাল কখন যাবি, মা?

বলতে বলতেই রাণুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

ঃ নটার গাড়িতে।

ঃ চ, আমিও যাবো তোদের সাথে।

রাশু, রাণু দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

জমীর পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, বেটারা ভেবেছে কি? পুঁইশাকের কতো ডগা কেটে খায় লোকে, তাই বলে কি গাছ মরে? এক খোঁচা খেয়েই আমি ইস্কুল তুলে দেব? দেখে আসি, দাঁড়া, একবার ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিসটা। আর, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাস্টার ধরে আনি কোথাও থেকে।

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জমীর পণ্ডিত। তারপর আদেশের সুরে রাশুকে বললেন, শোন, তোর বাপের ওসব বাহানা। তুই পড়াশোনা নষ্ট করিসনে। নতুন ইস্কুলেই ভর্তি হয়ে যা। আর, রাণু, তুই টাউনে যা, হ্যাঁ টাউনেই—এখন বাড়ি যা—তোরা—

কিন্তু আদেশের সুর ক্রমে ভেঙে এলো, গলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটছে। রাণুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জমীর পণ্ডিত আবার বলতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ, মা,—যা,—তোরা—

হাতখানা এবার রাণুর মাথা থেকে কাঁধের পাশে ফ্রকটা চেপে ধরলো। পণ্ডিতের মনে হল, এদের যদি একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যেতো। নইলে যে সাদা গোঁফের তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পর আর বাগ মানানো যায় না!

# একটি তুলসী গাছের কাহিনী

**সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্**

ধনুকের মত বাঁকা ইট-সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতলা, মস্ত; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাথ নেই, তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকঘর পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভাপসা গন্ধ, আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্য। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্তে চাঁদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা আরো বার-বার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আশা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মস্ত বড় বাড়ি জনমানবহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত

হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাববার প্রয়াস পেতো সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠান্ডা রেখে বললে, জায়গা কোথায়, সব ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কি এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউণ্টস অফিসের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসেনি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিস এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন তা' নয়। দখলের কথা জানলে দিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিসে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌছুতে পারেনি। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালেও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠালাঠি না করলেও তার জন্য তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিসকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর দ্বিরুক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরতলার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের

প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথা ব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানালা দরজা ভেঙে ফেলছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা' নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়িটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন, খালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দপ্তরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠী দালানের ফ্যাশানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম জাম কাঁঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু'হাজারওয়ালাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কচ্ছ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত; ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউনুস ভাবতো মন্দ কী। অন্ততপক্ষে যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতলার দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটার জানালার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ঝলকানি ম্যাকলিওড স্ট্রীটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোনে আধ হাত উঁচু ইটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসী গাছ। একদিন সকালবেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারি করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসী গাছটি। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ শীতল

করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসী গাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়িতে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরি রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বেওয়ারিস ঠেকেছে যে, বাড়ির চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবু কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ-তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সেই সময় ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলেছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? কেন চলে গেছে? মতিন এক সময় রেলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈদ্যবাটি, হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি কালো চওড়া লাল পাড়ের শাড়িটা ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছলছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজো করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভলোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে

এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কী ওর মনে হলো? অক্ষত দেহে তুলসীগাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় ঝিমিয়ে আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদাব্বের বলে।

বলে হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কী। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলফ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলফ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন? আমরা কি জানি না আমাদের।

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রং ধরেছিল, আবার যেন গাঢ় রঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলিভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাক্লিয়ড স্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে অলোবাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। শুধু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিল এ-মন্দার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়িতে প্রয়োজন মত জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং সেই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচন্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিস এসেছে। কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া চোর বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোশ ভাবে, কই, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিসের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটোকে মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধ ভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুলঘুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা আরেকটা ধুসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললো,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনীভাবে এ বাড়ি কবজা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ি খালি করে দিতে হবে— ব'লে অর্ডার দেখালো।

বাড়ির কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্য আফজল একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফওয়ালা বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটো।

—কেন? বাড়িওয়ালা কী নালিশ করেছে?

—গভর্নমেণ্ট বাড়ি রিকুইজিসন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভর্মেণ্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনেস্টবল দু'টো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়িতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে ওঠায়। কেউ যদি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ি দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে

সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্যন্ত নাকি নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়)। অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে কখ্‌খনো ছাড়বো না। যে আসে আসুক, কিন্তু সে যেন একথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক'দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠান্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী, সে-কথা দর্প ক'রে সেদিন পুলিসকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ি রিকুইজিসন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিল, কেন, আমরা তো গভর্ণমেণ্টেরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত চলে গেলো, ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালীটা। নীলকুঠী-বাড়ির ফ্যাসানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যে দিন পুলিস এসে বাড়ি ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। তুলসী গাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কী এদের আর মনে পড়েনি?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার-শক্তির উপর নির্ভর করে না।

# জিবরাইলের ডানা

**শাহেদ আলী**

আজিমপুর হয়ে যে-রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে-দেয়ালগুলোর উপরিভাগ চ'লে গেছে অনেক দিন, রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আস্‌মানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্‌তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে তার জন্যে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ি ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যেবেলা গিয়ে ব'সে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত আর দেখা-ই মিলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোন ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, এমন মগড়া যে, এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্য ভিক্ষে করতে বাঁদীগিরি করতে! সন্ধ্যায় নবী বাড়ি ফেরবার সঙ্গে

সঙ্গে হালিমা ধুম্-ধুম্ করে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী?—জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু'এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গল্‌লো না অভিমানী শিশুর। শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আস্‌মানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা, নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে, তার মনটা হু হু ক'রে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে কী-ই বা বুঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়। কিন্তু আজ যদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কী করে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজের গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসুতে ভ'রে আসে, আসমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে।

নবী আস্তে আস্তে চোখ মে'লে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা, এইডা কে?

—কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উই যে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও? —নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব সুন্দর একটা মানুষ গেছে না? রাঙা ধবধবা আর পিন্দনে ছুন্দর কাপড়?

—ছুন্দর মানুষ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

—হ, চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে নবী—মিঠাই নিয়া আইছিল,—তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা?

—হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই ঘুমা,—বিহানবেলা খাবিনে মিঠাই।

—লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল, মা? নবী আবার প্রশ্ন করে—দুইটা পাখ্‌না দেখছো পিঠে?

—পাখ্‌না?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে—হ, পাখ্‌না।—মউরের পেঁখমের মতো ছুন্দর!

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ্‌তা আইছিল্‌ রে—ফিরিছ্‌তা। আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মান্‌ছের। ফিরিছ্‌তার তো আজ ছুটি।

ফেরেশ্‌তা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। সুন্দর আজকের রাতটা—রূপা-গলা জোছনায় ধুয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরবার সময় আজ সে দেখেছে মস্‌জিদে মস্‌জিদে কোরআন-তেলাওৎ-রত ছেলেমেয়েদের। রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ-বাড়ির মস্‌জিদ থেকে কোরআন তেলাওতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মানুষে। আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশ্‌তার সঙ্গে, মৃতদের রুহের সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই; নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মারফত জানাবে আল্লাহ্‌র কাছে। শুধু নবী আর হালিমা-ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সম্মুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা, তাদের চাওয়ার কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি—কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে—কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব? ভাত খাবি এখন? নবী কোনো জবাব দেয় না তার, খিদের কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশ্‌তারা খবর নিয়ে যায় আল্লাহ্‌র কাছে। তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশতা? সে কি গিয়ে বলবে না, বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে—ফিরিছ্‌তারে কিছু কইয়া দিছো মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইয়া দিলা না? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাকলা ক্যান তুমি?

—আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিছ্‌তা আমাগো কথা ছুনব ক্যান? বড় লোকগো খোঁজখবর করবার লাই না আসছে? আমাগো দুয়ারের কাছ দে' তাগো বাড়িই হে গেছে।

নবী চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান্ মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

—কী হইবো নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি? এতোটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়িতেই না ফিরিস্তারা আছে; আল্লা তো তাগো কতাই হোনে।

—না-রে না, হালিমা একরকম চিৎকার ক'রে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রুপা দিয়া ছেজ্দা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লাহ্র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তা'হলে। এতো সোনারুপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পেঁছবে না খোদার কাছে। আর তাই তো গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই? সোনা-রুপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেই জন্যেই বুঝি মালদার আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ।

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাইকেই। তিনি কেন তাঁর রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনো দিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তাঁর?

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে গেছে ফেরেশ্তা, দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের ডানা তার পিঠে, তার সারা গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশ্তাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরেশ্তার পথে, আর মিনতি ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের ঢেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুঁকে পড়তো ডানা ধ'রে—ফেরেশ্তার সাথে সাথে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লাহ্র কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চিৎকার করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে ঘুম ভাঙাত আল্লাহ্র।

কিন্তু তা-তো আর হলো না। অথচ সব কিছুরই চাবি রয়েছে খোদার হাতে। তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেইবা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে।

ছেলে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি! একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আস্‌মানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ ক'রে, আর একটা পথের খোঁজের কল্পনা তার হয়রান হ'য়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবীতে এতো জ্যোৎস্না—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেন নারিকেল কুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ার রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকার পানি-ভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমা-ই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোক-চক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো বাড়িয়ে দিয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দূরই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে সে তার বাণীকে এতোদিন অজান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে!

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির থাকতে পারছে না। আজ অতি সন্তর্পণে বাড়ি পেঁৗছে নবী। মা বাড়ি নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর। তিনটা পাতিল তছনছ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনা পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বার করে আনে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আস্‌মানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসার ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরোনো সুতোটার সঙ্গে নতুন সুতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আস্‌মানে। ঘুড়ি যতোই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতো শেষ হয়ে গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এতো কাছে তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাহ্‌কে। সুতো চাই তার, আরো অনেক সুতো,—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে! কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না! নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা শখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনায় সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে!

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই সুতোয় হবে না. আরো অনেক সুতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায় ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজকালের লিখা পাল্‌টাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মার অবর্তমানে নবী উল্টে পাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের খাঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়িতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা।

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায়ঃ ইস্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট ক্ষিধে নিয়েই সে ছুটে যায় ইস্টিশনের দিকে। অনেক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে। তারপর গাড়ি যখন এলো, তাজ্জব বনে

যায় নবী, কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোশাক! বাকস্ বিছানা, পেটরা, প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চিৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ, 'মুটে চাই' বলে চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়—হাত দুটো চাওয়ার ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঁচিয়ে যেন ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে। চোখ তার করুণ, আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্ নসীবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে ছেঁড়া, শততালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেগুলো আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভেসে যায়। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পেঁছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখরাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরতরী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি কখনো। আল্লাহ্ কেনই বা শুনবেন তাদের কথা।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' বলে সে চিৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পড়া বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিয়ে যেতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা। আমার বহুত পইছার দরকার—চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আমনে কতো দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান; অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন—অতো পয়সা দিয়ে কি করবি?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রাঁছ কিনুম যে—অনেক রাঁছ।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅল্‌টা নবীর মাথায়

দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কি করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড়ি আছমান ছুইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু। এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুঝি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন থম্‌থমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা অইবো, আমাগো বাড়ি তখন আইয়েন—আপনের জেব ভইরা দিয়া দিমু হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবাণীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে। অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মস্‌জিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-করে আনা চালগুলো জ্বাল দিচ্ছে। গাছতলা থেকে ভিজে বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, কিরে,—অতোক্ষণ কোন্‌থে আইলি?

মার দরদভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশি হয় নবী; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাহ্‌কে সে শুক্‌রিয়া জানায়।—দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে।

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে—দোকান তে পালাস নে যেন! কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘরে। কাজ

না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে? আমাগো মা-পুতের কি এ ছাড়া আর উপায় আছে?—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হারে নবী, তোর খিদা লাগছে, না?

মায়ের আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদের কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মার স্নেহ—দুটোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে—না মা, আমার খিদে লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

—তাই ভালো—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দুজনেই কিন্তু ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূল—এবং নবীর হাতে অনেক সুতো। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি আস্‌মানে,—হাওয়ার ভরে নেচে নেচে। দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে! সুতো আজকে ফুরোতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে—অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে অসীম শূন্যতায়। আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে ওর বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময় টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুরছে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণিমনসার ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টিসীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো বেশি রশি চাই তার, অনেক রশি। খোদা তাঁর আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে নবী। কিন্তু আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে, তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পাখায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মস্‌জিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে আজ সে

চলে যায় ইস্টিশনে। পয়সা চাই, তার, রশি কেনার পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ার বেঁধে খোদাকে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশি আর জুটে না। কতোটুকু সুতোই বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরোনো সুতোটার সাথে জুড়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে।

পিলখানার ওপাশের ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি তখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই। নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাঁকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইস্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি ক'রে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায়। দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়ি ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মতো হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ডোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী। আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর থর ক'রে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিস্ময়ে-আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং ভারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে! শুধু একটা রশি-টন্‌টন্ করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়াল থেকে কে টানছে রশিকে ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর হাতের শিরা উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছায়—আপন ধর্মে। এক সময় হয়তো আট্‌কে যাবে আরশের পায়ায় —আর শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে, অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে, শুধু একটা সুতো—সে-রাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটি সিঁড়ি বেহেশত্ আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে সাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে, আর আঁৎকা টান পড়ে পড়ে ঝনঝন

করে উঠছে সুতোটুকু—মেঘ দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভ'রে আসে। আল্লাহ্‌র আরশ ঠিক কোন্‌খানটিতে তা' সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো—সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যেন দূর নয় বেশি!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময়ে সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছোঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে, ঘাড় নীচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির, কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে, আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা ভেজা। আহ্‌—নবীর বুকে খুশি আর থামাই পায় না যেন। বহুদিন পর খোদা তাঁর গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন, আর তাঁরই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হল না আর; এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তার বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে আর কোন দুঃখ থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে, হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জোহরের সময়েই চলে এসেছিল ঘরে—আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর—খোদা যদি তার বান্দার দুঃখে কাঁদবেন তো তার মার জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তা'হলে আল্লার আঁসু নয়—শয়তানের পেশাব! শয়তান চায়না যে মানুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে, আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার। সাত তবক আসমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লহ্‌র আরশ! সকালবেলা জ্বর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা খাবার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসে নবীর জন্য। নবী বলে—তুমি খাইবা না, মা?

না—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টলতে টলতে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না একদিনও—বাজারে ইস্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি ক'রে ক'রে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। উর্ধ্বে হতে আরো

উর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান। কিছুতেই থামতে পারে না নবী; তার নুবের জেল্লিতে সিনাই পাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দুঃসাহসী শিশু!

কিন্তু যতোই সুতো জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই ওপর হতে আরো ওপরে উঠছে—কোন কূল কিনারাই পায় না নবী। অতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এ-ভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশি। পরনে তার নতুন শাড়ি—সানকি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়।

বহুদিন পর সানকি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা ক'রে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা অতো ছব্ পাইলা কই আইজ?

আজো জ্বর ছিলো হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশি দেখে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ির বউ মরছিল না, তারি ফাতিহা আইছে আইজ, বহুত কাপড় চোপড় আর টানা পয়ছা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না—তোর লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ, ঘুম তা'হলে ভেঙেছে তার আজ! শুক্রিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমাগো বেশি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে তাদের উজ্জ্বল, ভবিষ্যতের।

জমিদার বাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে দুদিন ভালোই যায় তাদের; আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা—একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজু তা'হলে এখনো গিয়ে পৌছায়নি খোদার কাছে।

নবী রোজ ঘুড়ি উড়ায় আর মনে মনে বলে—আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পেঁৗছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে এতো ফেরেশ্‌তা রয়েছে কী জন্যে? তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পেঁৗছয় গিয়ে খোদার

কাছে। আল্লাহ্‌র কাছ হতে তারাই পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে। আজকাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশ্‌তারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লাহ্‌র কাছে।

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু! নবী দূর্বার ওপর বসে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো সুতোটার সঙ্গে। আসমান কেমন যেন মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে চক্‌চক্‌ করছে গাঢ় নীল আসমান। এই সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,—তাতে তার লাটাই আর ঘুড়ি শন্‌শন্‌ ক'রে ধাওয়া করছে ঊর্ধ্বদিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘুড়ি পানে—আর রশিতে টান পড়ে পড়ে ঝিন্‌ ঝিন্‌ ক'রে উঠছে তার সাবা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন! নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মন তার আবেগ-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আসমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এলো। একসময় নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখি উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখিটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে, আবার দেখা যাচ্ছে ডানা মেলে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখির গায়। নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে—পাখিটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখির ডানায় আর পায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, সুতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে, আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখির পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটি হয়ে যায় আজ। আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না জীবনে।

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দুচোখে-ভরা অশ্রু নিয়েই সে একবার তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালোবিন্দুর মতো পাখির পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি, আর পাখিটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচম্‌কা নবীর মনে হলো—এতো পাখি নয়—এ যে ফেরেশ্‌তা,—জিবরাইল এসেছে পাখির সুরত ধ'রে তার ঘুড়িকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। দুচোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার অশ্রু ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনায় আর আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতোদিন পর ফেরেশ্‌তা এসেছে তার দিলের আরজু আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। আর সে কি কাঁদছে, পাখি তার ঘুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আসমানের

দিকে—পাখি ত নেই—ঘুড়িও নেই, শুধু সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে চক্‌চক্‌-করা গাঢ় নীল আসমান। অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানের দিকে, আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার, জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক পলক হেসে নবী বাড়ি ফিরে আসে। খুশিতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বসে শাক বাছ্‌ছিলো—'মা-মা—হুনছো'—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে, টিপে ধরে নবীর ঘাড়ে—গর্‌গর্‌ ক'রে বলে—কোত্থে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রঙ্‌ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না।

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে,—মা, আইজ জিবরাইলেরে দেখছি—আমাগো খবর

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে।—কিলোতে কিলোতেই বলে—ওরা দিবো আর আমরা খামু বইয়া বইয়া—ঝাঁটা মার্‌ জিবরাইলের মুখে শতবার!

—মা, মা—তুমি গাল দিয়ো না, চিৎকার ক'রে ওঠে নবী—গুণা অইবো মা, আল্লা রাগ করবো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়, গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তার। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাত।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে ব'লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি উড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, ইস্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।—হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে। আমি মরলে জিবরাইল খাণ্ডা খাণ্ডা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ। চিৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মার দিকে একবার

চায়, এবং কিছু না বলেই ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। কিছুই পেটে পড়লো না তার। শুয়ে শুয়ে কপাল কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে সে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলোঃ জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আসমান দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল জিবরাইলের জন্যে। ফাঁকে ফাঁকে আবার আবার যাত্রা শুরু হলো—আবার একটা আসমান ফাঁক হয়ে গেল। আবার আরেকটা আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়, জিবরাইল তবু এগুচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে। তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আসমানের দরজা আর তারি ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিলো নবীর চোখ দুটোকে। আর চাইতে পারলো না নবী—দু'চোখে হাত দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে ঘুমের ঘোরে—মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো।

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে-যাওয়া দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তার নাকে মুখে এসে লাগছে।